অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র

দ্বৈপায়ন

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনা চন্দনপুকুর
বারাক পুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রকাশকাল :
২২শে নভেম্বর, ১৯৬২

প্রচ্ছদ :
কুমারঅজিত

অক্ষর বিন্যাস :
জ্যোৎস্না গ্রাফিক্স
সুভাষগ্রাম, দঃ ২৪ পরগণা

মুদ্রণ :
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১/এ, গড়পাড় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতি সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়

—প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

মহারাণা প্রতাপ
সম্রাজ্ঞী নূরজাহান
রাজপুত দুহিতা চন্দ্রাবাঈ
অভিশপ্ত পানিপথ
মুকুট রহস্য
নীলকুঠি রহস্য
হানাবাড়ি রহস্য
সম্রাজ্ঞীর শেষদিন
তৈমুরের তলোয়ার
শেষ পাঠান
পৃথ্বিরাজ চৌহান
শের আফগান
রায় বাঘিনী
অশান্ত মেবার
বেগম মমতাজ
সেদিন সন্ধ্যায়
মেহের উন্নিসা
বাইজী থেকে বেগম
মোগল হারেম
একাকী অন্ধকারে
হারেমের কোহিনূর
রাজতরঙ্গিণীর দেশে
চাঁদের সুরভি ছিল
সম্রাট অশোক
জাহানারা রোশেনারা
টিপু সুলতান
অন্ধকারের আলোয়
এই রোদ এই বৃষ্টি
মেঘনামতি
দুঃস্বপ্নের রাত্রিশেষে
মনের আয়না
শাশ্বত ভারতের নারী
ভাব ভালবাসা
রক্তস্নাতা মধুমতী
জিন্নৎ-উনিষা
মতিবাঈ
রক্তাক্ত গৌড়
বর্গী এলো দেশে
রজ দরবার
পোস্ট মর্টম
শাহেনশা আকবর

ভূমিকা

অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র দ্বৈপায়নের নতুন উপন্যাস। লিখেছেন মহারাজ রামপালের কথা। গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল বংশের অগ্নি পুরুষ মহারাজ রামপাল। মালদহের কাছে রামাবতী নগরী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকৃর্ত্তি বলে স্বীকৃত।

কে গোপাল? কি তাঁর পরিচয়? কোন রাজবংশের সন্তান তিনি?

গোপাল কোন রাজবংশের সন্তান নন। তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা মাত্র। মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শতাধিক বছর অরাজকতায় নিমজ্জিত ছিল বরেন্দ্র। বহিঃ শত্রুর আক্রমণে জন-জীবন বিপর্যস্ত। বরেন্দ্র রক্ষার জন্য জনগণ গোপালকে রাজপদে অভিসিক্ত করেছিলেন। বরেন্দ্রর জনপ্রতিনিধি গোপাল। বরেন্দ্রকে দুর্দিন মুক্ত করতে সফল হয়েছিলেন তিনি। সৃষ্টি হয়েছিল পালবংশের।

গোপাল বংশধর দেবপাল, মহীপাল। মৌর্য্য বীর্য্যের মূর্ত প্রতীক। বাঙালীর বিজয় পতাকা উড়েছে ভারতবর্ষের দিকে দিকে। বৌদ্ধ রাজাদের সৃষ্টি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার। বাংলার বৌদ্ধ রাজাদের জন্যই রক্ষা পেয়েছে বুদ্ধের সারনাথ।

একদিন বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেছেন দ্বিতীয় মহীপাল। বরেন্দ্র তখন অগ্নিগর্ভ। দুভাইকে করেছেন কারারুদ্ধ। বরেন্দ্র বিদ্রোহের সুযোগে দস্যু দিব্য অধিকার করেছে পালবংশের সিংহাসন।

অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র মহারাজ রামপালের কথা। বন্দী রামপাল কিভাবে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, কিভাবে উদ্ধার করেছেন বরেন্দ্রভূমি তা নিয়েই এ কাহিনী। রামপালের জীবন নাটকীয়তায় পূর্ণ। মরমী লেখক আশ্চর্য দক্ষতায় তাঁর জীবন চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

ইতিহাসশ্রিত উপন্যাস রচনায় তিনি এক একক পথিক। তাঁর রচনা শুধুমাত্র পটভূমি বা চরিত্র নয়, ইতিহাসের সত্যতাও অক্ষুন্ন রাখেন। এ উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রকাশক

রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। দুঃস্বপ্নের রাত্রি। নিদ্রা জাগরণের মধ্য থেকে চেতনার তটে উঠে এল তরুন। চোখ মেলে চাইল। প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষ। অপরিসর। প্রায় পক্ষকাল হতে চলল এখানেই অছে সে। জরাজীর্ণ কক্ষটি। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে কবে। চারিদিকেই ফাটল। কদিন আগে একটা ফাটলের মধ্যে ছোট একটা সাপকে দেখা গিয়েছিল। ফাটলের মধ্য থেকে মুখটা কবার বার করে চারিধার চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। তারপর থেকে অবশ্য তাকে আর দেখা যায়নি।

অত্রেয়ী নদীর ধারে এই কারাগৃহ। হিমালয়ের কোন গোপন কন্দরে জন্ম হয়ে বরেন্দ্রকে দ্বিধা বিভক্ত করে মিলেছে করতোয়ার সঙ্গে। করতোয়া মিলিত হয়েছে যমুনার সঙ্গে। আরো একটি শাখানদী মিশেছে অত্রেয়ীর সঙ্গে। দুই নদীর মধ্যস্থলের ভূখণ্ডে ধর্ম পালের পুত্র দেবপাল নির্মিত কারাগৃহ। কালের দংশনে ক্ষত বিক্ষত। রাজ্যের শাস্তিপ্রাপ্ত তস্কর ইত্যাদিদের বাসস্থান। পক্ষকাল পূর্বে মহাধিরাজ মহীপাল তাঁর দুই সহোদর শূরপাল ও রামপালকে এখানে বন্দী করে পাঠিয়েছেন। দু'জনের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ।

মহারাজ বিগ্রহ পালের রাজত্বের শেষার্দ্ধ থেকেই বরেন্দ্র কিছুটা উত্তাল। প্রজারা অসন্তুষ্ট। কারণ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মহীপাল অনেক বিধি নিষেধ আরপ করেছিলেন। মন্ত্রী-অমাত্যদের ক্ষীণ প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেননি। মহরাজের কর্ণগোচর করেও কোন ফল হয়নি। পুত্রের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন বিগ্রহ পাল।

আরও একটি ঘটনা। মহাসন্ধিবিগ্রহিকের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল যুবরাজের। মহাসন্ধিবিগ্রহিক প্রধান অমাত্যদের একজন। অপর রাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করাই তাঁর কাজ। বৃদ্ধ মহাসন্ধিবিগ্রহিক যুবরাজ কর্তৃক অপমানীত, বিতাড়িত হয়ে মনদুঃখে বরেন্দ্র ত্যাগ করেছিলেন। প্রথম মহীপালের সময় থেকে তিনি কর্মরত ছিলেন। সামান্য একজন কর্মচারী থেকে মহারাজ নয়পালের অঙ্গরক্ষক হয়েছিলেন। তারপর মন্ত্রী। মহারাজ নয়পাল তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে দূতের পদে কিছু দিনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। সেখান থেকে মহাসন্ধিবিগ্রহিক।

যুবরাজ মহীপালের সঙ্গে মত পার্থক্য ঘটেছিল বহু রাজ কর্মচারির-ই। মহাপতি হার, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাণিক ও দণ্ডশক্তি (পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারী) প্রভৃতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন যুবরাজ। সেই সঙ্গে ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন মহাদণ্ড নায়ক ও ধর্মাধিকারদের (বিচার বিভাগের কর্তা)। রাজ কর্মচারীর দল শঙ্কিত, ত্রস্ত। কখন যে কে যুবরাজের বিরাগ ভাজন হবেন, কে বলতে পারে। পদাধিকার বলে আপন-আপন কর্ম করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

ঠিক এমন সময় মহারাজ বিগ্রহ পাল চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। তিনি বৃদ্ধ হন নি। দৈহিক ক্ষমতা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি তাঁর। শুধু মানসিক ভাবে নিজেকে সব কিছুর থেকে দুরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যুবরাজ মহীপালের ওপর সব দায়িত্বভার অর্পন করেছিলেন।

এখন বরেন্দ্রর সিংহাসনে মহীপাল। দ্বিতীয় মহীপাল। মহারাজ তৃতীয় বিগ্রহ পালের মৃত্যুর পর (১০৫৪ অব্দ) জ্যেষ্ঠের অধিকারে সিংহাসনের অধিকার লাভ করেছেন তিনি। যুবরাজ মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করে, মহারাজাধিরাজ উপাধী গ্রহণ করেছেন।

বিগ্রহ পাল সতের বছর রাজত্ব করেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় তিন-চার বছর তিনি রাজকার্য থেকে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় কুমার অমাত্যদের সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। বিশেষত রাজা বৃদ্ধ হলে, যুবরাজ শাসন বিষয়ে পিতাকে সাহায্য করেন। কিন্তু বিগ্রহ পাল বৃদ্ধ হননি, কর্মক্ষমও ছিলেন। ভোগবিলাসী কোনদিনই ছিলেন না। খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ধর্ম সম্পর্কেও কিছুটা উদাসীন ছিলেন। হিন্দু সাধকদের মত, বৌদ্ধ শ্রমণদেরও আসা যাওয়া ছিল তাঁর কাছে। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করতেন। নিজে বৌদ্ধ হয়েও শ্রমণদের প্রতি কোনরকম পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আসলে তিনি রাজ্য, সংসার, সব কিছুর প্রতিই কেমন নিরাসক্ত, উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন। পিতা মহারাজ নয়পালের মৃত্যুর পর (১০৩৮ অব্দ) জ্যেষ্ঠের অধিকারে তিনি বরেন্দ্রর সিংহাসন লাভ করে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য শাসনের প্রতি তাঁর কোনরকম আগ্রহ ছিল না। বিশ্বাসী অমাত্যরাই রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নামে মাত্র রাজা ছিলেন তিনি। অবশ্য সিংহাসন লাভের প্রথম বছরেই রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসনে বসে রাজা হয়েছেন যুবরাজ মহীপাল। রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রান্ত প্রায়। মহারাজ বিগ্রহ পালের সময় শান্ত ছিল রাজ্য। প্রজারা যে খুব একটা সুখে শান্তিতে ছিল তা নয়, শুধু অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেনি। সামন্ত রাজারাও তাঁর ব্যবহারিক গুণের জন্য সম্মান করতেন। কিন্তু মহীপাল রাজ্য লাভের পর থেকে প্রায়ই অসন্তোষের প্রকাশ ঘটা শুরু হয়েছে। দেখা দিয়েছে অশান্তি। সামন্ত রাজারা দুর্বিনীত হয়ে উঠছেন। ক্ষোভ জানাচ্ছেন। ষড়যন্ত্র। একান্ত নিরুপায় হয়েই মহারাজাধিরাজ মহীপাল দুই সহোদরকে কারারুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি অবগত হয়েছেন, তাঁর দুই সহোদর ষড়যন্ত্রকারীদের দলে। প্রমাণ সংগ্রহে অসুবিধা হয়নি। অথচ তিনি..........
মহাধিরাজ মহীপাল। ধীর শান্ত প্রকৃতি। কোন কারণেই তিনি কখনো উত্তেজিত হন না। সিংহাসনে বসার পরই তিনি প্রথমেই রাজস্ব বিভাগের সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। হিসাব বিভাগের প্রধান মহাক্ষপটলিককে অবসর দিয়ে নতুন ব্যক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নির্দিষ্ট ছিল। তিনি পরিবর্তন করলেন অনেককেই। উৎপন্ন শষ্যের ওপর নানাবিধ কর ধার্য ছিল। যেমন—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি। গ্রামপতি ও বিষয় পতিরাই কর আদায় করতেন। সেখানেও পরিবর্তন করলেন। করের মাত্রা সংশোধন করলেন। কতকগুলি

দ্রব্যের ষষ্ঠ ভাগ ছিল রাজার প্রাপ্য। তিনি বৃদ্ধি করলেন। আর মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ বা আলোচনা ছাড়াই। কর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কোন মন্ত্রী বা অমাত্য কিছু বলতে গেলে তাঁকে বলতেন, পরে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। দু-একদিন পরে দেখা যেত, সেই মন্ত্রী বা অমাত্যকে তিনি অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন, বৃদ্ধ হলে অবসর গ্রহণের নির্দেশ জানিয়েছেন।

প্রজারা অসন্তুষ্ট। অধীনস্থ রাজা, জমিদারদের সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির পূর্বেই দু-ভাইকে করেছেন কারারুদ্ধ। অভিযোগ ষড়যন্ত্র।

রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। ম্লান হচ্ছে অন্ধকার। বিশাল কারাগারের দিকে দিকে সন্ধ্যায় মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মধ্য রাত্রেই অধিকাংশ নিভে যায়। দু-একটি শেষরাত্রি পর্যন্ত নিভু-নিভু হয়ে জ্বলতে থাকে। কারাগার প্রেতালয়ের রূপ নেয়।

প্রথম দু-চারদিন ভয় হয়েছিল। মহারাজ দেব পাল নির্মিত কারাগারটি ক্রমশ ধ্বংস স্তূপের রূপ নিচ্ছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এটি। মহীপাল কিছু কিছু সংস্কার করিয়ে ব্যবহার করা শুরু করেছেন। কারণ তাঁর দ্বিতীয়বর্ষের রাজত্বকালে অপরাধীর সংখ্যা হঠাৎ-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। শীতের রাত্রি। মধ্য পৌষের কাল। হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা। কদিন আগে হঠাৎ ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। অসময়ে বৃষ্টিপাত ঠাণ্ডাকে দ্বিগুণ করেছে। দিনের সূর্যেরও খুব একটা উত্তাপ নেই।

ঘুম ভেঙ্গে ছিল তরুনের। আধা ঘুম, জাগরণের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত হয় তার। শীতের কাঁপুনীতে ঘুম ভেঙে দু হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে বসে কাঁপে। শত ছিন্ন কম্বলটাকে শরীরে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। কারাধ্যক্ষ দয়াপরবশ হয়ে কম্বলটুকু দিয়েছেন তাকে। বলেই দিয়েছিলেন, অপরাধী বন্দীদের কোনরকম আচ্ছাদন দেবার অনুমতি নেই। তিনি শুধু তাঁর পূর্ব পরিচয় স্মরণ করে নিজ দায়িত্বে দিচ্ছেন।

শুনেছে সে। হাত বাড়িয়ে আচ্ছাদনটুকু নিতে দ্বিধা করেনি। যতক্ষণ প্রাণ আছে, রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু ছিন্ন হলেও গায়ে কম্বল দিয়ে শরীরে উত্তাপ সঞ্চার হয় না। কক্ষের মেঝেটি মাটির। কনকনে ঠাণ্ডা ওঠে সেখান থেকে। কয়েক আঁটি খড় দিয়ে শয্যা প্রস্তুত করা। ভিজে গেছে তা।

গুটি সুটি হয়ে শুয়েছিল তরুন। অনিদ্রায় পার হয়েছে রাত্রি। চিন্তা করে না। মিথ্যা চিন্তায় কোন লাভ নেই। শীতের কাতরতা তাকে অস্থির করে তোলে। বারংবার মনে পড়ে জননীর ম্লান বিষন্ন মুখখানি। জ্ঞানোদয়ের পর জননীর মুখে কখনো হাসি দেখেনি সে।

পিতা মহারাজ বিগ্রহ পালের কথা মনে পড়ে। নির্বিকার পুরুষ ছিলেন। কি এক চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন প্রায় সর্বক্ষণ। রাজকার্য থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

যুবরাজ মহীপাল মন্ত্রী অমাত্যদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। রূপবান, ধীর শান্ত প্রকৃতি। সকলের প্রতি মধুর ব্যবহার। কর্তব্যনিষ্ঠ। কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহময়। অথচ..... কি বিস্ময়কর পরিবর্তন। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন রূপ ধারণ করল। কোথায় গেল তাঁর মধুর ব্যবহার, স্নেহ, প্রীতি! কাঠিন্যের বর্মাবৃত এক পুরুষ। রাজাধিরাজ মহীপাল।

সে নিজে?

নিজের কথা চিন্তা করল। মনে পড়ল জননীর সাবধান বাণী। বার বার তিনি তাঁকে সাবধান করেছেন। সতর্ক হতে বলেছেন। রাজবংশের সন্তান হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় আপত্তি জানিয়েছেন। যদিও তিনি বলেছেন, তোমার মঙ্গলের জন্যই আমার নিষেধ করা। আবার অমঙ্গলের কথাও তিনি প্রকাশ করেননি।

পরিণতি কারাবাস। নির্যাতন। জননীর সাবধান বাণী শুনে সে যদি সতর্ক হত তাহলে কি এই কারাবাস তার ঘটতো না? মনে হয় না। মহীপালের বৈমাত্রেয় ভাই সে। ষড়যন্ত্রকারী রূপে তিনি তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু সহোদর শূরপালকে কোন্ অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন তিনি?

চিন্তা করতে পারে না। শূরপালকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বৈমাত্রেয় ভাই হলেও সুন্দর, মধুর সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে। পিতার মতই আত্মভোলা। শিশুর সারল্য চোখে মুখে। জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দূরে থাক—রাজ্য, সিংহাসন নিয়ে কোন চিন্তাই তাঁর মধ্যে ছিল না। সঙ্গীত তাঁর ধ্যান জ্ঞান। সঙ্গীত চর্চায় সব সময় বিভোর থাকেন। আহার নিদ্রা ভুলে যান। শুনেছে জ্যেষ্ঠের রোষবহ্নি থেকে তিনিও নিষ্কৃতি পান নি। মহাধিরাজ মহীপাল তাঁকেও কারারুদ্ধ করেছেন। তাহলে সে কি ভাবে রক্ষা পেত?

কারও পদশব্দ শুনতে পেল। শুয়ে রইল সে।

সামান্য পরে কণ্ঠস্বর কানে এল, 'কুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে?'

আবছা অন্ধকারে প্রশ্নকারীর দিকে চাইল। ত্রৈলোক্য। কারাধ্যক্ষ্যের প্রিয়পাত্র। একজন অপরাধী। বহু বার, বহু অপরাধে কারাবাস করেছে। শেষবার প্রাণদণ্ডের শাস্তি থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে কারাবাস করছে।

ত্রৈলোক্য আবার জানতে চাইল, 'কুমার কি নিদ্রা মগ্ন?'

এবার নীরবে উঠে বসল সে।

ত্রৈলোক্য হাসল। বলল, 'আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম।'

—'কি অনুমান করেছিলে তুমি?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

—'এ ঠাণ্ডায় নিদ্রা যাওয়া সম্ভব নয়।' একটু চুপ করে রইল সে। ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'খুবই কষ্ট, না, কুমার?'

উদাসীন হল সে। পরপর কদিন শীতের দাপটে নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হয় নি তার পক্ষে। মধ্যরাত্রি থেকে বুকের মধ্যে থর থর করে কাঁপুনি শুরু হয়। কোথা দিয়ে উত্তুরে বাতাস এসে ঢোকে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রাত্রি পার করে।

ত্রৈলোক্য ডাকল, 'কুমার।'

—'বল।' আবছা অন্ধকারে ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে তাকাল।

—'আপনার কষ্ট আমি উপলব্ধী করতে পারি। কষ্ট করায় তো অভ্যস্থ নন।'

চুপ করে রইল সে।

—'কারাধ্যক্ষও বলছিলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়।' হাসল ত্রৈলোক্য। 'সত্যি বলছিলেন, বিশ্বাস করুন।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তার মুখের দিকে চাইল।

ত্রৈলোক্য বসল। বলল,'আজ আপনার ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দিয়ে দেব। অনুমতি পাওয়া গেছে।'

'—তুমি কি অনুমতি প্রার্থনা করেছিলে?'

ত্রৈলোক্য চুপ করে রইল।

বিকৃত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

ত্রৈলোক্য মুখ তুলে চাইল। বলল, 'আপন অভিজ্ঞতা থেকে।' হাসল। বলল, 'এ জীবনে কারাদর্শন তো কম বার হয়নি। দণ্ড নায়কের দল এই শরীরটাতে রেখাচিত্র আঁকতেন। কখনো কখনো লবন-মরিচ পর্যন্ত ছিটিয়ে দিতেন। অথচ আপনার পিতার কঠোর আদেশ ছিল অপরাধীদের কোন মতেই দৈহিক নির্যাতন করা চলবে না। অবশ্য রাজাজ্ঞা সর্বক্ষেত্রে পালিত হয় না। তাতে দণ্ডনায়কদের পদের অবমাননা হয়।' কথা শেষ করে আবার হাসল ত্রৈলোক্য।

শুনতে ভাল লাগছিল না। সময়ে সময়ে ত্রৈলোক্যকে অসহ্য বোধ হয়। বড় বেশি কথা বলে। তাছাড়া নিজেই স্বীকার করে শতাধিক মানুষের জীবন সে নিয়েছে। তাদের দৌরাত্মে নাগরিকদের জীবন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দাণ্ডিক (পুলিশ) অনেকবারই ধরেছে তাকে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে দণ্ডনায়ক (বিচারপতি) তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কখনো বা সামান্য দিনের জন্য কারাবাস হয়েছে।

অথচ ত্রৈলোক্যকে দেখলে কেউ-ই বলবে না, সে একজন সমাজ বিরোধী। দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর। রোগা, লম্বা, হাড় সর্বস্ব শরীর। মুখশ্রী খুব একটা খারাপ নয়। উন্নত নাসা। কোঠরাগত দুই চক্ষু। পিঙ্গল চক্ষু মণি। জোড়া ভ্রূদ্বয়। সুন্দর হাসিটি। হাসিতে শিশুর সরলতা। কথায় কথায় হাসে।

নিজের জীবনের কথা শুনিয়েছে ত্রৈলোক্য। বেশ গর্ব করেই শুনিয়েছে। কবি গঙ্গাধরের বংশধর সে। মহারাজ দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে গঙ্গাধরের কবি প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। মহারাজ গঙ্গাধরকে সভাকবির সম্মান পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন। কবি মহারাজের আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে মধ্যে মধ্যেই তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে মহারাজকে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে আসতেন। মহারাজ গোপালের সঙ্গে কবি গঙ্গাধরের সখ্যতা জন্মেছিল।

সত্য মিথ্য নির্ণয়ের কোন উপায় নেই। দ্বিতীয় গোপালের সতের বছর রাজত্ব কালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করেছেন। তারপর প্রথম মহীপালের আটচল্লিশ বছরের রাজত্বকাল। মহীপালের পুত্র নয়পাল বসেছেন বরেন্দ্রর সিংহাসনে। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কবি গঙ্গাধরের বংশধর কারাগারে স্থান লাভ করেছে। পার হয়ে গেছে দীর্ঘদিন। গঙ্গাধরের কবি খ্যাতির কথা কখনো শোনেনি সে।

ত্রৈলোক্য নিজেই বলেছে, 'অবশ্য কবি গঙ্গাধরের কথা এখনকার মানুষ অবগত নয়। তবে তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর রচিত পুঁথি এখনও আমাদের বংশে আছে। আমি বাল্যকালে স্বচক্ষে দেখেছি।

—'পাঠ করনি?'

—না, সে সৌভাগ্য মনে হয় গঙ্গাধরের বর্তমান বংশধরদের কারোরই হয় নি। পিতা-পিতামহদের হয়েছে কি না আমার জানা নেই।'

—'কেন?'

ত্রৈলোক্য হেসেছে। বলেছে, 'সে অনেক ব্যাপার। গঙ্গাধরের পুঁথি এখন কুলদেবতার সঙ্গে নিত্য পূজা হয়। সিঁদুর-চন্দন চর্চিত হয়ে মণ্ডের রূপ ধারণ করেছে।' কথা শেষ করে আবার হেসেছে সে। চুপি চুপি বলেছে, 'আমার মনে অবশ্য একটা ইচ্ছা জেগেছিল। পাপের ভয়ে বিরত হয়েছিলাম।

—'কিসের পাপ?'

—'গঙ্গাধরের পুঁথি চুরির পরিকল্পনা করেছিলাম আমি। শেষ পর্যন্ত করি নি।'

—'অথচ তুমিই শতাধিক মানুষকে হত্যা করেছো?'

—'করেছি।' মৃদু কণ্ঠে স্বীকার করেছে ত্রৈলোক্য।

—'তাতে তোমার মনে পাপবোধ জাগেনি?'

একটু নীরব থেকে সে বলেছে, 'জাগেনি যে, একথা বলব না। কখনো কখনো জেগেছে বৈকি। তবে কিছু তো করার ছিল না।'

—'কেন?'

—'সে আপনি বুঝবেন না কুমার।'

—'তুমি যদি বুঝিয়ে দাও তাহলেও বুঝতে পারব না?'

—'আপনাকে বোঝাব কেমন করে?' চিন্তা করেছে সে। একসময় বলেছে, 'কবি গঙ্গাধরের বংশধর আমি। গঙ্গাধরের জন্য আমাদের বংশে গর্বের শেষ নেই। পারিবারিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল। তবু আমি দুস্কৃতি হলাম কেন? আমার কি দুষ্কৃতি হওয়া উচিত ছিল, না শোভা পায়? কিসের জন্য, কেমন করে আমি দুস্কৃতি হলাম? বাল্যকাল থেকেই, রুগ্ন দুর্বল আমি। খেলার সাথীদের কাছ থেকে বহু নিগ্রহ সহ্য করেছি। মিলিতভাবে আমাকে খেলার সাথীরা কোন বিষয়ে মতান্তর ঘটলেই প্রহার করত। আমার কখনো সাধ্য হয়নি সঙ্গীদের অত্যাচারের প্রতিদান দেওয়া। দিনের পর দিন

সর্বাঙ্গে তারা অজস্র ক্ষত চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। গৃহে জননীর কাছেও প্রহার লাভ করেছি। তিনি বারংবার আমাকে নিষেধ করতেন খেলাধূলা না করতে। তাঁর নিষেধ অমান্য করার জন্য সঙ্গীদের কাছে নিগৃহিত হয়ে গৃহে ফিরলে রাগে দুঃখে প্রহারের সঙ্গে ভৎর্সনা করতেন। নিজে কাঁদতেন। তারপর..........'

ত্রৈলোক্য একটু নীরব থাকার পর বলেছিল, 'বয়ঃপ্রাপ্ত হলাম। পারিবারিক কারণে বিবাদ দেখা দিল আত্মীয়দের সঙ্গে। আমি জড়িয়ে পড়লাম সেই বিবাদে। সেই প্রথম আমি অন্যকে মারলাম—মারও খেলাম। দাণ্ডিক এসে আমায় ধরে নিয়ে গেল। আত্মীয়দের উৎকোচে বশীভূত হয়ে আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হল। অবশ্য কয়েক দিন পর ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে মুক্তিও দিল। ফিরে আসার পর প্রতিশোধের পথের সন্ধান করতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম অবশেষে। বিপথগামী হলাম। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন হয়ে উঠলাম। কবি গঙ্গাধরের বংশধর ত্রৈলোক্যের নাম প্রচার হতে বেশিদিন লাগল না। অথচ আমায় দেখলে কে বিশ্বাস করবে, আমি একজন সমাজবিরোধী। মানুষের প্রাণ নিতে আমার এতটুকু হাত কাঁপে না। আমার নামে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। দাণ্ডিকের দল কয়েকবার-ই আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। অত্যাচারও করেছে। প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতেও বাধ্য হয়েছে।'

—'তাহলে তোমার এই পরিণতি কেন?' ওর মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে থেকেছে। নীরব থেকেছে ত্রৈলোক্য।

—'কি হল?'

—'একচ্ছত্র আধিপত্য কারও চিরদিন থাকে না কুমার।' ম্লান কণ্ঠস্বর শোনা গেছে।

—'অর্থাৎ?'

—'আমার প্রতিপক্ষের সৃষ্টি হল একদিন।' বলেছে সে, 'সৃষ্টি করা হয়েছিল।'

—আরও একজন ত্রৈলোক্য?'

হেসেছিল সে। বলেছিল, 'তাই। অবশ্য তখন আমি নিজেকে সংশোধন করার কথা চিন্তা করছি। আমার সঙ্গীদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আগের মত আর মানুষের সর্বনাশ করার জন্য যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ি না। বলতে কি, আমি তখন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছিলাম। একজন নারী আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল। আমি তাকে বাক্যদান করেছিলাম।'

—'তারপর?'

—আমাদের এপথে কোন সময়েই প্রতিপক্ষের অভাব হয় না। সতর্ক হয়ে না চললেই যে কোন মূহুর্তে সর্বনাশ ঘটতে পারে। যাঁদের স্বার্থরক্ষা করেছি, তাঁরাই বিরুদ্ধাচারণ করলেন।

—'কেন?'

—'আমি নিজেকে সংশোধন করতে চেয়েছিলাম যে।'

—'কাদের স্বার্থরক্ষা করতে তুমি?'

—'কাদের?' ত্রৈলোক্য সন্দেহের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকার পর হেসে ফেলেছিল। বারবার মাথা নেড়েছিল। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'আপনার কাছ থেকে আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই কুমার।'

সে তার কথা বুঝতে পারে নি।

—আজ আপনার, আমার একই অবস্থা।' একটু চুপ করে থেকে ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'রাজ্যের কিছু অমাত্য, মন্ত্রী, মহাক্ষপটলিক (হিসাব বিভাগের প্রধান) থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠী ও দেহপসারিনী, কাদের নয়! সকলেরই স্বার্থরক্ষা করেছি।'

—'শুধু নিজেকেই শেষে রক্ষা করতে পারনি তুমি?'

—'এটাই নিয়ম কুমার।'

—'নিয়ম কেন?'

—'আমরা চিরস্থায়ী নই যে।'

—'অর্থাৎ?'

—আমাদের পথের পথিকরা কখনই চিরস্থায়ী নয়। আমরা আসি-যাই। আমাদের সৃষ্টি করা হয়। আমাকেও করা হয়েছিল। দৈহিক শক্তির জন্য নয়, আমার বুদ্ধি-চাতুর্যের জন্য। অর্থের বিনিময়ে স্বার্থরক্ষা করেছি বহুজনের। প্রয়োজন শেষ হলেই সমন সদনে যাত্রা করতে হয়। পূর্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদে আমি কারাবাসী হয়েছি।'

'হুঁ' বলে নীরব ছিল সে। চিন্তা করেছিল।

সামান্যক্ষণ নীরব থাকার পর ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'কুমাব বুঝতে পারছি, আমার কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না আপনার।'

—পরস্পর বিরোধী কথা বললে কি করে বিশ্বাস করি বল?'

ত্রৈলোক্য নীরব দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

—'তুমি একবার বলছো ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখার জন্য আজ তোমার এই অবস্থা। আবার বলছো, প্রয়োজন শেষ হলে, প্রতিপক্ষ মাথা তুললে, সমন সদনে যেতে হয়। সত্য কোন্‌টা?'

—'আমার ক্ষেত্রে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখাই কাল হয়েছিল। শৈথিল্য এসেছিল। আর সেই সুযোগে.......'

—'থাক বুঝেছি।' গম্ভীর হয়েছিল সে। প্রসঙ্গ ভাল লাগেনি আর।

—'কি বুঝেছেন কুমার?' সাগ্রহে তার মুখের দিকে চেয়েছিল ত্রৈলোক্য।

—'কবি গঙ্গাধরের ধারা তোমার মধ্যেও ক্রিয়া করে। তাই জল্লাদের জীবন যাপনের মধ্যেও তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে। মুক্তি পেয়েছো।'

—'কষ্টও কম নয় কুমার।'

—'কষ্ট আছে বলেইতো তুমি জীবিত আছ ত্রৈলোক্য। নাহলে......'

ত্রৈলোক্য আর কথা বলেনি।

কারাধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র ত্রৈলোক্য। প্রভাবও কম নয়। বন্দী হলেও স্বচ্ছন্দভাবে ঘুরে বেড়ায়। পক্ষকাল হল তার দেখা শোনা করছে। তার সুবিধা অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি। স্নানাহারের ব্যবস্থা করে, সঙ্গ দেয়। বিশাল বন্দীশালার শেষপ্রান্তে অপরিসর কক্ষটিতে বন্দী হয়ে আছে সে। শৃঙ্খলিত অবস্থায় কদিন থাকার পর তার শৃঙ্খল মোচন করা হয়েছে। এখন লোহার দরজাটিও উন্মুক্ত থাকে। তাকে জানান হয়েছে ইচ্ছামত সে তার বাসস্থানের কাছাকাছি ভ্রমণ করতে পারে, সে স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হল। কিন্তু সে সাধ্য তার নেই। প্রায় প্রতিদিনই কারাধ্যক্ষের আদেশে তাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে হয়। কখনো কখনো গভীর রাত্রেও তার ডাক পড়ে। চলে জিজ্ঞাসাবাদ, দৈহিক নির্যাতন। মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলা হয় তাকে। স্বীকারোক্তি আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা। ব্যর্থ হয়ে নির্যাতনের মাত্রা বাড়ে। বেশ কয়েকবারই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। শরীর ক্ষত বিক্ষত।

ত্রৈলোক্য ডাকল, 'কুমার।'

আবছায়া অন্ধকারটা কিছুটা অপসৃত। ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে চাইল সে।

মৃদু কণ্ঠে ত্রৈলোক্য বলল, 'একটা সংবাদ আছে কুমার।'

—'বল।'

—'কুমার শূরপালকে রাত্রি শেষ প্রহরে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে।

—'আপনাকে উত্তরে, তাঁকে পশ্চিমদিকে রাখা হয়েছে।'

মধ্যম ভ্রাতা শূরপাল। মহারাজ মহীপালের আপন সহোদর। আত্মভোলা সঙ্গীত সাধক। রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুর প্রতিই তাঁর এতটুকু মোহ নেই। সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। শূরপালের সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান কম নয়। সম্পর্ক ছিল স্নেহের।

বাল্যকালের কিছু স্মৃতি মূহুর্তে মনে পড়ল। দার পরিগ্রহে অনীহা ছিল তাঁর। অনেক কষ্ট করে তাঁকে সম্মত করানো হয়েছিল। আড়ম্বরের সঙ্গেই দণ্ডভূক্তির এক রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের পর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। আগের মতই নির্বিকার। বৎসর অতিক্রম করার আগেই পত্নী বিয়োগ। তখনও সেই একই রূপ তাঁর।

একদিন সঙ্কোচের সঙ্গে জানতে চেয়েছিল, 'আপনার কষ্ট হয় না?'

তিনি তাঁর আয়ত দুই আঁখির দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকাব পর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হয় মধ্যে মধ্যে, খুবই কষ্ট হয়। তাঁর প্রতি অনেক ত্রুটি থেকে গেছে আমার। কর্তব্যে অবহেলাও করেছি। সেই জন্যই কষ্ট হয়।'

আশ্চর্য মানুষ। সংসারে এমন মানুষ ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেনি সে। বাইরের জগতের

সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তবু ষড়যন্ত্রকারীরূপে কারা যন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি।

—'কুমার।'

ত্রৈলোক্যের আহ্বানে সংবিত ফিরে পেল সে। তার দিকে চাইল।

—'একটা কথা বলছিলাম কুমার।' ইতস্তত করল ত্রৈলোক্য।

—'বল।'

—'অপরাধ মার্জনা করবেন। ত্রৈলোক্য নীরব হল। চিন্তার রেখা দেখা দিল তার কপালে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে কিছু ত্রুটি সংশোধন করতে হবে কুমার।'

—'ত্রুটি?'

হাসল ত্রৈলোক্য। বলল, 'যদিও বয়সের ধর্ম। আপনি তরুন। সৎ, আদর্শবান, সত্যবাদী। ভাগ্যচক্রে অপরাধ না করেও অপরাধীর শাস্তি ভোগ করছেন। নির্যাতিত হচ্ছেন। অবশ্য আপনি.........' থেমে গেল সে।

শুনতে শুনতে কঠোর হচ্ছিল সে। অপরাধী হয়েও কারাধ্যক্ষের প্রিয় পাত্র। অন্যান্য অপরাধীরা বেশ সমীহ করে। আদেশ পালন করতেও দেখেছে। তাই বলে..... চিন্তা করতে পারল না সে।

মৃদুকণ্ঠে ত্রৈলোক্য বলল, 'আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছিলাম কুমার।'

কঠিন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইল সে।

একটু ইতস্তত করল ত্রৈলোক্য। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আর একটা কথা বলব।'

—'কি?' অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল সে।

—'ইচ্ছা করলেই আপনি নির্যাতন এড়াতে পারেন।' ত্রৈলোক্য বলল, 'বিশ্বাস করুন, পারেন।'

শুনে বিস্মিত হল সে। ওর মুখের দিকে তাকাল। কৌতুক কণ্ঠে বলল, 'বলছো?'

—হ্যাঁ, কুমার।' হাসল ত্রৈলোক্য। চকিতে একবার চারদিক চেয়ে দেখে বলল, 'যেভাবে প্রতিদিন আপনার ওপর শারিরীক অত্যাচার চলছে, তাতে শরীর এবং মন দুইই ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে আপনার। যারা আপনার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আপনাকে পীড়ন করছে তারা খুবই নিষ্ঠুর। মহারাজের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে তারা।'

—'কিভাবে?'

একটু চিন্তা করল ত্রৈলোক্য। বলল, 'মহারাজের চর সর্বত্র।'

—'সেটা কি?'

—'এই বন্দীশালাতেও মহারাজের গুপ্তচর রয়েছে। আপনার প্রতিটি সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।'

শুনে চুপ করে রইল সে।

—'আপনি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।'

তার দিকে একবার চেয়েই মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

ত্রৈলোক্য বলল, 'অপরাধ জীবনে কমবার দাণ্ডিকের হাতে ধরা পড়িনি। প্রথম প্রথম যতক্ষণ পারতাম পীড়ন সহ্য করতাম। অনভিজ্ঞতার জন্য প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়েছি। পরবর্তীকালে দাণ্ডিকের হাতের বেত কয়েকবার পৃষ্ঠদেশে পড়ার পরই চোখ উল্টে সজ্ঞাহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছি। আপনাকেও চেষ্টা করতে হবে.....'

কথাটা শেষ করতে পারল না ত্রৈলোক্য। কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ত্রৈলোক্য, তুমি ভুলে যেও না আমি পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল, ধর্মপালের বংশধর। স্বর্গত মহারাজ বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল। আমি জানি এ অত্যাচারে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। তবু......না, ত্রৈলোক্য। তুমি যা বলছো আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। দুঃখ করো না, তুমি যা পার, আমি তা পারি না ত্রৈলোক্য।

দুই

মহারাজ মহীপালের নিদ্রাভঙ্গ হল। সবেমাত্র পূর্বাকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করছে। পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। তিনি শয্যা ত্যাগ করলেন না। আগে এসময় তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকতেন। শীতের সকাল ছিল তাঁর কাছে আরামপ্রদ। কিন্তু সুখনিদ্রার দিন শেষ হয়েছে। রাজ্য জুড়ে অশান্তি। ষড়যন্ত্রকারীর দল সদা তৎপর।

সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ রক্ষিতাগৃহে অতিবাহিত করে আসা তাঁর কয়েক বছরের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন সেখানে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাঁর পক্ষে। তরঙ্গ তাঁকে সেখানে না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। কাকুতি মিনতি করেছে।

তরঙ্গ তাঁর খুবই প্রিয় পাত্রী। অনেক গুণে গুণান্বিতা। নৃত্যে পারদর্শিনী। সঙ্গীতে দক্ষতাও কিছু কম নয়। বুদ্ধিমতী। তরঙ্গময়ীর রূপের চেয়ে গুণ তাঁকে বেশি মাত্রায় আকর্ষণ করেছিল। বৈশ্যকন্যা কাম কলাতেও সুনিপুণা। পত্নীদের কাছ থেকে যা পান না তিনি, তাই দিতে পারে। পরিতৃপ্ত হয়ে প্রাসাদে ফেরেন।

কয়েকদিন যাবৎ তবঙ্গর সঙ্গ সুখে বঞ্চিত। সেখানে গেলে তাঁর প্রাণ সংশয় হতে পারে। তরঙ্গর বৃদ্ধা পরিচারিকা রতিবুড়ি গোপন সংবাদটি কর্ত্তীকে জানিয়েছিল। শুধু বুঝতে পারছেননা, তাঁর রক্ষিতা গৃহে গমনের সংবাদ কিভাবে প্রকাশ হল!

তরঙ্গর গৃহ নগরের প্রান্তে। অমাত্য লোহিতের গৃহ সংলগ্ন। ছোট্ট দ্বিতল গৃহটিতে তরঙ্গ তার অসুস্থ পিতাকে নিয়ে কয়েক বছর বাস করছে। লোহিত-ই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছিল। পিতা মহারাজ বিগ্রহপালের সময় থেকে এই ব্যবস্থা চলছে। গোপনীয়তা বজায় ছিল।

অমাত্য লোহিত তাঁর বাল্যসঙ্গী। লোহিতের পিতা ছিলেন রাজকর্মচারী। অকালে পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি দারপরিগ্রহ করেননি। মাতৃহারা বালককে নিয়ে কর্মস্থলে

আসতেন। রাজকুমারের সঙ্গে এক সামান্য কর্মচারীর পুত্রের সখ্যতা জন্মেছিল। আজও অটুট তা। পিতার মৃত্যুর পরে তরুণ লোহিত কর্মলাভ করেছিল। মহারাজ বিগ্রহ পালের সময়েই লোহিত অমাত্যের পদ লাভ করেছে।

হৃদ্যতা জন্মাবার পর কুমার মহীপাল তাদের গৃহে যেতেন। লোহিতের পিতা গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে অজস্র ফুল ফোটাতেন। ফুল ছিল তাঁর প্রাণ। বিশ্রামের দিনে স্নানাহার ভুলে তিনি গাছেদের পরিচর্যা করতেন। এক শীতের দিনে গাছের পরিচর্যা করতে করতে অসুস্থ সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। আর জ্ঞান ফিরে আসেনি তাঁর।

পিতার মৃত্যুর পর তরুন লোহিত কর্মলাভ করেছিল। সন্ধ্যায় কর্মশেষে যুবরাজ লোহিতের সঙ্গী হতেন। কিছুক্ষণ বন্ধুগৃহে সময় পার করে প্রাসাদে ফিরতেন।

কালে লোহিতের গৃহে তাঁর মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তরঙ্গর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা সেই করে। পার্শ্ববর্তী গৃহটি একরকম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। লোহিতের এক দুর সম্পর্কের আত্মীয় গৃহটি খরিদ করে কন্যা এবং দুজন দাসীকে নিয়ে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ তরঙ্গর পিতার পরিচয়ে আছে অসুস্থতার ভান করে। লোহিতেরই নিয়োগ করা লোক সে। গৃহরক্ষক।

এতদিন সব কিছুই গোপন ছিল। কিন্তু সবই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

বিরক্তিতে পাশ ফিরলেন মহীপাল। মাথার মধ্যে অসহ্য জ্বালা। বরেন্দ্রর অধীশ্বর তিনি। একসময় লোক লজ্জায় রক্ষিতার কথা গোপন রেখেছিলেন। আজ তার কোন প্রয়োজন নেই। রক্ষিতা রাখা কোন অপরাধও নয়। তরঙ্গকে বলেছিলেন সে কথা। প্রাসাদের কাছে তার থাকার জন্য গৃহ নির্বাচনও করেছিলেন। তরঙ্গ সম্মত হয়নি। নগর প্রান্তের নির্জনতা ছেড়ে রাজধানীর কোলাহলের মধ্যে আসতে চায়নি সে। কাতর অনুরোধ জানিয়ে ছিল।

এখন কি হবে? চিন্তা করলেন তিনি। প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা যখন দেখা দিয়েছে, নগরপ্রান্তে তরঙ্গর কাছে যাওয়া তাঁর উচিৎ হবে না। লোহিতের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

—'মহারাজ।'

আহ্বান শুনে চোখ মেলে চাইলেন তিনি। প্রধান পরিচারক রাঘব। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

—'রাণীমা আপনাকে আজ অবশ্যই দেখা করতে বলেছেন।' বলল রাঘব।

—'দেখা করতে বলেছেন? কখন?'

—'তা অবশ্য কিছু বলে পাঠাননি তিনি। দাসী বলে গেল।'

জননী দেখা করতে বলেছেন। পিতার মৃত্যুর পরে অন্তঃপুরের শেষপ্রান্তে নিজের বাসস্থান নির্বাচন করেছিলেন। দৈবাৎ কখনো দেখা হয়ে যায়। সাক্ষাৎ করতে বলা এই প্রথম। চিন্তা করলেন। স্থির করতে পারলেন না।

—'অমাত্য লোহিত আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী মহারাজ।' বলল রাঘব।

—কখন এসেছে সে?'

—'সূর্যোদয়ের পূর্বে।'

উঠে বসলেন মহীপাল। দু'চোখ জ্বালা করছে। মাথাটা ভার হয়ে আছে। অনিদ্রায়। কিছুদিন যাবৎ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারছেন না। কোন দুঃস্বপ্ন নয়, চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন। স্থির হয়ে শয্যায় শুয়ে থাকতেও পারেন না।

রাত্রির সতর্ক প্রহরী রাঘব। অঙ্গরক্ষকরাও সব সময় সতর্ক থাকে। তবু এক অজানা আতঙ্কে বুক কাঁপে। বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর। কিছুদিন যাবৎ অন্তঃপুরে রাত্রিবাস করা বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য তার কারণ ভিন্ন। অনেকদিন হল পত্নীদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মতান্তর ঘটছিল। তুচ্ছ কারণে অশান্তি হচ্ছিল। এখন অন্তঃপুরে পত্নীদের সাহচর্য দেননা তা নয়, তবে তিন পত্নীর কারও সঙ্গেই রাত্রিবাস করেন না।

পত্নীরা যে তাঁর অবাধ্য, তা নয়। তিন জনের কেউ তাঁর মনোমত হয়নি। তাঁকে একজনও বুঝতে চায় নি। নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন কিছুই বুঝল না। আর এমনই ভাগ্য, তিন জনেই শুধু কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে গেছে। দৈহিক সম্পর্কের বাইরে আর কিছুই জানে না। আর এমনই দুঃসাহস, শূরপাল-রামপালকে কারারুদ্ধ করার পর তিনজনেই প্রতিবাদ করেছিল। ফলে তিন জনের প্রতিই বিতৃষ্ণ হয়েছেন। পক্ষকাল হয়ে গেল মুখ দর্শন করেন নি।

দু ভাইয়ের কারাবাসে কিছু মন্ত্রী অমাত্য তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ। কিছু বলতেও এসেছিলেন। নীরবে শুনেছেন। কোনরকম মতামত প্রকাশ করেননি। ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মুল করার পর প্রতিবাদী অমাত্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গুপ্তচরের দল চারিদিকে ওৎ পেতে আছে। খুঁজছে ষড়যন্ত্রকারীদের। রাজ্যের চতুর্দিকে অশান্তি। প্রজারা অবাধ্য হয়ে উঠছে। নিয়মিত কর প্রদান করছে না।কঠোর হয়েছেন তিনি। অবাধ্য প্রজাদের বুঝিয়ে দিতে হবে রাজশক্তি দুর্বল নয়। রাজার আদেশ প্রজারা মানতে বাধ্য।

রামপালের সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। রাজ্যের সর্বত্র সে ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়াত। আভিজাত্য-বংশ মর্যাদা সব কিছুই জলাঞ্জলি দিয়েছিল সে। প্রজাদের অবাধ্যতার মূলে যে সেই, তার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করার পরই তিনি তাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। এখন খোঁজা হচ্ছে তার সহযোগিদের। তিনি তাঁর কিছু মন্ত্রী অমাত্যের প্ররোচনায় তাকে কারারুদ্ধ করেছেন, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারাগারে তার স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চলছে। নিশ্চয়ই সে তার সহযোগিদের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য হবে।

বৈমাত্রেয় ভাই রামপাল। আপন সহোদর শূরপাল। তাকেও তিনি কারারুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। জানতেন সঙ্গীত সাধনা ভিন্ন শূরপালের জীবনে আর কিছুই নেই। বাল্যকাল থেকেই উদাসী প্রকৃতির। একরকম জোর করেই তার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। বিবাহের পর কোন রকম পরিবর্তন আসেনি। পত্নী বিয়োগের পর সে আবার তার

পুরাতন জগতে ফিরে গেছে। দিন রাত্রি আপন প্রাসাদেই থাকে। মাত্র কয়েকজন দাস দাসী আছে। তারাই তার দেখাশোনা করে।

সংবাদ পাওয়া গেল সে তার প্রাসাদে সব সময় থাকে না। প্রায় দিনই গভীর রাত্রে বাইরে যায়। অনেক অপরিচিত ব্যক্তি আসা যাওয়া করে তার কাছে। এমনকি রাজ্যের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মচারী, কয়েকজন মন্ত্রীর ও যাতায়াত আছে তার কাছে। এবং সে তাদের সঙ্গে আলোচনাও করে। ইদানীং এই সাক্ষাৎকার ঘন ঘন ঘটছিল।

রাঘবকে দেখলেন তিনি। যমদূত সদৃশ·চেহারা। দুচোখে নিষ্ঠুরতা। রাঘব পারে না এমন কোন কাজ নেই। ভাগ্যবলে ওকে তিনি পেয়েছেন। বললেন, কি রে?'

রাঘব একটু নীরব রইল। ধরাধরা কণ্ঠস্বরে বলল, 'আপনার অমাত্যকে কি অপেক্ষা করতে বলব?'

—'লোহিত?'

ঘাড় নাড়ল রাঘব।

—'সেকি কোন বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে?'

রাঘব উত্তর দিল না।

বুঝতে পারলেন তিনি। দুজনের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব নেই। বললেন, 'শোন রাঘব, জননীকে সংবাদ দিবি, আজ যে কোন সময় আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আর লোহিতকে অপেক্ষা করতে বল।'

আজ্ঞা পেয়ে চলে গেল রাঘব। উঠলেন মহীপাল। সূর্য উঠেছে। ছড়িয়ে পড়েছে হালকা রৌদ্র। কক্ষের পূর্বদিকের গবাক্ষের সামনে গিয়ে সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রাসাদটি ছোট। মূল প্রাসাদ থেকে কিছুটা আলাদা হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। পিতা তাঁর শেষ জীবনে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্তঃপুরে যেতেন না। প্রায় সমস্ত দিনই গবাক্ষের সামনে বসে থাকতেন। মন্ত্রী অমাত্যরা প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতে এলে দ্বিতল থেকে নীচে অপেক্ষা গৃহে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাও সামান্য ক্ষণের জন্য। তাঁর সময়ে রাজসভা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখনও প্রায় তাই।

কিছুক্ষণ পরে অপেক্ষা গৃহে এলেন মহীপাল। লোহিত বসেছিল। তাঁকে দেখে সসব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলেন তিনি, 'কি হল?'

লোহিত বলল, 'বিশেষ প্রয়োজনেই.........'

—'কোন বিপত্তি?'

—'হ্যাঁ।'

—'বল।'

—'গত রাত্রে কারা যেন তরঙ্গময়ীর গৃহে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করেছিল।'

—'কারা?'

—'তা 'অবশ্য........'

—'জানা যায় নি।' গম্ভীর হলেন মহীপাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোহিতকে সামান্যক্ষণ দেখলেন। বললেন, 'প্রহরীর দল কি নিদ্রামগ্ন ছিল?'

লোহিত চুপ করে রইল।

—'কারা অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করেছিল তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা কর। আর কোন সংবাদ আছে?'

—'এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।'

—'কি করছো তুমি?'

—'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি।'

—'চেষ্টা করছো, অথচ কৃতকার্য হতে পারছ না। আশ্চর্য!' সামান্যক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি। লোহিতকে দেখলেন। বাল্যের বন্ধু। কখনো কখনো চিন্তা করলে আশ্চর্য হন। সামান্য এক রাজকর্মচারীর পুত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেমন করে দীর্ঘস্থায়ী হল! এমন হয় নাকি? লোহিতকে তিনি অমাত্য করেছেন। অবশ্য নামে। আসলে লোহিত তাঁর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। লোভী, স্বার্থপর। একসময়, যখন তিনি কৈশোরে উপনীত, সেই সময় লোহিত তাঁর জন্য অনেক কিছুই করেছে। গোপনীয়তা বজায় রেখেছে। এখনও তাঁর জন্য অনেক কিছুই করে। বললেন, 'শোন, আমি চাই না মিথ্যা কাল হরণ কর তুমি।'

মহারাজের কথায় আহত হল লোহিত। মুখমণ্ডল পাংশু হল তার। মুহূর্ত কাল মাত্র। পরক্ষণে মৃদু কণ্ঠে সে বলল, 'আমি যাথাসাধ্য চেষ্টা করছি। যোগাযোগ যে হয়নি তাও নয়। শুধু..........' থেমে গেল সে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে চাইলেন।

—একজন দস্যুকে..........'

—সে জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।' কিছুটা কঠোর ভাবেই বললেন তিনি, 'আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর।'

লোহিত চলে গেল। তার গমন পথের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। মন বিক্ষিপ্ত। ইদানীং তাঁর প্রায়ই মনে হয় লোকটাকে বিদায় করে দেন। লোকটা তাঁর ক্ষণিকের আনন্দ লাভের সুযোগে অনেক ক্ষতি করেছে। কৈশোরকাল ওর জন্যই কালিমা লিপ্ত হয়েছে।

দ্বারপথে রাঘবের মুখ উঁকি দিল।

—'আয়।' আহ্বান জানালেন তিনি।

—'স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে।' বলল রাঘব।

—'জননীকে সংবাদ পাঠিয়েছিস?'

ঘাড়ল নাড়ল সে। বলল, 'পঞ্চমী এসেছে।'

—'কোথায়?'

—'বাইরে অপেক্ষা করছে। তাকে কি.........'

—'পাঠিয়ে দে।'

পঞ্চমী। নপুংসক। কখনো পুরুষ, কখনো নারী বেশ ধরে ঘুরে বেড়ায়। নগরের অবাল বৃদ্ধ বণিতা তার পরিচিত। সর্বত্র অবাধ গতি। এমন কি রাজ অন্তঃপুরেও সে যায়। দেখছেন দীর্ঘদিন।

কক্ষে প্রবেশ করে আভূমি নত হয়ে করজোড়ে পঞ্চমী বলল, 'মহারাজের জয় হোক।'

মৃদু হাসলেন মহীপাল।

—'এই পথে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম রাজবাটির কাছ দিয়েই যখন যাচ্ছি, তখন রাজ দর্শনটা করেই যাই। তবে মহারাজ ভাগ্যে থাকলেও রাজ দর্শন হয় না। দেবতাদের তুষ্ট করার চেয়েও মহারাজের দক্ষিণ বাহুকে তুষ্ট করা যে কি কঠিন কর্ম আজ হাড়ে হাড়ে বুঝলাম।'

জ্বলন্ত দৃষ্টি হানল রাঘব। বলল, 'স্নানের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি মহারাজ।'

ইঙ্গিতে তাকে যেতে বললেন মহীপাল।

পঞ্চমী বলল, 'আপনার ভৃত্যটি খুবই দুর্বিনীত।'

—'এখন বল।'

—'বলছি মহারাজ। অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার আদেশ মত পক্ষকাল নগরের গৃহে গৃহে ঘুরলাম। সর্বত্রই আপনার অপযশ। মধ্যম ভ্রাতা সম্পর্কে নগরবাসীরা খুব বেশি কিছু জানেন না। কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রায় সকলেরই প্রিয়।'

বিকৃত কণ্ঠে মহীপাল জানতে চাইলেন, 'আর কিছু?'

—'আর কি শুনতে চান মহারাজ?'

—'তুমি যা শুনেছো সব কিছুই প্রকাশ কর।'

সামান্যক্ষণ নীরব থাকার পর সে বলল, 'সব কিছু প্রকাশ করার কি প্রয়োজন আছে মহারাজ?'

—'কোথায় কোথায় কি শুনেছো আমি তা জানতে চাই।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মহীপাল।

একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'মহারাজ, নগরের পূর্বদিকেই আপনার কাজের সমালোচনা বেশি।'

নগরের পূর্বদিকে। বরেন্দ্রর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাস। ব্যবসাদার মহাজন শ্রেণীর আবাস গৃহ ওদিকেই বেশি। সাধাণ মানুষ খুব কমই আছে। আবার নগরের অন্যদিকেও কিছু কিছু ব্যবসায়ীর বাসগৃহ আছে। বিগ্রহ পালের সময়ে, মহীপাল যখন থেকে রাজকার্য পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন, মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কর বৃদ্ধি করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা কর বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন। অবশ্য

ব্যবসায়ীদের কর বৃদ্ধিতে সব মন্ত্রী-অমাত্যের সায় ছিল না। রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য পিতাও কর বৃদ্ধি অনুমোদন করেছিলেন।

তিনি বললেন,'ব্যবসায়ীরা আমার প্রতি রুষ্ট তা আমি জানি। সাধারণ মানুষ কি বলছে?'

মৃদু কণ্ঠে পঞ্চমী বলল, 'কুমার রামপালকে সাধারণ মানুষ ভালবাসে মহারাজ।'

—'ভালবাসে ? ভাল। তারা কি করতে চায়?'

—'সাধারণ মানুষ কি করবে মহারাজ? সাধ্য কতটুকু?'

—'তাদের কি কিছুই করার নেই?' ব্যঙ্গ ফুটল তার কণ্ঠে। বললেন, 'তারা কিছুই করছে না বলছো?'

—'তারা দুঃখ করছে মহারাজ।' মৃদু কণ্ঠস্বর পঞ্চমীর। 'আর কি করতে পারে বলুন?'

—'অভিশাপ দিচ্ছে না আমাকে?' হাসলেন তিনি। 'সত্য বল?'

শুনে চুপ করে রইল পঞ্চমী।

মহীপালও একটু চুপ করে রইলেন। চিন্তা করছেন তিনি। ক'বার স্ত্রীবেশী পঞ্চমী নাম্নী নুপুংসকটিকে দেখলেন। তাঁর মনে হল, কিছু লুকাচ্ছে সে। সহজ হবার চেষ্টা করলেন তিনি। বললেন, 'তুমি সঠিক সংবাদ আনতে পারনি পঞ্চমী।'

সে কথা বলল না।

—সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমার কাছে অন্য সংবাদ আছে পঞ্চমী। আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ তোমার কাছে মুখ খুলছে না। অথচ অনেক আশা করে আমি তোমার ওপর দায়িত্বভার দিয়েছিলাম।'

পঞ্চমী মুখ তুলেই মাথা নত করল।

—'তুমি বিফল হবে চিন্তা করতে পারিনি আমি। আশা করেছিলাম সঠিক সংবাদ তুমি সংগ্রহ করতে পারবে।'

—'তাহলে কি........'

—'না-না, তুমি তোমার কাজ করে যাও।' শান্ত কণ্ঠে মহীপাল বললেন, 'আমি সঠিক সংবাদ চাই। হ্যাঁ, আমার গুপ্তচর আছে। তবে তারা মানুষের অন্তঃপুরে ঢুকতে পারে না। আমি তোমার কাছ থেকে অন্তঃপুরের সংবাদ চাই।'

—'আমি চেষ্টা করব মহারাজ।'

—'শুধু চেষ্টা নয় পঞ্চমী, সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে। নগরে রামপালের কিছু হিতৈষী বন্ধু আছে। তারা কারা? বর্তমানে তারা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আমি জানতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে।'

সে চুপ করে রইল।

উঠে দাঁড়ালেন মহীপাল। প্রণাম জানিয়ে নীরবে বিদায় নিল পঞ্চমী। পঞ্চমীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করল রাঘব। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

রাঘব বলল, 'হিজড়েটার পেছনে দুজনকে যেতে বলেছি মহারাজ।'

—'কি বলেছিস তাদের?'

—'বলেছি, সারা দিনে ও কি করে, কোথায় কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে কথা বলে, শুধু দেখবে।

—'ওতো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। সকলের সঙ্গে কথা বলে?'

—বলেছি বিশেষ কোথাও যায় কি না লক্ষ্য রাখতে।'

রাঘবকে দেখলেন তিনি। কথা বললেন না। স্নান করে নিলেন। সামান্য আহার গ্রহণ করলেন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা স্থির আছে। মহারাজ বিগ্রহপাল রাজত্বের শেষদিকে রাজসভায় যেতেন না আর। সভাগৃহ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। তিনি সিংহাসনে বসার পর এখন সভা বসে, তবে নিয়মিত নয়। মন্ত্রণা কক্ষেই রাজকার্য পরিচালনা করেন। উচ্চপদস্থরা উপস্থিত থাকেন।

মন্ত্রণা কক্ষে মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে আলোচনা করলেন। রাজ্যের পরিস্থিতি ভাল নয়। বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থা। আইন শৃঙ্খলারও অবনতি দেখা দিয়েছে। বেড়ে গেছে অপরাধ প্রবণতা। সভা শেষ হলে মন্ত্রী-অমাত্যরা বিদায় নিলেন। সকলে নয়। যাঁরা রইলেন তাঁরা তাঁর অনুগ্রহভাজন। তাঁদের পরামর্শদাতা বলা যাবে না এই কারণে, তিনি কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন না। অনুগ্রহ ভাজনের দলও বিলক্ষণ তা জানেন।

তিনি তাঁদের দিকে চাইলেন। বললেন, 'আপনারা সবই শুনলেন।'

সকলেই নীরব রইলেন।

—'বলুন এ অবস্থায় করনীয় কি?' জানতে চাইলেন তিনি।

তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

—'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে।' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি। 'ঘটছে তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সাহসে ভর করে উত্তর দিলেন একজন।

—'শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দিয়েছে? কেন?' কণ্ঠস্বর রীতিমত গম্ভীর তাঁর।

—'আজ্ঞে..........'

—'বলুন।' অমাত্যের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। জানেন, কেন?'

—'এর জন্য দায়ী কুমার.....'

—রামপাল !

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন উত্তরদাতা।

—'কিভাবে?' তিনি শান্ত, দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন। 'এ বিষয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা করেছেন আপনারা।'

—'তাঁকে কারারুদ্ধ করার জন্য তাঁর পক্ষীয়রা এই অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করেছে মহারাজ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস.....'

—'এ সম্পর্কে আপনি স্থির নিশ্চিত? বাধা দিলেন তিনি। 'মূল্য বৃদ্ধি, শৃঙ্খলাভঙ্গ ...কি করে?'

—'আজ্ঞে মহারাজ, আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান তো তিনিই ছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। তিনি কারারুদ্ধ হবার পর তাঁর পক্ষীয়রা রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছে। এখন তাদের দমন করা কর্তব্য।

—'কাদের?'

—'যারা অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে।' বললেন উত্তর দাতা, 'একটু কঠোর হতে হবে আপনাকে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।'

—'তাদের চিহ্নিত করবেন কিভাবে? তিনি উত্তর দাতাকে দেখলেন। 'কারা অরাজকতা সৃষ্টি করছে?'

—'আজ্ঞে মহারাজ, দাণ্ডিকরা যদি সক্রিয় হয় তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।'

শুনলেন মহীপাল। নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। দাণ্ডিকরাযে নিস্ক্রিয় নয় একথা তিনি জানেন। এ বিষয়ে মহাপ্রতিহারের সঙ্গে তিনি আলোচনাও করেছেন। অমাত্য তাঁকে খুশি করার জন্য এসব কথা বলছেন। মনে মনে বিরক্ত হলেও প্রকাশ করলেন না তিনি। নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে। চিন্তা করতে লাগলেন। একসময় বিদায় দিলেন সকলকে।

বসে রইলেন তিনি। দ্বিপ্রহর। ক্ষুধা অনুভব করলেন, কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করল না তাঁর।

রাঘব এসে একসময় সামনে দাঁড়াল।

—'কি রে!' তার দিকে চাইলেন তিনি।

—'এখন কি অন্তঃপুরে যাবেন? জানতে চাইল সে।

যেতে ইচ্ছা করে না। যেতে হয়। পত্নীদের সান্নিধ্যে অসহ্যবোধ করেন। কন্যা সন্তানদের ভীত সন্ত্রস্ত মুখগুলি মনকে বিরূপ করে তোলে। বালিকা কন্যাটিও এমন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চায়, যা দেখে তাঁর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। নিশ্চয়ই তারা তাদের জননীর কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা শোনে। প্রাসাদের দাসী-পরিচারিকারাও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে। অনেক সংবাদই তিনি অবগত আছেন।

স্বভাবত নারী মন কৌতুহলি। কন্যারা বালিকা হলেও কৌতুহলি মন তাদের পিতার সম্পর্কে অনেক বিরূপ সংবাদই শুনেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। অথচ তিনি তাঁর কন্যাদের যথেষ্ট স্নেহ করেন। অপুত্রকের দুঃখ মনে থাকলেও তাদের অবহেলা করেননি।

যদিও তাদের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সম্পর্ক গড়ে না ওঠার মধ্যে পত্নীদের ভূমিকাও তুচ্ছ নয়।

জানেন, ভাইয়েদের কারারুদ্ধ করার জন্য তিনি সমালোচিত। অন্যের প্ররোচনায় তাদের কারারুদ্ধ করেছেন। মিথ্যা। অনেকেই তাঁকে প্ররোচিত করার চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করার পরই তিনি তাদের কারারুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

—'মহারাজ।' ডাকল রাঘব।

তার দিকে চাইলেন তিনি।

—'মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ প্রায় মহারাজ।'

শুনলেন তিনি। ব্যস্ত হলেন না। ধীরে, আসন ত্যাগ করে উঠলেন। মন্ত্রণা কক্ষের বাইরে এলেন। সেখানে একজন অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখে প্রণাম জানাল। ভ্রুকুটি করলেন তিনি।

—'মহারাজ, আমি কনিষ্ঠ রাজকুমারের সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

—'বল।'

—'তিনি অসুস্থ, সজ্ঞাহীন।'

—'কেন?'

সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝতে পারলেন মহীপাল। প্রতিদিনই রামপালের সংবাদ পাচ্ছেন তিনি। শত পীড়নেও তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করা যায়নি। প্রতি প্রশ্নে তার একটি উত্তর, আমি কিছু জানি না। বললেন, 'বল, আমি কি করতে পারি?'

—'কারাধ্যক্ষ একজন অভিজ্ঞ বৈদ্যের আবেদন জানিয়েছেন আপনার কাছে।' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

নীরবে তার দিকে চাইলেন তিনি। রামপালের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর। অত্যাচারে সজ্ঞাহীন রামপাল। দ্রুত চিন্তা করলেন। যদি তার সজ্ঞা না ফেরে? না, রামপালের মরে যাওয়া চলবে না। প্রয়োজন ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয়। আর যদি সে মারা যায়? না, কিছুই করার নেই তাঁর। বললেন, 'কারাধ্যক্ষ কি খুবই উতলা হয়েছেন?'

সংবাদদাতা মহারাজের প্রশ্নটা বুঝতে পারল না।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'শোন, তুমি ফিরে যাও। কারাধ্যক্ষকে জানাবে কুমার রামপাল পীড়ন সহ্য করতে না পেরে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে তার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষের মতই তার জীবনি শক্তি। অতএব অভিজ্ঞ বৈদ্যের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।' কথা শেষ করে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না মহাধিরাজ মহীপাল।

তিন

রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরল পঞ্চমী। একসময় তার মনের সন্দেহটা বাস্তবে রূপ পেল। মহারাজের প্রধান পরিচারক রাঘবের দৃষ্টি দেখেই তার কেমন সন্দেহ জেগেছিল। এখন দেখল, একজন নয়, দুজন তাকে অনুসরণ করছে। আর তা নিশ্চয়ই মহারাজের সম্মতিক্রমে। তাহলে তার সম্পর্কে সন্দেহ করছেন তিনি?

চিন্তিত হল সে। কিন্তু ভয় পেল না। পথে পথে ঘুরল। সকালের রোদে ঘুরতে ভালই লাগছে তার। যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। ঘুরতে ঘুরতেই পরিচিত জনের সঙ্গে কথা বলছে। নগরে পরিচিতের সংখ্যা তার কম নয়। সেও সাধ্যমত খোঁজ নেয়। তরুনের দল অবশ্য তাকে নিয়ে রঙ্গ করে। কু-দৃষ্টি দেবার মানুষের অভাবও নেই। ঘৃণা করে এমন মানুষও আছে। নপুংসক হয়ে জন্মে সে যেন মহা অপরাধ করেছে।

নগরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে আগের মত খোলামেলা ভাবটা ইদানীং দেখা যায় না। প্রকাশ্যে আলোচনা বন্ধ প্রায়। বিশেষ করে মহারাজ মহীপালকে নিয়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামেরও স্থিরতা নেই। হঠাৎ হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। তা নিয়েও নগরবাসীরা প্রকাশ্যে কোন আলোচনা করেন না। কারণ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলেই শাসনের কথা এসে পড়বে। চরের দল ওৎ পেতে আছে। বিপদ কোন দিক থেকে আসবে কে বলতে পারে! একটা চাপা আতঙ্ক সকলের মধ্যেই। বিশেষ করে মহারাজ তাঁর দু-ভাইকে কারারুদ্ধ করার পর থেকে নগরবাসীরা আরো সতর্ক হয়েছেন। পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলে আগে পথালাপ চলত। এখন তা প্রায় বর্জন করেছেন। দেখা হলে সামান্য কুশল বিনিময় করে যে যার কাজে চলে যান। যেন কত ব্যস্ত।

পঞ্চমী দেখে। নগরবাসীদের গৃহে-গৃহে যে এর প্রভাব পড়েছে তা সে জেনেছে। সেখানে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলোচনায় মেয়েরা তাঁদের মনের ভাব গোপন রাখতে পারেন না। বিশ্বাস করে তার কাছেও বলে। নগরের বহু গৃহেই তার অবারিত দ্বার। সুখ দুঃখের কথা হয়।

জনবহুল রাজপথ ত্যাগ করে সে বিপনন কেন্দ্রে প্রবেশ করল। এখানে বহু শ্রেষ্ঠীই তার পরিচিত। তাকে সাহায্য করেন। অর্থ গ্রহণ করে সে। তার থাকার একটা আস্তানা আছে। নগরের উপকণ্ঠে দু-বুড়ির গৃহে দীর্ঘদিন পূর্বে আশ্রয় পেয়েছিল। দুই বোন তারা। বাল বিধবা। এক বোন কিছুদিন পূর্বে দেহ রেখেছে। তার নাম ছিল মানী। অতি বৃদ্ধা বড় বোন গেনি এখনও জীবিতা। ছোট বোন মানী প্রায় সময়েই অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকত। ছোট বোনের সেবা করত বড় বোন। স্নান করান, রান্না করে খাওয়ান, সব কিছুই। নিজের খাওয়া দাওয়ার কোন ঠিক ছিল না তার। রান্নার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রান্না করতে ইচ্ছা করত না। ইচ্ছা হলে রান্না করত।

মানী তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। দু'বোনের সংসার। পৈত্রিক ভিটে। জমি-জমা-বাগান

বেড় কিছু আছে। ছিল এক দজ্জাল পিসি। মা-ও ছিল দুজনের। মায়ের মৃত্যুর পর দুই বাল বিধবা ভাইঝিকে পিসিই দেখাশোনা করেছে। পঞ্চমী আশ্রয় পাবার মাত্র কয়েক মাস আগে মৃত্যু হয়েছিল বৃদ্ধার। কিশোর পঞ্চমী। তখন তার পুরুষের বেশ। গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে। মায়ের অশ্রুভেজা মুখটা দেখে সহ্য করতে পারেনি। প্রতিদিন তার মাকে তার জন্য সংসারের গঞ্জনা সহ্য করতে হত। তার জন্মের জন্য দায়ী তার মা, এই ছিল সকলের ধারণা। নির্যাতন তাকেও সহ্য করতে হয়েছিল। অনেক চিন্তা করে ঘর ছেড়েছিল। মরতে চেয়েছিল। পারেনি। আশ্রয় পেয়েছিল দুই পৌঢ়ার কাছে। রাত্রিবাসের প্রার্থনা জানিয়েছিল প্রথম দিন।

গেনি তাকে আশ্রয় দিতে চায়নি। গেনি বলেছিল 'না বাছা, এখানে হবে না। আমরা দুই মেয়ে মানুষ থাকি। তুমি অন্য কোথাও যাও।'

পঞ্চমী বলেছিল, 'আজ রাতটুকুই কাটিয়েই চলে যাব। বিদেশ বিভুঁয়ে কাউকে চিনি না তো।'

—'চেননা যখন, মরতে এলে কেন? যাবে কেথায়?

সে চুপ করেছিল।

মানীবালা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোর নাম কি?'

—'পঞ্চমী।' নিজের নাম বলেছিল সে।

চমকে উঠেছিল দুজনে। ভুল করেছিল সে। নাম তার পঞ্চম। পঞ্চম নন্দী। বাড়ি পাণ্ডুনগর। বরেন্দ্রর রাজধানী থেকে দূরত্ব কম নয়। গৃহ ত্যাগ করে পথে নেমেছিল যখন, তখন হেমন্ত শেষ হয় হয়। বসন্ত সমাগমে পৌঁছেছিল বরেন্দ্রতে। আসন্ন সন্ধ্যায় কটি গৃহে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেছিল। কেন যে আশ্রয় পায়নি বুঝতে পারেনি। অবশ্য সে সময় তার খুবই দীন-হীন বেশবাসের অবস্থা। অর্দ্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করতে হয়েছে। পাগলের মত পথ চলেছে শুধু। কোথাও স্থায়ী হওয়ার ইচ্ছা হয়নি। পরিবারকে লজ্জা মুক্ত করতে পথে নামতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ যে পরিবারে সে জন্মেছিল সেখানে কোন অভাব ছিল না। শুধু তার নপুংসক রূপে জন্মটা কেউ-ই মেনে নিতে পারেনি। মেয়েলী গঠন, হাঁটা চলা, ভাব ভঙ্গি, সব কিছুতেই নিজের অজান্তে নারীত্বের প্রকাশ ঘটতো। পঞ্চম হয়ে উঠেছিল পঞ্চমী।

গেনিবালা খরখরে গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল', তুই কে?'

কথাটা বুঝতে পারেনি। হাঁ করে পৌঢ়ার মুখের দিকে চেয়েছিল।

—'কি রে অনামুখো, চুপ করে রইলি কেন? তোর কি বাক্‌রোধ হল?

তবু সে চুপ করেছিল।

সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। কালো হয়ে আসছে চারদিক। খড়ের ছাউনী, মাটির দেওয়াল দুটো ঘরের। অন্যদিকে গোয়াল ঘর, রান্না চালা। বাড়ির চারপাশে মানুষ সমান উঁচু রাং-চিতের বেড়া। বেশ উঁচু জমির ওপর বাড়িটা। আসার সময় দেখেছিল অন্য বাড়িগুলোর

থেকে বেশ খানিক তফাতে বাড়িটা। বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। কটা আম গাছ। একটা মাঝারী পুকুর। বাড়িটার পেছনে বাঁশবন। বাড়ির মধ্যে গোয়ালের ধারে একটা বিশাল কাঁঠাল গাছ। এদিকে শুধু প্রতি বাড়িতে নয়, যেখানে সেখানে কাঁঠাল গাছ।

গেনিবালা আবার ধমকেছিল, 'কিরে। চুপ করে আছিস কেন? মতলবটা কি তোর?'

প্রদীপ জ্বালিয়ে এনেছিল মানীবালা। বলেছিল, 'আঃ দিদি যা করছিস তুই, ভয় পেয়ে গেছে। আগে সুস্থির হতে দে।'

—'সুস্থির!' চোখ কপালে তুলেছিল গেনিবালা। 'তুই কি ওকে ঠাঁই দিবি নাকি?'

—'আজকের রাতটা থাক। নাহলে যাবে কোথায়?'

—'কোথায় যাবে, তার আমরা কি জানি? নিমন্ত্রণ করে তো নিয়ে আসিনি।'

—'যদি বাঘে খায়?'

—'খেলে খাবে। বাঘে খাওয়া কপালে থাকলে তুই কি রোধ করতে পারবি? কেউ পেরেছে আজ পর্যন্ত। দিনে মানে বাছুর, ছাগল টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাঘে। যাও বাছা তুমি তোমার পথ দেখ। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। তোমাকে ঠাঁই দিতে পারলাম না। এসো তুমি।'

অবশ্য সে রাতে তাকে পথে বেরুতে হয় নি। মানীবালার জন্য আশ্রয় পেয়েছিল। নিজের সত্য পরিচয় প্রকাশ করেছিল। কিছুই গোপন করেনি। সব শুনে গেনিবালা বলেছিল, 'অমন বাপ-মায়ের মুখে আগুন। হিজড়ে কি নিজে জন্মেছে, না, জন্ম দিয়েছিস তোরা। হিজড়ে হলেও তো সন্তান। সন্তানকে রক্ষা করতে পারবি না তো বাপ মা হতে সাধ জেগেছিল কেন শুনি?'

বাপ মায়ের দোষ দেখে না সে। বিশেষ করে মায়ের। তার জন্য কি গঞ্জনা সহ্য করেছে তা তো চোখে দেখা। ছোটবেলায় নপুংসকের দল তাকে কবার নিতে এসেছে। নপুংসক সন্তানদের নিয়ে যায় তারা। বড় করে তোলে। নৃত্য গীত শেখায়। উৎসব অনুষ্ঠানে নৃত্য গীত পরিবেশন করে। তাদের আলাদা জীবন। মায়ের জন্যই সম্ভব হয়নি তা। সংসারের সকলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামপতি ছিলেন মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তিনিও সাহায্য করেছিলেন সে সময়। না হলে তার যে কি অবস্থা হত কে জানে!

মানীবালা চুপি চুপি বলেছিল, 'শোন বাপু, আমরা দুই বুড়ি থাকি। তুইও না হয় থেকে যা আমাদের সঙ্গে। দু'বেলা খাওয়া পরার অভাব হবে না। তবে আমার কথায় তো কিছু হবে না। বড় বোন আমার। ওই সংসারের সব। ওর মতটা করাতে হবে তোকে। বুড়ির মুখটা খারাপ হলে কি হয়, মনটা ভাল রে। সকালবেলা স্নান করে এলে পিসি বলে পায়ে পড়বি। দেখবি ঠিক মন গলে যাবে। কি রে বুঝলি কিছু? চিন্তা করে দেখ।'

বুঝেছিল পঞ্চমী। চিন্তা করেছিল। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে যখন দু'চোখে ঘুম নামছে, পাশের ঘরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনেছিল। বড় বোনের গলা পেয়েছিল। পাট-ঝাঁটের শব্দ। খানিক চুপ চাপ। ছোটবোন সব কথাই বলে দিয়েছিল তাকে। অন্ধকার থাকতেই স্নান সেবে নেয় তার দিদি। পোষ-মাঘের কনকনে ঠাণ্ডাতেও। তুলসীতলায় হরি-হরি শব্দে জল ঢালে।

গেনিবালা তুলসী তলায় যখন জল ঢালছে, ঘর থেকে বেরিয়েছিল সে। তাকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল বুড়ি। 'ছ্যা-ছ্যা, সক্কালবেলা হিজড়ের মুখ দেখলাম। নির্ঘাত আজ কপালে অন্ন জুটবে না। রাম-রাম।'

অপরাধী ভঙ্গিতে একপাশে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

গেনিবালা বলেছিল,'মরণ, এত সাত তাড়াতাড়ি উঠতে গেলি কেন?'

—'আজ্ঞে যেতে তো হবে।'

—'যাবিতো বটেই। দুধ কলা দিয়ে আমি তো কাল সাপ পুষতে পারিনা। একটু সবুর করে উঠতে পারলি না। তাহলে তো তোর মুখ দর্শন কবতে হত না।'

—'কি করব বল পিসি, যেতেই যখন হবে মিথ্যে মায়া বাড়িযে কি লাভ বল?' কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল সে।

—'পিসি!' গেনিবালা আবছা অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'আমায পিসি বললি কেন? আমি কি তোর বাপের বোন?'

—'ইচ্ছে হল। আমার তো মাসী পিসি কেউ নেই।' সহজ গলায় বলেছিল।

—'ইচ্ছে হল, না কেউ শিখিয়েছে তোকে?' কটমট করে তার মুখের দিকে চেয়েছিল গেনিবালা।

—'কে শেখাবে। বাবার এক বড় বোন ছিল শুনেছিলাম। ছোটবেলায় মারা গিয়েছিল। বাবারা সাত ভাই, বোন নেই। বোন থাকলে নিশ্চয়ই পিসি ডাকতে পারতাম।'

—'বটে, উঁ-হুঁ।' চোখে সন্দেহ। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোর কথা। মনে হচ্ছে....'

কথাটা শেষ করার আগেই সে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল,'আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কেটে বলতে পারি......'

পা ছোঁবে কার, গেনিবালা সাত হাত দুরে সরে গিয়ে বলেছিল, 'খবরদার, ছুঁবিনে আমায়। ছুঁলে নাইতে হবে। খবরদার।'

দিদির চিৎকারে উঠে এসেছিল ছোট বোন। আর এক প্রস্ত প্রহসন। শেষে আশ্রয় লাভ। মানীবালা স্পষ্ট বলেছিল, 'শোন বাছা, আশ্রয় যে পেলে এ তোমার ভাগ্য বলে জেনো। তবে একটি সর্ত আছে, তোমার ওই পুরুষের পোষাক ত্যাগ করতে হবে। তিনকাল আমাদের গেছে ঠিক কথা, আমরা তো মেয়ে মানুষ। আর তুমি পুরুষ-নারী দুইয়ের-বার। শাড়ি পরতে হবে তোমাকে। নিন্দুকের তো অভাব নেই দেশে। বুঝলে আমাব কথা?'

বুঝেছিল সে। অমত করেনি। পরিবর্তিত হয়েছিল নারীতে। প্রথম প্রথম গৃহেই থেকেছে। সংসারের টুকটাক কাজ করেছে। মহারাজ নয়পালের মৃত্যুর কিছু পূর্বে বরেন্দ্রতে এসেছিল। নয়পালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন বিগ্রহ পাল। মানুষ হিসাবে খুবই ভাল ছিলেন তিনি। কিন্তু রাজ্যশাসন ও পরিচালনার জন্য যে গুণের প্রয়োজন হয়, তা তাঁর ছিল না। অত কোমল হৃদয়বৃত্তি নিয়ে রাজা হওয়া যায় না। ফলে রাজ্য মধ্যে অশুভ শক্তি মাথা তুলেছিল। ধীরে ধীরে মাথা তুলেছিল বণিকরা। তাঁদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন মহারাজ বিগ্রহ পাল। দেখা দিয়েছিল মূল্যবৃদ্ধি। সাধারণ মানুষ পড়েছিল অসুবিধার মধ্যে। বেড়েছিল রাজকর্মচারী, সৈন্যদের জোর জুলুম।

তিন জনের সংসার। অন্নের সংস্থান আছে, প্রয়োজন অর্থের। অর্থ নেই। পঞ্চমী তার মনের কথা জানিয়েছিল। উপার্জনের কথা শুনে দু বোন অবাক হয়ে গালে হাত দিয়েছিল। বলেছিল,—'কি করে অর্থ উপায় করবি শুনি? কোন্ কাজ করবি? কি জানিস শুনি?'

জানে কিছু। পুতুল তৈরি করতে শিখেছিল সেই ছোটবেলায়। সংসারের একধারে থেকে নিজের মনে পুতুল তৈরি করেছে। গ্রামের বাচ্চাদের দিত। পুতুল তৈরি শুরু করেছিল। বিক্রি করার ব্যবস্থাও একটা হয়েছিল। গ্রামের ওই দুই বৃদ্ধার আত্মীয় সুবল, নগরে এক শ্রেষ্ঠীর কাছে কাজ করত। খোঁজ নিত দুই বৃদ্ধার। সময়ে অসময়ে উপকার করত। সে শোনার পর পুতুল নিয়ে নগরে যাওয়া শুরু করেছিল। বিক্রিও কিছু কিছু হত।

চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে আর চলল না। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল সুবল। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ল। একান্ত বাধ্য হয়েই নগরে আসা শুরু করেছিল সে। সেই তার নগরে আসা শুরু। দীর্ঘদিন হয়ে গেল। আগে পুতুল তৈরি করত, এখনও করে। তবে এখন তার আরো অনেক কাজ বেড়েছে। মানীবালার মৃত্যু হয়েছে। অতি বৃদ্ধা হয়ে গেছে গেনিবালা। সংসারের কাজ এখন করতে পারে না। সব করতে হয় তাকে। এমনকি রান্না করতেও হয়। আগে গেনিবালা তার হাতের জল পর্যন্ত ধরত না। ঘৃণা নয়, সংস্কারবশত। সে কথা বলে বুড়ি,—'হিজড়ের ভাত কপালে ছিল। কত পাপ যে করেছিলুম। নরকেও ঠাঁই হবে না আমার।'

হাসে পঞ্চমী। বেশ জোরেই হাসে।

গেনিবালা বলে, 'হাসিসনি আবাগীর বেটি। তোর হাসি দেখলে গা জ্বালা করে। কেন যে মরতে এসেছিলি তুই।'

সে বলে, 'এসেছিলাম তো কি হয়েছে, পরদিন তো চলেও যাচ্ছিলাম।'

—'যাচ্ছিলি। তোর যাওয়ার পথতো সেই মুখপুড়ি বন্ধ করে দিয়েছিল। রাতেরবেলা কেঁদে কেটে একেক্কার। সন্তান স্নেহ জেগে উঠেছিল কড়ে রাঁঢ়ীর বুকে। অথচ পুষ্যি নেবার কথায় রা কাড়তো না। তবে... ..'

চুপ করে থাকত সে।

গেনিবালাই আবার বলেছে, 'আমার কথায় মনে দুঃখু করিস নি। মানীর জন্যে বুকের মধ্যেটা হু-হু করে। আমাকে রেখে চলে গেল। আর তোকে আটকে ছিল বলেই না দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি। তুই যা করিস নিজের পেটের সন্তানও করে না। আগের জন্মে নিশ্চয়ই কেউ ছিলি তুই আমাদের। নাহলে দুই বুড়ির কাছে আসবি কেন বল? কি রে?

সঙ্গে সঙ্গে পথ চলছিল যুবকটি। ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল, 'রাধারানী, কুঞ্জে গিয়েছিলে?'

আড় চোখে দেখল পঞ্চমী। কথা বলল না।

—'কি গো কথা বল।'

তবু নীরব রইল সে।

—'বল, কি দেখলে? কোন সংবাদ কি......'

যুবককে কথা শেষ করতে না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পঞ্চমী। কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে গলা তুলে বলল,—'মরণ, মুখপোড়া, ঘরে কি তোর মা বোন নেই। মস্করা করতে এসেছিস। ভাগ বলছি, নাহলে চিৎকার করব আমি।'

বিস্মিত যুবক কিছু বলতে গেল।

পঞ্চমী বলল, 'হিজড়ের সঙ্গে আশনাই করতে এসেছ, ছিঃ ছিঃ। বুড়োদের নয়, ছোকরাদের দেখছি ভিমরতি হচ্ছে এখন।' হঠাৎ গলা নামিয়ে চোখের ইশারায় যুবককে চলে যেতে বলল সে।

যুবক চলে যাবার আগেই দুজন লোক তাদের কাছে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল, —'কি হয়েছে ভাই?'

পঞ্চমী বলল,'কিছু হয়নি।'

একজন বলল, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি ওকে গালি দিচ্ছিলে কেন?'

অন্যজন যুবকের হাত ধরে বলল, 'বল, কি করেছো তুমি?'

পঞ্চমী বলল, 'আচ্ছা বোকা তো তোমরা। পরস্ত্রীর সঙ্গে ফস্টি-নষ্টি করতে গিয়ে যদি বাধা পাও দোষ স্বীকার করবে, না, সাধু সাজবে?'

—'তুমি কি স্ত্রীলোক?'

—'পুরুষও নই।'

—'তাহলে তোমাকে বিরক্ত করতে গেল কেন ও?'

সামান্য নীরব থেকে কটাক্ষ হানল সে। মুচকি হেসে বলল, 'পুরুষের স্বভাব।'

—'কি বলছো?'

'—যা বলছি ঠিকই বলছি। তোমারা দুটিতে সেই কখন থেকে আমার পিছু নিয়েছো। আমি কি কিছু বুঝতে পারিনি মনে করছো? এখন চিৎকার করে মানুষ জন ডাকি। তারা এসে এর একটা বিহিত করুক।'

প্রমাদ গুনল অসুসরণকারীরা। বলল, 'না-না, তা কেন, আমরা তো পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখলাম.....'

বাধা দিয়ে পঞ্চমী বলল, 'নাগর আমার,-মরণ। চোখে ন্যাবা হয়েছে তোমাদের, চিকিচ্ছে করাগে যাও। দেখেতো ভাল মানুষের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। ঘরে বউ বেটা নিশ্চয়ই আছে। তাহলে হিজড়ের পেছু নেওয়া কেন বাপু? ঘরে যদি না সাধ মেটে পোড়া তলায় যাও। ওখানে আদর করে ঘরে ডেকে নেবে তোমাদের।'

একজন বলল, 'এই শোন তুমি.......'

—'আমি পঞ্চমী।'

—'পঞ্চমী হও, আর যেই হও। আমাদের সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কথা একেবারেই মুখে আনবে না। নগরের অনেকেই তোমাকে চেনে। আমরাও দেখেছি। ওই যুবক নিশ্চয়ই কোন খারাপ ব্যবহার করেছিল। আমরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই.....তা নয়, তুমি আমাদের নামে দোষারোপ করছো।'

—'তোমরা তাহলে আমাকে অনুসরণ করনি বলছো?' মৃদু হেসে ওদের দিকে তাকাল পঞ্চমী।

—'মিথ্যে তোমাকে অনুসরণ করতে যাব কেন বাছা? পথে তো কত লোকই চলাচল করছে। আমরাও......'

—'তোমরাও।' যেন ফুঁসে উঠল সে। হঠাৎ যুবকের দিকে দৃষ্টি পড়তে বলল, 'ও মড়া, তুমি এখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ দেখছি। যাও ভাগো।'

যুবক আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পালিয়ে বাঁচল।

একজন বলল, 'ওকে যেতে দিলে তুমি?'

—'তোমাদেরও ধরে রাখিনি। তবে একটা কথা বলছি, স্বভাব চরিত্তির পাল্টাও বাপু। পোড়া তলার ওদের পাল্লায় যদি পড়ো রক্ষে রাখবে না।'

দুজনেই চুপ। ঠিক সেই সময় একটি সকট এসে সেখানে দাঁড়াল। পৌঢ় চালক একগাল হেসে বলল,—'ও দিদি, এখানে কি করছো গো তুমি?'

পঞ্চমী চালককে দেখে বলল, 'পরাণ দাদা যে। এরা দুজন আমার মামার বাড়ির কুটুম। দেখা হয়ে গেল। পরিচয় পেয়ে আলাপ করছিলাম।'

—'তোমার মামার বাড়ির কুটুম। কি আনন্দের কথা। তা তোমার মামার বাড়িটা কোথায় যেন বলেছিলে দিদি?'

—'দক্ষিণ দ্বার।'

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। ঠাগমার কাছে বাল্যকালে গল্প শুনেছিলাম। ঠাগমা

অবিশ্যি বলতো দক্ষিণ দুয়ার। দ্বার আর দুয়ার একই কি বল দিদি? যেমন প্রাণ আর আমি এই পরাণ। তা যাকগে, আমি যাচ্ছি, তুমি কি এখন ঘরে ফিরবে?'

পঞ্চমী জানতে চাইল, 'তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

—'আজ শুরুই হল না তো শেষ। অবিশ্যি সওয়ারী যে পাইনি তা নয়। পেয়েছিনু। একগাদা এণ্ডি গেণ্ডি নিয়ে দেওপাড়া যাবে। সঙ্গে মাল পত্তর। আমার সুখুর কথা বিবেচনা করে গেলাম না।'

সুখু পরাণের সকটের বাহন। আগে গো-সকট ছিল তার। সুখু কানা আর বুড়ো ঘোড়া। সকটের পরিবর্তন করেছে পরাণ। মালের বদলে এখন মানুষ বয়।

পঞ্চমী পরাণেব সকটে উঠে বসল। সুখুকে ইঙ্গিত করতেই চলতে শুরু করল সে। কিছুদুর যাবার পর পরাণ পেছন ফিরে জানতে চাইল,'কি হয়েছিল?'

পঞ্চমী হাসতে হাসতে বলল, 'যা হয়।'

—'তোমার পেছনে চর লেগেছিল?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে পঞ্চমী বলল, 'ওতো নিত্যি দিনই লেগে আছে। ওর জন্যে আমি চিন্তা করি না।'

পরাণ একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করে বলল, 'বিপদে পড়বে দেখছি।'

পরাণের কথার কোন উত্তর দিল না পঞ্চমী। সে চিন্তা করতে লাগল। নগরবাসীর অন্তঃপুরের সংবাদ জানার দায়িত্ব বেশ কিছুদিন হল তার ওপর দিয়েছেন লোহিত। মহারাজের বয়স্য। নামে অমাত্য। সম্মত না হয়ে তার উপায় ছিল না। এতদিন লোহিতকেই মধ্যে মধ্যে সংবাদ জানাত। কদিন হল মহারাজ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট ছিল সময়। তার মনে হল সন্দেহের উর্দ্ধে সে নয়। সেই জন্যই তার পেছনে চর লেগেছিল। ভবিষ্যতে কি হবে সে জানে না।

মহারাজ মহীপালের শাসন মানুষ মানতে পারছে না। অসন্তোষ দানা বাঁধছে। রাজকর্মচারী, শান্তি রক্ষকদের জুলুম বাড়ছে। নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। হু-হু করে সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে মানুষ। অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে। সন্দেহ বশত দাণ্ডিকের দল তরুণদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চমী আগেভাগে কিছু কিছু সংবাদ এনে দেয়। সাবধান করে।

সুখু ঠুক-ঠুক করে চলছে। পরাণের সকট যেন গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে পরাণ তার হাতের চাবুক ঘুরিয়ে শুন্যে আওয়াজ করছে। সুখুর ছোটার কোন ইচ্ছাই নেই।

পঞ্চমী বলল, 'হ্যাগো দাদা, তোমার সুখু কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

পরাণ কোন উত্তর দিল না।

একটু অপেক্ষা করে পঞ্চমী ডাকল, 'ও পরাণ দাদা।'

—'বল, শুনছি।'

—'তুমি কি ঘুমাচ্ছ নাকি?'

পরাণ কিছু বলল। কি বলল বোঝা গেল না।

—'তোমার সুখুটাকে এবার পাল্টাও। বুড়ো হয়ে গেছে। আর পারছে না।'

—'না পারলেও উপায় নেই। ঘোড়াতো গাছে ফলে না এখানে। ভাগ্যে ছিল তাই সুখুকে পেয়ে গিয়েছিলাম। হলেই বা কানা।'

পঞ্চমী বলল, 'তা বটে।'

পরাণ বলল, 'তুমি কি করবে?'

—'আমি!' পরাণের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হাসল পঞ্চমী। বলল, আগে ঘরে তো পৌঁছাই। পিসিকে গিয়ে বলি। দেখি কি করা যায়। তবে কিছু একটা করতে হবে। আচ্ছা পরাণদাদা, তুমিই বল না কি করা যায়?'

—'আমি।' মাথা চুলকাল পরাণ। 'কি বলি বলতো?'

হাই তুলল পঞ্চমী। বলল, 'শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। আচ্ছা কদিনের জন্যে যদি জ্বরে পড়ি, কেমন হয় বলতো?'

পঞ্চমীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল পরাণ। কি বলবে ভেবে পেল না।

চার

রামপাল জননী নীরবে বসেছিলেন। পুত্র কারাগারে। আকাশে অপরাহ্নের আলো। পুত্রের কথা চিন্তা করে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। কারাগারে তাকে কি অবস্থায় রাখা হয়েছে জানেন না। জানেন, বন্দীদের ভালভাবে রাখা হয় না। পুত্রকে কিভাবে রাখা হয়েছে জানার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু যে জানতে পারেন নি তা নয়, জানেন না তার মধ্যে প্রকৃত সত্য কতটা। যা জানতে পেরেছেন তা যদি সত্য হয়......শিউরে উঠলেন তিনি।

গবাক্ষপথে অপরাহ্নের আকাশের দিকে চাইলেন। পক্ষকাল পূর্বের কথা মনে পড়ল তাঁর। কয়েকদিন হল রাজধানীতে ছিল না পুত্র। তাঁর অনুমতি নিয়েই সে পুণ্ড্রবর্ধন গিয়েছিল। সন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর গৃহে গিয়েছিল সে। সন্ধিবিগ্রহিকের কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিল। পৌঢ় মানুষটি কুমারকে খুবই স্নেহ করেন। নিজে এসেছিলেন, কুমারকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করতে। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পরে কুমারের ফেরার সংবাদ পেয়েছিলেন। কুমারের প্রধান ভৃত্য গঙ্গা এসে জানিয়ে গিয়েছিল। সেও সঙ্গে গিয়েছিল। কুমার এল অপরাহ্নের সামান্য আগে। প্রণাম করে জড়িয়ে ধরেছিল তাঁকে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, দুশ্চিন্তা মুক্ত হলে তো?'

—'দুশ্চিন্তা!' বিস্মিত হয়েছিলেন। 'কিসের দুশ্চিন্তার কথা বলছো তুমি?'

—'আমার জন্য চিন্তা হয়নি?

—'তাই বল।' দুশ্চিন্তা বলছো কেন?' হাসবার চেষ্টা করেছিলেন।

—'ফিরে শুনলাম.....'

—'কি শুনেছো ফিরে এসে?'

হেসেছিল কুমার। জোর করে তাঁকে বসিয়ে বলেছিল, 'পথ দীর্ঘ। পথের কষ্টও কিছু কম নয়। তবে সন্ধিবিগ্রহিকের কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলাম।'

—'মিশে যেতে পেরেছিলে?' অবাক হয়েছিলেন। 'সেটা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল?'

—'কেমন করে?' একটু আনমনা হয়েছিল সে। হাসি মুখে তাঁর দিকে চেয়ে জানতে চেয়েছিল, 'প্রশ্নটা তোমাকেই করলাম আমি।'

—'আমাকে?' তিনি বলেছিলেন, 'উৎসবস্থলেতো আমি ছিলাম না। আমার পক্ষে কেমন করে বলা সম্ভব বল?'

সামান্য নীরব থেকে কুমার বলেছিল, 'উনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন। বাল্যকাল থেকেই ওনার গৃহে যাই। কেন জান? ওনার অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা আমার খুবই ভাল লাগে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উনি। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার গুরুদায়িত্ব ওনাকে বহন করতে হয়। পদ মর্যাদায় অন্যান্য মন্ত্রী, অমাত্যদের থেকে অনেক উচ্চপদে আসীন। কিন্তু রাজধানীতে যখন থাকেন, তখন সাধারণ জীবন যাপন করেন। গৃহ ভৃত্যের সঙ্গেও আন্তরিক ব্যবহার করেন।' আবার সামান্যক্ষণ নীরব থেকে বলেছিল, 'ওনার গৃহে গিয়ে দেখলাম বরেন্দ্রর সন্ধিবিগ্রহিক গ্রামের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের একজন। সকলের সঙ্গেই সহজ, সরল ব্যবহার।

—তুমি কেমন করে সকলের সঙ্গে মিশে গেলে?' জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

মৃদু কণ্ঠে সে বলেছিল, মিশতে আমার পরিচয় অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।'

—'অর্থাৎ?'

—'অর্থাৎ আমি ওনার গৃহে বরেন্দ্রর একজন নিমন্ত্রিত রূপেই উপস্থিত হয়েছিলাম।'

—'তোমার পরিচ্ছদ?'

—'আমি বরেন্দ্রতে ত্যাগ করে গিয়েছিলাম।'

—'তুমি সাধারণের ছদ্মবেশে উৎসব গৃহে উপস্থিত হয়েছিল?

—'তাই।' গম্ভীর হয়েছিল কুমার। 'অবশ্য এর জন্য কষ্টও উনি পেয়েছেন। আদর যত্নের ত্রুটির জন্য বারবার দুঃখ করেছেন। কিন্তু ওনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে তবেই আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। এবং আমি যে ওনার কন্যার বিবাহে যাব সে কথা গোপন রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন।'

—'ওনার কন্যার বিবাহে রাজধানী থেকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিতের দল গিয়েছিলেন?'

—'অবশ্যই গিয়েছিলেন।'

—'তাঁরা তো তোমার পরিচিত?'

—'যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছ থেকে দূরে ছিলাম আমি।'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলেছিলেন তিনি। প্রশ্ন করেছিলেন, 'এতে তোমার লাভ কি হল?'

—'লাভ?' চিন্তা করেছিল সে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'উৎসব গৃহে সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। সকলের একজন হয়ে উঠেছিলাম। জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।'

পিতার মতই পুত্রের মনের গঠন হয়েছে। অবয়ব পিতার মতই। হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। উন্নত রুচি। স্বভাবে এতটুকু উগ্রতা ছিল না। শুনেছেন মন্ত্রীদের বিশ্বাস করতেন। প্রজাদের মঙ্গল চাইতেন। নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন। মনে দুঃখ ছিল। কষ্ট পেতেন। প্রকাশ করতেন না। জীবনের শেষার্দ্ধে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়ে গিয়েছিলেন। কেন, জানতে পারেন নি। প্রশ্ন করেও উত্তর পাননি।

—'জান, সন্ধিবিগ্রহিকের মনে খুবই কষ্ট।' বলেছিল কুমার।

—'কষ্ট।' চমকে উঠেছিলেন তিনি।

—'হ্যাঁ, উনি অপুত্রক।'

কুমারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি।

—'ওনার পরিবার পরিজন কেউ-ই রাজধানীতে থাকেন না। কখনো-কখনো তাঁরা এসেছেন। অবশ্য তাঁরা আসার পর আমি কখনো যাইনি। তিনি কোনদিন তাঁর পরিবারের বিষয়ে আমাকে কিছু বলেন নি। কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়ে শুনলাম। ওনার পত্নীকেও দেখলাম। তাঁর মনেও খুব কষ্ট। আর....'

তিনি পুত্রের মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

—'তিনি কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি।'

—'কেন?'

—'বিদায় মুহুর্তে তিনি সকলের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলাম, একাজ আপনি কেন করলেন? তিনি স্বস্নেহে বলেছিলেন, কুমার, নিজের কাছে অপরাধী থাকতে চাই না বলেই একাজ করেছি আমি। তাছাড়া আমার পরিবারের কাছে তুমি শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে। তুমি বরেন্দ্রাধিপতির পুত্র হয়েও কত সহজে সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলে। আমি বরেন্দ্ররাজের সন্ধিবিগ্রহিক, এজন্য আমার পরিজনরা মানুষের কাছে আলাদা সমীহ কামনা যাতে না করে, সেই জন্যই তোমার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। তুমি জন্ম সূত্রে রাজকুমার, রাজকুলে জন্মেছ তুমি। আর আমি কর্মসূত্রে সন্ধিবিগ্রহিক হয়েছি। আমার পরিবারের আর কেউ রাজকর্ম লাভ করবে কি-না তার কোন স্থিরতা নেই। রাজকুমার হয়েও তুমি সকলের একজন যদি হতে পার, পরিবারের একজনের জন্য অহঙ্কার কেন থাকবে আমার পরিজনদের।'

তিনি শুনেছিলেন। পুত্রের জন্য গর্ব অনুভব করেন। শিক্ষায় কখনো অমনযোগী হয়নি পুত্র। শুনেছেন অস্ত্র বিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছে। সাহসী। শুধু......

চিন্তা করতে পারেন না তিনি। কষ্ট হয়। পুত্র তাঁর ষড়যন্ত্রকারী এ অভিযোগ মেনে নিতে পারেন নি। মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করতে কুমার রামপাল কিছু মন্ত্রী, অমাত্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তিনি বিশ্বাস করেন না।

পরিচারিকা এসে বলেছিল, কয়েকজন দাণ্ডিক এসেছে।'

'দাণ্ডিক!' অবাক হয়েছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দাণ্ডিক এসেছে কেন?'

—'তারা কুমারকে খুঁজতে এসেছে। বলেছিল পরিচারিকা।

বুঝতে পারেননি তিনি। জানতে চেয়েছিলেন, 'দাণ্ডিক কুমারকে খুঁজতে এসেছে কেন?'

—'সে কথা আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম।' পরিচারিকা বলেছিল, 'কুমার এসেছেন শোনার পর সংবাদ দিতে বললে। কুমারের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাদের।'

রামপাল উঠে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাকে বসতে বলে পরিচারিকাকে নিয়ে দ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্তরাল থেকে দেখতে পেয়েছিলেন একদল দাণ্ডিককে। নিজের উপস্থিতি জানিয়ে পরিচারিকাকে দিয়ে তাদের আসার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। তারা জানিয়েছিল, মহারাজের আদেশে তারা কুমারকে বন্দী করার জন্য এসেছে।

—'কুমারের অপরাধ?' জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

তারা নীরব ছিল।

—'কি হল, তোমরা নীরব কেন? শোন, কোন্ অভিযোগে তোমরা কুমারকে বন্দী করার জন্য এসেছ তা না জানালে আমি কুমারকে নিয়ে যেতে দেব না।'

—'মহারাজের আদেশ।' বলেছিল একজন। 'আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে এসেছি।'

—'অথচ আমার পুত্র কোন্ অপরাধে অপরাধী তা তোমরা জান না। শোন, মহারাজকে গিয়ে জানাও আমি তোমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছি।'

—'বাধা অমান্য করার আদেশও তিনি দিয়েছেন।'

—'অর্থাৎ, বল প্রয়োগ করবে?'

তারা উত্তর দিতে পারেননি। পরস্পরের মুখের দিকে চেয়েছিল।

রামপাল ডেকেছিল, 'মা।'

—'তুমি এলে কেন?'

—'রাজাদেশে বাধা সৃষ্টি করো না।'

—'ওরা তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে।'

—'তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারবে?' হাসিমুখে জানতে চেয়েছিল সে।

তিনি উত্তর দিতে পারেননি। আশঙ্কায় তাঁর সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল সে। তিনি নিথর পাষাণে পরিণত হয়েছিলেন। বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল রামপাল।

জেনেছিলেন ষড়যন্ত্রের অপরাধে মহীপাল তাকে বন্দী করেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতালাভের জন্য মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল কনিষ্ঠ রামপাল। সেই রাত্রেই বন্দী করা হয়েছিল শূরপালকে। তার অপরাধ, কনিষ্ঠকে সমর্থন করা। দু'জনেই পক্ষকাল হল বন্দীশালায়।

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। পুত্রের ভবিষ্যত চিন্তা করে বুকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল। বরেন্দ্রতে আপনজন বলতে একজনও নেই। সন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী পুণ্ড্রবর্দ্ধনে। তাঁর কথা মনে হয়েছিল। কন্যার বিবাহের পর রাজধানীতে এখনও প্রত্যাবর্তন করেননি। তিনি থাকলেও কুমারকে রক্ষা করতে পারতেন কি?

দু'বছর পূর্বে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছিল ভাই মহণ। দুজনে পরস্পরকে দেখেছিল তারা। প্রায় সমবয়েসী। সামান্য সময়ের মধ্যেই সখ্যতা জন্মেছিল দুজনের মধ্যে।

মহণ প্রস্তাব করেছিল, ভাগিনেয়কে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

কুমার বলেছিল, 'আমি মাতুলের সঙ্গে যেতে চাই মা।'

—'আমি কি করবো?' জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—'তুমিও সঙ্গে যাবে।'

—'তা কিভাবে সম্ভব?'

—'কেন সম্ভব নয়?' কুমার বলেছিল, 'তুমিও তো দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে যাওনি।'

সত্যই তাই। এই নিয়ম। মাতার মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন পূর্বে একবারই মাত্র পিত্রালয়ে গমন করেছিলেন। তাও মাত্র পক্ষকালের জন্য। রাষ্ট্রকূটের সংবাদ পান। পিতা নানান উপহার, উপঢৌকন পাঠান কন্যার জন্য। সংবাদ আদান প্রদান হয়। কিন্তু সাধারণ ঘরের বিবাহিতা কন্যাদের মত পিত্রালয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই বরেন্দ্রর রাজপরিবারে। শুধুমাত্র আপনজনের দেহান্তে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যৌবনশ্রী পুত্রের কথায় নীরব ছিলেন।

রামপাল বলেছিল, 'কি হল, তুমি নীরব রইলে কেন?'

তিনি বলেছিলেন, 'আমি চিন্তা করে দেখি।'

চিন্তা করেছিলেন তিনি। শারিরীকভাবে পিতা খুব একটা সুস্থ নন। ভাইয়ের সঙ্গে একজন অমাত্যকেও তিনি বরেন্দ্রতে পাঠিয়েছেন। কন্যাকে দেখার বাসনা জানিয়ে অনুরোধ পত্রও পাঠিয়েছেন পিতা।

অন্তঃপুরের কর্ত্রী স্বামীর পিতৃস্বসা। অনেক চিন্তার পর পিতার অনুরোধ পত্র বৃদ্ধার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। পিতার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন তাঁকে।

বৃদ্ধা জানতে চেয়েছিলেন, 'তুমি যা বললে পত্রে কি সেই কথাই লেখা আছে?'

—'মনে হয়। আমি পত্র পাঠ করিনি। তাছাড়া পিতা যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি আপনার অনুমতির জন্য:....'

—'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। না-না, সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নেই। তোমার পিতা অসুস্থ, এ অবস্থায় বাধা সৃষ্টি করাও উচিৎ নয়। তোমার পিতৃগৃহ যাত্রার ব্যবস্থার ত্রুটি হবে না।'

আশ্বস্ত হয়েছিলেন তিনি। অন্তঃপুরকর্ত্রীকে কোনদিনই ভাল লাগেনি তাঁর। নববধূরূপে বরেন্দ্রতে আসার পর থেকে অন্তঃপুর কর্ত্রীর ব্যবহারও ভাল দেখেননি। শুধু তাঁর প্রতি নয়, পিতৃস্বসা রোহিনী বেশ দাম্ভিক, অহঙ্কারী প্রকৃতির মহিলা। তখন তিনি বৃদ্ধা হননি, যৌবনের অন্তিম সীমায়। খিটখিটে মেজাজ। সকলেই তাঁকে ভয় করতেন। দাসীরা তটস্থ হয়ে থাকত। এখন বৃদ্ধা। কিন্তু সেই মেজাজ অপরিবর্তিত।

রোহিনীর কথা শুনেছিলেন তিনি। মহীপাল কন্যা রোহিনী। সেনাপতি পূর্ণর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। সেনাপতির প্রতি কৃতজ্ঞ মহীপাল নির্দ্বিধায় কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। রোহিনী বীর যোদ্ধা স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে পারেন নি। অনেকেই বলেছে তাঁর অবুঝ আচরণপূর্ণ পত্নীকে ত্যাগ করে সেনাপতি বরেন্দ্র থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। রোহিনী ফিরে এসেছিলেন পিতার কাছে।

পিতৃদর্শনে যাওয়া স্থির হয়েছিল। কিন্তু যাওয়া হয়নি। রোহিনী বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। পরদিন তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, 'পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি তোমাকে দিয়েছি। অসুস্থ পিতাকে দেখতে যাওয়া উচিৎ বলেও আমি স্বীকার করছি। তবে আমার মনে হয় এ সময় রাজ্য ত্যাগ না করাই তোমার পুত্রের পক্ষে উচিৎ হবে।'

কিছু বুঝতে পারেননি তিনি।

মৃদু কণ্ঠে রোহিনী বলেছিলেন, 'আরও একটা কথা তোমায় জানাচ্ছি। অঙ্গরক্ষক ব্যতীত তোমার পুত্র যেন কোথাও গমনাগমন না করে। তাকে তুমি সতর্ক করে দিও।'

যৌবনশ্রী আকাশের দিকে চাইলেন। দিনের আলো ম্লান হচ্ছে। পরিচারিকা সাগর এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। বিবাহের পর পিত্রালয় থেকে তার সঙ্গে এসেছিল। পৌঢ়া। বলল, 'আলো দেব?'

সাগরের দিকে চাইলেন তিনি। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এখন থাক।'

—মহারাজ আসবেন।'

—'কে বলল?'

—'কর্ত্রী সংবাদ পাঠিয়েছেন।'

কথা বললেন না যৌবনশ্রী। মহীপাল কেন আসছে বুঝতে পারলেন না। রোহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অসুস্থা।

মহীপাল এলেন। মহারাজকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ইঙ্গিতে তাঁকে নিরস্ত করে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কুমার জননী, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মার্জনা করবেন।'

যৌবনশ্রী বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন মহরাজ।'

সম্বোধনে একটু বিস্মিত হলেন মহীপাল। সম্পর্কে জননী। একসময় তাঁর নাম ধরেও ডাকতেন রামপাল জননী। বললেন, 'আজ কি আর পুরাতন সম্বোধনে ডাকা যায় না কুমার জননী?

—'তা কি শোভন হবে মহারাজ'? মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি।

চিন্তিত হলেন মহীপাল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ওষ্ঠে। আসন গ্রহণ করে বললেন, 'বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার কাছে এসেছি।'

তিনি তাঁর দিকে চাইলেন।

—'আপনার পুত্র কারারুদ্ধ।'

—'জানি।' মৃদু কণ্ঠে বললেন যৌবনশ্রী।

—'কেন তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে তা কি জানেন?'

—'শুনেছি।'

একটু সময় নিলেন মহীপাল। বললেন, 'গুরুতর অভিযোগে সে অভিযুক্ত।'

যৌবনশ্রী নীরব রইলেন।

—'আমি চাই না তার কোন ক্ষতি হোক।'

তিনি মহীপালকে দেখলেন।

—'কারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের কথা তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। সে কিছুই প্রকাশ করছে না।' একটু নীরব রইলেন তিনি। বললেন, 'জানি, তাকে প্রলোভিত করা হয়েছিল। সে অল্প বয়স্ক। অপরিণত। কিন্তু.....'

যৌবনশ্রী মুখ তুললেন। কিছু বলতে গেলেন। বললেন না।

—'আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন না?' বললেন মহীপাল।

—'আমি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি ভাবে?'

—'যদি কুমারকে বুঝিয়ে......তার ব্যবস্থা করা হবে। আমার মনে হয় কুমার আপনার কথা শুনবে।'

চিন্তা করলেন তিনি। বললেন, 'আমার পুত্র যে ষড়যন্ত্রকারী তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন মহীপাল। বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কারা লিপ্ত আমি তাদের পরিচয় জানতে চাই।'

—'পুত্র কি তাহলে মুক্তি পাবে?'

—'আমি বিবেচনা করব। কোনরকম গুরুদণ্ড নিশ্চয়ই তাকে দেব না। নাহলে.....'

—'প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন?'

চমকে উঠলেন মহীপাল। রামপাল জননীকে দেখলেন। কথা বলতে পারলেন না।

ধীর শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'মহারাজ, পুত্র যদি অপরাধী হয়, নিশ্চয়ই তার অপরাধের শাস্তি বিধান করবেন। কারণ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সেও অংশ ভাগি। কাদের সঙ্গে সে ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল তাদের নাম প্রকাশের কথা তাকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মহীপাল। রামপাল জননীর ভিন্ন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করলেন। নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে বললেন, 'তার ফলে.....'

বাধা দিলেন তিনি। বললেন, 'মহারাজ তাঁর কর্তব্য করবেন।'

মহীপাল আর একটি কথাও বললেন না।

পাঁচ

সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। তরঙ্গময়ী স্থানুর মত বসেছিল। বুঝতে পারছে না সে কি করবে? কি করা কর্তব্য তার। ক্লেদাক্ত জীবন। বরেন্দ্রাধিপতি মহীপালের রক্ষিতা সে। তার এই জীবনটার জন্য দায়ী......না, কাউকে সে দায়ী করতে চায় না। তার ভাগ্য, ভবিতব্য। ভবিতব্য না কি খণ্ডন করা যায় না। বিধাতার লিখন। ভাগ্য বিধাতা। ললাটের লিখন কেমন করে মুছবে সে। এ লিখন সূতিকাগারেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। শুনেছে তাই। বিধাতা পুরুষ লিখে দেন। বিধাতা পুরুষ তরঙ্গময়ীর ললাটেও লিখে দিয়েছিলেন।

বৈশ্য কন্যা তরঙ্গময়ী। বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল তাদের। গঞ্জে ব্যবসায় ছিল। ব্যবসার অর্থে প্রতিপালিত হত সংসার। ছিল জমি-জমা। লক্ষ্মী নাকি উপছে পড়েছিল বৈশ্য পরিবারে। পিতা ছিলেন পরিবারে বড় তরফের কনিষ্ঠ সন্তান। ব্যবসায় ছিল তীক্ষ্ম বুদ্ধি। তার জন্মের আগে মা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিল কিন্তু সূতিকাগৃহেই মৃত্যু হয়েছিল তার। দুবছর পর তরঙ্গময়ীর জন্ম। এবার সে নয়, চৌদ্দ দিনের মাথায় মায়ের মৃত্যু হল। নবজাতিকাকে লালন পালনের জন্য পত্নীর মৃত্যুর পর বৎসর পার হওয়ার আগেই পিতা আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তার যখন মাত্র তিন বছর বয়স, পিতা সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শ্বশুরালয় পাণ্ডু নগরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই বড় হয়েছে তরঙ্গময়ী।

অপুত্রক শ্বশুরের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন পিতা। উদয় অস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতেন তিনি। সংসারের কর্ত্তৃ ছিলেন বিমাতা, পুত্রহীনা। জ্ঞান হবার পর মায়ের স্নেহলাভে বঞ্চিতা ছিল সে। ছিল কঠোর শাসন-নির্যাতন। সন্তান হীনা রমনী তাকে নির্যাতন করে আনন্দলাভ করতেন। অর্থের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড মোহ। পিতাকে করে তুলেছিলেন দাস।

বড় একা হয়ে গিয়েছিল সে। বিমাতার ভয়ে প্রতিবেশী বালক বালিকাদের সঙ্গে

মেশার উপায় ছিল না। সংসারের কিছু কিছু কাজও তাকে করতে হত। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বিমাতা দিবা নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন। বালিকা তরঙ্গময়ী গৃহের পশ্চাতে উদ্যানে একা-একা ঘুরে বেড়াত। পুষ্করিণীর ধারে বসে মাছেদের খেতে দিত।

গৃহের সামনের দিকে যাওয়ার নিষেধ ছিল তার। প্রতিবেশী গৃহের বালক বালিকাদের দেখা যেত সেদিকে। পশ্চাৎদিকে সে আশঙ্কা ছিল না। সেই জন্যই বিমাতা নিশ্চিন্তে দিবা নিদ্রা দিতেন।

উদ্যানে একা একা ঘুরে বেড়াত তরঙ্গময়ী। বিশাল উদ্যান। ফলের গাছ। আম কাঁঠাল, জামরুল, অল্প কটা নারকেল গাছ। কলা আর আনারসের ঝোপ। আগাছার জঙ্গল ছিল। নিম, বাবলার বন। অপরিচিত আরো অনেক গাছ। বেশী দূরে যেত না। পুকুরধারে-আশপাশে বসে থাকত চুপটি করে। বসে বসে চিন্তা করত। পিতার কথাই মনে পড়ত তার। সূর্যোদয়ের আগে বেরিয়ে যেতেন। কোন কোন দিন ফিরতেন বেশ রাত্রে। ফিরে বিশ্রাম না নিয়েই বিমাতাকে আদায় উসুলের হিসাব দিতে বসতেন। পাশের ঘরে শুয়ে শুনতে পেত সে। মাঝে মাজে বিমাতার গঞ্জনাও কানে আসত। জমিজমার দেখাশোনা ছাড়াও গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঋণ দেওয়ার ব্যবসা করেন পিতা। হিসাব বুঝে নেন বিমাতা।

কষ্ট হত তার। নিজের কষ্টের চেয়েও পিতার কষ্টটা তার বুকে বাজত। অথচ পিতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল পরিচিত জনের মতই। দেখা হলে দু-একটা কথা বলতেন মাত্র। ব্যস্ততার সীমা থাকত না তাঁর।

মধ্যাহ্নে পুষ্করিণীর ধারে বসে চিন্তা করত সে। আবার কখনও পাখিদের ডাক শুনত। প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি করত ধরার জন্য। গুন গুন করে গান গাইত নিজের মনে। সংসারে এক পৌঢ়া দাসী তাম্বুল মুখে দিয়ে নিজের মনেই কাজ করে আর গান গায়। তার কাছেই শেখা। আবার কখনো বা নিজের মনেই নৃত্য করে। কেন করে, বুঝত না সেদিন।

এমনি একদিন নৃত্য গীত করতে করতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সামনে দাঁড়িয়ে ভিখারিনী সুবলা। পক্ষকালে একবার আসে। ভিক্ষা নিয়ে যায়।

গৃহের দাসীদের আলোচনা থেকে সুবলা সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পায়। দেহ পসারিণী সুবলা। পাণ্ডু নগর একসময় ব্যস্ত জনপদ ছিল। বরেন্দ্রর কোন রাজা নাকি পাণ্ডুনগরে রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনেকগুলি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজকর্মচারীদের বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডুনগর হয়ে উঠেছিল কর্মচঞ্চল।

পুনর্ভবা নদীর ধারে ছিল রাজকর্মচারীদের গৃহ। বাণিজ্যেরও প্রসার হয়েছিল। দীর্ঘদিন আগে বর্ষায় হঠাৎ-ই পুনর্ভবা নদীতে জলস্ফিতি দেখা দিয়েছিল। ভেসেছিল পাণ্ডু নগর। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল রাজ কর্মচারীদের গৃহগুলি। পাণ্ডুনগরের অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল রাতের নিঃশব্দ বন্যায়।

নগরের একধারে গড়ে উঠেছিল নিষিদ্ধ পল্লী। দেহ পসারিণীদের আস্তানা। বরেন্দ্রর

রাজধানীর একপ্রান্তে পোড়াতলার কাছাকাছি পসারিণীরা থাকে। লোহিতের কথায় জেনেছে। তার কথার অবাধ্যতা করলে সেখানে পাঠিয়ে দেবে তরঙ্গকে, শাসিয়েছে বেশ কয়েকবার।

সুবলা ছিল পসারিণী। পাণ্ডুনগরের অনেকেই জানে সে কথা। অনেকের মতই তাকেও একদিন ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল। শেষ পরিণতি।

পক্ষকাল অন্তর একদিন ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আসত সুবলা। গৃহের দাসীর হাতেই বিমাতা ভিক্ষা পাঠাত। কখন কখন সেও দিত। ভিক্ষা নিয়ে সুবলা উচ্চারণ করত, 'বেঁচে থাক মা, রাজরানী হও।'

নির্জন মধ্যাহ্নে সুবলাকে দেখে চমকে উঠেছিল বালিকা তরঙ্গ। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল।

সুবলা বলেছিল, 'এই পথেই ফিরে যাচ্ছিলাম। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে তোমাকে দেখে চলে এলাম। বেশ নাচ তো তুমি। কার কাছে শিখলে?'

তরঙ্গর বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে তখন। দাসীদের কথা শুনেছে সে। তারা বলে, 'এইসব নষ্ট দুষ্টু মেয়ে মানুষরা ভিক্ষে করতে বেরিয়ে ছোট মেয়েদের খোঁজ করে। ফুসলিয়ে নিয়ে যায়।'

কোথায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে কি করে সে কথাও তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে। তবে তাদের সে আলোচনা শেষ পর্যন্ত শোনেনি তরঙ্গ। খুবই খারাপ আলোচনা সে সব। বালিকা হলেও সেটুকু বোঝবার মত বোধ বুদ্ধি তখন তার হয়েছিল।

সুবলা বলেছিল, 'কার কাছে নাচ শেখোগো?'

তরঙ্গ তবু চুপ করেছিল।

সুবলা বলেছিল,'বুঝেছি নিজে নিজেই শিখেছ। শিখবে আমার কাছে?'

—'না।' মাথা ঝাঁকিয়েছিল সে।

—'শিখলে দোষ কি?'

—'আমি তোমার কাছে শিখবো না।' ঘাড় শক্ত করে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল সে।

তারদিকে চেয়েছিল সুবলা। তাকে দেখেছিল। ম্লান হয়েছিল তার মুখ। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'বুঝতে পারছি কেন একথা বললে তুমি। ধরে নিয়ে যাব—না?'

চমকে উঠেছিল তরঙ্গ।

সুবলা বলেছিল, 'হ্যাগো মেয়ে এই কথাই রটে আছে। গৃহস্থরা আমাদের দেখলে ভয় পায়, ঘেন্না করে। কত ঘরে ভিক্ষা না দিয়ে দূর-দূর করে তাড়িয়েও দেয়। কচি মেয়েদের সাবধান করে।' একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'ঠিকই করে। তবে যে কথাটা রটেছে তার কতটা সত্যি জানিনা। জীবনে পাপ তো অনেক করেছি। পেটের

জ্বালায় ভিক্ষা করছি। এ জীবনের শেষ পরিণতি। কবে কোথায় মরে পড়ে থাকব। টেনে নিয়ে গিয়ে নদীর চড়ায় ফেলে রেখে আসবে। শেয়াল শকুনে খুবলে খাবে।'

শুনে শিউরে উঠেছিল বালিকা তরঙ্গ। বুকের মধ্যেটা যন্ত্রণায় ভরে গিয়েছিল। সুবলার সঙ্গে তার সখ্যতা জন্মেছিল। তার কাছে নাচ শিখেছিল। শিখিয়েছিল সুবলা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কটা গান তুলিয়েছিল। তিন চারটি ঋতুতে প্রায়ই গোপনে চুপিচুপি এসেছিল। এসেছিল বর্ষা। বর্ষা শেষ হলে আর সে আসেনি। তার কোন সন্ধান পায়নি।

কৈশোরে পদার্পণের আগেই পিতা তার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। এক দরিদ্র পরিবারে তার বিবাহ হয়ে গেল। বিমাতাই নাকি তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। পিতার খুব একটা মত ছিল না। তিনি বাধা দিতেও পারেননি। শ্বশুরালয়ে চলে গিয়েছিল সে।

বিমাতার সংসারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছিল, কিন্তু অন্ন বস্ত্রের অভাব ছিল না। শ্বশুরালয়ে সে কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে। একটাই সান্ত্বনা, সংসারে অভাব থাকলেও শান্তি ছিল। ভালবাসা পেয়েছিল। সদ্য তরুণ স্বামী বড় ভাল ছিল। কিন্তু ভাগ্য তার ভাল নয়।

বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরই ফল দেখল সে। তখন প্রচণ্ড বর্ষা চলছে। চারিদিক জলে জলময়। মাটির বাড়ি। মাথায় খড়ের ছাউনী। জল পড়ে ভেসে যাচ্ছে। বর্ষার রাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল নিদ্রিত স্বামীর। তরঙ্গ জানতেও পারেনি। রাত্রে শ্বাশুড়ির কক্ষে নিদ্রিতা ছিল সে। স্বামীর মৃত্যুর পর পিতা তাকে নিয়ে এসেছিল। বিমাতা তখন সন্তান সম্ভবা।

আর এক জীবন তার। পুত্র প্রসব করলেন বিমাতা। সন্তানের জন্ম দেবার পরই সেই যে তিনি শয্যাশায়ী হলেন পরবর্তী দুবছরে তাঁকে প্রতিনিয়ত সেবা করতে হয়েছে সেই রমণীর। ইতিমধ্যে লোহিতের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। যুবক লোহিত পাণ্ডু নগরে এক আত্মীয় গৃহে বিবাহ উপলক্ষে এসেছিল। পিতার সঙ্গে আলাপ হতে তাদের গৃহে এসেছিল। দেখেছিল তাকে। নিজে যেচে কথা বলেছিল তার সঙ্গে। পিতাকে বলেছিল, 'দত্ত মশাই আপনার কন্যাটি দেখছি অতীব সুলক্ষণা। বেশ মেয়ে। হাঁরে মেয়ে, তোর নামটি কি?'

তরঙ্গ চুপ করেছিল।

লোহিত বলেছিল, 'দত্ত মশাই, আপনার কন্যা কি মূক-বধির?'

অপ্রস্তুত পিতা বলেছিলেন, 'না-না, ওর নাম হচ্ছে......'

লোহিত বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'দত্ত মশাই, —বলছেন আপনার কন্যা মূক বধিরা নয়। অথচ কন্যার নামটি আপনিই বলছেন। কিরে চুপ করে রইলি কেন?'

পিতার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে।

পিতা বলেছিলেন, 'তোমার নাম বল।'

নিজের নাম বলেছিল সে।

নাম শুনে হেসেছিল লোহিত। বলেছিল, 'বাঃ সুন্দর নামটি। ভাল, বেশ ভাল। হ্যাঁরে, তোর নামটি কে দিয়েছিল তোকে?'

তরঙ্গময়ী চুপ করেছিল।

গৃহের সকলেরই লোহিতকে ভাল লেগেছিল। সহজ, আন্তরিক ব্যবহার। মহারাজ বিগ্রহপালের অমাত্য, কিন্তু তার জন্য এতটুকু অহঙ্কার নেই মনে। কয়েকদিন আত্মীয় গৃহে থেকে বরেন্দ্রতে ফিবেছিল সে। তার মধ্যে তার সঙ্গেও পরিচয় সহজ হয়েছিল। বিমাতাও পছন্দ করেছিলেন তাকে।

কিছুদিন পরে আবার গিয়েছিল লোহিত। মাত্র কয়েক দণ্ডের জন্য। সংবাদ পেয়েছিল। তাদের গৃহে আসে নি।

আবার গেল লোহিত। তাদের গৃহেও।

বিমাতা বললেন, 'শুনেছি, ইতিমধ্যে একবার এসেছিলেন আপনি?'

—'এসেছিলাম। মাত্র কয়েক দণ্ডের জন্য। বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হয়েছিল?'

—'ভেবেছিলাম আমাদের গৃহেও আসবেন।' বিমাতা বলেছিলেন।

—'আমিও সে কথা চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু সম্ভব হয়নি। তবে এবার কয়েকদিন আসব। বিরক্ত বোধ করবেন না যেন।' হাসি মুখে বলেছিল সে।

বিমাতা বলেছিলেন, 'না-না। একি বলছেন আপনি। এলে খুশিই হবো।'

লোহিত কদিন ছিল। প্রতিদিন এসে বিমাতার সঙ্গে বসে গল্প করেছে। রাজধানীর কথা বলেছে। মহারাজ বিগ্রহপালের কথা। আর কুমার মহীপালের কথা। তরঙ্গ দূর থেকে শুনেছে।

কদিন পরে তাকে বলেছে, 'তরঙ্গ, আমি আগামীকাল প্রভাতে চলে যাচ্ছি।'

—'অবসর পেলে আবার আসবেন।' মৃদু কণ্ঠে বলেছে সে।

নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে লোহিত। বুকের মধ্যেটা থর থর করে কেঁপে উঠেছে। তারপর.....

একদিন পাণ্ডুনগর ত্যাগ করেছে তরঙ্গময়ী। লোহিত তখন তার আত্মীয়গৃহে। পক্ষকাল পরে বরেন্দ্রতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

—'কিরে কেমন আছিস?' জিজ্ঞাসা করেছে লোহিত। 'কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

অভিমানে কথা বলেনি সে।

—'তোর বিমাতা খুবই কান্নাকাটি করেছে। অবশ্য তোর পিতা আমায় বলেছেন, কন্যা গৃহ ত্যাগ করে ভালই করেছে। বড় কষ্টে ছিল। জীবনে কিছুই পায়নি।'

পেল, কিন্তু এমন পাওয়া সে চায়নি। ভুল করেছিল, বিশ্বাস করেছিল লোহিতকে, ভেবেছিল.....না, লোহিত স্পষ্ট বলেছিল, 'আমি কি তোকে একবারও বলেছি, তোকে নিয়ে ঘর বাঁধব? কিরে, বলেছি সে কথা?'

চিন্তা করেছে তরঙ্গ। মনে করতে পারেনি। না, লোহিত তাকে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখায় নি। অথচ সে.....ভুল করেছে, লোহিতের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। মনে মনে কত স্বপ্ন রচনা করেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে এলে কেন?'

লোহিত বলেছে, 'তোকে আমার বড় ভাল লেগেছিল।'

—'কেন?'

উত্তর দেয়নি লোহিত। চোখ বুজে হেসেছে। হাসলে তার দু'চোখ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। পাকা শয়তান। লোহিত তার থাকার ব্যবস্থা করেছে। সুখ স্বাচ্ছন্দের। দ্বিতল গৃহ। সর্বক্ষণের দাসী। শুধু তাকে সতর্ক করা হয়েছিল, বাইরে যাওয়র চেষ্টা যেন না করে সে। উপায়ও নেই। বাইরে সর্বক্ষণ এক পৌঢ় পাহারায় থাকে। অসুস্থতার ভান করে। সে নাকি.....রতি বুড়িই সব বলেছে তাকে। তার দাসী। এখন দাসী। আগে ছিল গণিকা পল্লীর গণিকা। লোহিত তাকে নিয়ে এসেছে। কি উদ্দেশ্যে সে এসব করছে আজও বোধগম্য হয়নি তার। যুবরাজ মহীপালের রক্ষিতা হয়েছিল; আজও মহারাজের রক্ষিতা। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। ক্লেদাক্ত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুধু জানে না তার পরিণতি কি। লোহিত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সচকিত হল। দেখতে পেল রতিকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল।

একটু ইতস্তত করল রতি। বলল, 'ব্যাপারটা কিছু গোলমেলে ঠেকছে।'

শুনল তরঙ্গ। কথা বলল না।

—'আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল।' একটু চুপ করে থেকে বলল রতি।

—'কে?'

—'ঠাকুর ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

—'কেন?'

—'বলছেন উনি আসবেন। আর.....' চুপ করে গেল বুড়ি।

রতিকে দেখল তরঙ্গ। এক সময়ের অন্ধকার জগতের একজন। না, মানুষ খারাপ নয়।

'—গোছ গাছ করে রাখতে বলেছেন। থেমে থেমে বলল সে, তোমাকে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন।'

শুনল তরঙ্গ। চুপ করে রইল। কথা বলতে ভাল লাগছিল না তার। কোথাও পাঠালে কি এসে যাবে।

রতি বলল, 'দিনকাল ভাল নয়। চারিদিকে গোলমাল শুরু হয়েছে।'

—'তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?' জানতে চাইল সে।

—'জানি না। তেমন কথা আমায় কিছু বলেননি ঠাকুর। শুধু.....'

তরঙ্গ চুপ করে রইল।

লোহিত যখন এল, তখনও সে একইভাবে বসে। সে তাকে একটুক্ষণ চেয়ে চেয়ে

দেখল। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। বাইরে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। এসময় লোহিত প্রকৃতিস্থ থাকে না। দিনান্তে কর্ম অবসরে সে মাদব দ্রব্য সেবন করে। সে নিজেই এক সময় জানিয়েছিল তাকে। শান্তি পায়। বলেছিল, 'শোন, যত প্রয়োজনই থাক না কেন, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনালে কখনই আমাকে ডাকবি না।'

কোনদিনই ডাকেনি তাকে। ইতিপূর্বে মাত্র কয়েকবার অপ্রকৃতিস্থ লোহিত বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে এসেছে। আজও। বলল, 'কিরে, শুনলাম সমস্তদিন বিরহিনীর মত একইস্থানে অবস্থান করছিস?'

চোখ তুলে চাইল তরঙ্গ। কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

একটা অশ্লীল গালি উচ্চারণ করল লোহিত।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল তার। চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল।

—'চুপ।' হিস্ হিস্ করে উঠল লোহিতের কণ্ঠস্বর। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তারদিকে চেয়ে বলল, 'চিৎকার করলে গলা টিপে শেষ করে দেব। অবিশ্বাসিনী।'

—'আমি!'

—'হ্যাঁ তুই। মহারাজ যে গোপনে তোর কাছে আসেন এ সংবাদ কিভাবে জানাজানি হল? বল? চুপ করে থাকবি না। উত্তর দে।'

—'আমি......আমি.....' চুপ করে গেল তরঙ্গ।

—'তুই-ই প্রকাশ করেছিস। মহারাজের বিরুদ্ধে দুষ্টের দল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। এখন বল, মহারাজের কথা কিভাবে প্রকাশ হল?'

তরঙ্গ চুপ করে রইল।

—'কি রে?' কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল লোহিত।

তরঙ্গ লোহিতের মুখের দিকে চাইল। বলল, 'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?'

—'তোকে ভিন্ন আর কাকে সন্দেহ করব?' হিস হিস করে উঠল লোহিত।

—'তোমার তো পাহারাদার রয়েছে। সে কি বলে? তাকে নিশ্চয়ই শুধিয়েছো?

লোহিত চুপ করে গেল। মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করল তার। মহারাজের আগমন সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তরঙ্গকে সন্দেহ করার কিছু কারণ ঘটেছে। কটি শিশুর সঙ্গে তাকে কদিন কথা বলতে দেখা গেছে। শিশুরা প্রায়ই তার কাছে আসে। তরঙ্গ কখনো কখনো তাদের ফলমূল ইত্যাদি দেয়।

তরঙ্গ বলল, 'তুমি বিশ্বাস কর, কোনরকম অবিশ্বাসের কাজ আমি করিনি।'

—'বিশ্বাস?' তরঙ্গের মুখের দিকে চাইল লোহিত।'

—'হ্যাঁ বিশ্বাস।' সেও গম্ভীর। বলল, 'যদিও তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

—'তুই তো পুরুষ সান্নিধ্য লাভ করেছিস। উত্তম পুরুষ। কোন আক্ষেপতো থাকা উচিৎ নয় তোর।'

—'আমি এমন চাইনি।'

—'সকলে যা চায়, তা কি পায়?'

—'সে তুমি বুঝবে না।' তরঙ্গ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গল। হাসল। বলল, 'তুমি শুধু নিষ্ঠুর নও, নির্দয়ও। শোন, ওই যে তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে বললে একটু আগে। যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় আমাকে মেরে ফেলতে পার। আমি বাধা দেব না। মৃত্যুর আগে মনপ্রাণ দিয়ে তোমার স্পর্শ সুখ অনুভব করবো। শুধু.....'একটু থামল সে। লোহিতের কাছে, আরো কাছে সরে এল। চুপি চুপি বলল, 'তোমার সম্পর্কে আমার মনে কৌতূহল কম নয়। কোন বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির কারণে যুবরাজের হাতে আমাকে তুমি তুলে দিয়েছো। কিন্তু তুমি নিজেও নারী সঙ্গ কর না। এতো পুরুষের ধর্ম নয়। কেন?'

চমকে উঠল লোহিত। স্থির অপলক চোখে তরঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তরঙ্গ একটু নীরব রইল। বলল, 'শুনেছি বাল্যকালেই তুমি মাতৃহীন?'

আবার চমকাল লোহিত।

হাসল তরঙ্গ। বলল, 'নারী মন বড় কৌতুহলি। আপনজন সম্পর্কে জানতে চায়।'

—'আমি তোর আপন জন?' বিকৃত কণ্ঠস্বর লোহিতের।

—'নও?' কটাক্ষ হানল তরঙ্গ। 'হাত ধরে নয়, মুখের কথায় ঘর ছেড়েছিলাম। কত বিশ্বাস করেছিলাম বলতো তোমায়?'

—'তুই কি চেয়েছিলি........'

বাধা দিল তরঙ্গ। বলল, 'ওকথা থাক। বল, এ গৃহ কি ত্যাগ করতে হবে?'

—'যদি প্রয়োজন হয়।'

—'আমি প্রস্তুত হয়েই আছি।

কথা বলল না লোহিত।

মৃদু কণ্ঠে তরঙ্গময়ী বলল, 'লোহিত, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি তোমার ক্ষতির কারণ হব না। তাতে আমার.....' কথাটা শেষ করল না সে। মাথা নীচু করে ধীর পদক্ষেপে পাশের কক্ষে চলে গেল।

স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল লোহিত।

ছয়

ত্রৈলোক্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কুমার রামপাল। শুশ্রুষা করতে করতে নিজের মনেই কথা বলছে সে। পীড়ন সহ্য করতে না পেরে সজ্ঞা হারিয়েছিল। ত্রৈলোক্য অবশ্য তাকে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিল। চিন্তা করল সে, ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা কি উচিৎ হত তার? না, পারেনি। বিবেকে বেধেছে। প্রায়দিনই শারিরীক নির্যাতন চলছে তার ওপর। মহারাজ মহীপালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকাবী মন্ত্রী অমাত্যদের

নাম জানতে চান কারাধ্যক্ষ। আজও শেষ রাত্রে শয্যা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিলেন। কারাধ্যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিল সে। প্রতিদিন একই প্রশ্নে তিতিবিরক্ত।

কারাধ্যক্ষ হুঙ্কার দিয়েছিলেন, 'নীরব থাকবেন না। উত্তর দিন কুমার।'

কারাধ্যক্ষের হিংস্র মুখটার দিকে একবার শুধু চেয়েছিল সে।

—'বলুন, কারা আপনার পক্ষে মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল?'

উত্তর দেয়নি সে।

—'কুমার।' আক্রোশে চিৎকার করে উঠেছিলেন কারাধ্যক্ষ।

—'শুনুন।' কথা বলেছিল সে।

—'বলুন।'

—'পক্ষকাল হল প্রতিদিনই আপনি আমাকে একই প্রশ্ন করছেন। মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে আমার সঙ্গে কারা লিপ্ত ছিলেন।'

—'করছি। যতক্ষণ না ষড়যন্ত্রকারীদের নাম আপনি প্রকাশ করছেন ততক্ষণ একই প্রশ্ন করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে।'

—'আমি মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম এ প্রমাণ কি তিনি পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আমার সহযোগিদের পরিচয়ও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তাহলে?'

কারাধ্যক্ষ কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় থেকে ছিলেন। একসময় বলেছিলেন, 'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি-না?'

—প্রতিদিনই একই প্রশ্ন আপনার, কি উত্তর দিই বলুন তো?'

—'তাহলে উত্তর দেবেন না?'

চুপ করেছিল সে। শুরু হয়েছিল নির্যাতন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিল শরীর। মুখে কাতোরক্তি বেরোয়নি। সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে সজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর কি হয়েছে জানে না। সজ্ঞা লাভ করার পর প্রথমে সবকিছুই ঝাপসা দেখেছিল। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। আবার জ্ঞান ফিরেছিল। একটা অস্পষ্ট মুখ। যেন বহুদূর থেকে ডাক ভেসে এসেছিল। ত্রৈলোক্য।

অল্প অল্প উষ্ণ জল পান করিয়েছিল সে। একটু আরামবোধ করেছিল। এখন ক্ষত-স্থানগুলিতে প্রলেপ দিচ্ছে। কথা বলছে নিজের মনেই।

একসময় ত্রৈলোক্য বলল, 'একটা সুসংবাদ আছে কুমার।'

রামপাল শুনল। নীরব রইল।

—'আপনার জন্য দুধ সংগ্রহ করে আনার আদেশ দিয়েছে মহাকপি।'

কারাধ্যক্ষকে মহাকপি বলে ত্রৈলোক্য। অবশ্যই আড়ালে। বিশাল শরীর নিয়ে তিনি যখন হাঁটা চলা করেন মহাকপি বলেই মনে হয়।

ত্রৈলোক্য বলল, 'কি হল, আমার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না আপনার?'

শুয়ে ছিল। ধীরে ধীরে উঠে বসল রামপাল। ক্লান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কেন?'

—প্রতিদিনই রক্তপাত হচ্ছে আপনার শরীর থেকে। আজ অবশ্য অধিক পরিমাণে রক্তপাত হয়েছে। সেইজন্যই নূতন ব্যবস্থা।'

চুপ করে রইল রামপাল।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে ক্ষুন্ন কণ্ঠে ত্রৈলোক্য বলল, 'আপনি যদি আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এত পীড়ন আপনাকে সহ্য করতে হত না। তবে মহাকপি আজ খুবই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আপনার সজ্ঞা ফেরার পর স্বস্তি লাভ করেছে। দ্বিপ্রহরে আহারের জন্য গৃহেও যায়নি। আর আপনার পরিচর্যার জন্য আজ থেকে আমার সহযোগী রূপে আরও একজনকে বহাল করেছে। কালাচাঁদ। নাম চন্দ্রমাধব। আমরা কালাচাঁদ বলি।'

চোখ তুলে ত্রৈলোক্যকে দেখল সে।

ত্রৈলোক্য বলল, 'দিব্যর দলে ছিল কালাচাঁদ। ডাকাতি করে বহু মানুষের সর্বনাশ করেছে। কালাচাঁদ ছিল নির্মম, হৃদয়হীন। দিব্যর দলভুক্ত হলেও দিব্যও কালাচাঁদকে সমীহ করত। প্রচণ্ড দুঃসাহসী ছিল। ফলে......। থেমে গেল ত্রৈলোক্য।

শুনতে ভাল লাগছিল না রামপালের। সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় জর্জরিত। বরেন্দ্রর ত্রাস দিব্য। তার সঙ্গীরা প্রকাশ্য দিবালোকেও লোকালয়ে হানা দিতে দ্বিধা করে না। দিব্যকে ধরার অনেক চেষ্টা হয়েছে, সম্ভব হয়নি। সৈন্যরা ব্যর্থ হয়েছে বার বার। কে দিব্য তাই নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। দিব্যর নামের সঙ্গে মানুষ পরিচিত। প্রতিটি ডাকাতির সময়েই সে উপস্থিত থাকে, কিন্তু নিজের পরিচয় কখনই প্রকাশ করে না।

ত্রৈলোক্য বলল, 'দিব্য বহুরূপী। দলের কাছেও সে কখনো নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে না। কালাচাঁদ বলেছিল, দিব্যই তাকে সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

—'কেন?'

—'কালাচাঁদ দিব্যর পক্ষে চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। দলে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার।'

'ও' বলে চুপ করে গেল রামপাল। ত্রৈলোক্য একটু অপেক্ষা করে বলল, 'কুমার, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা দেখি।'

—'আহারের প্রয়োজন নেই আমার।' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

—'আজ সমস্ত দিন আপনি অভুক্ত।'

—'তা হোক।'

—'একেই তো রক্তপাতে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে আপনার।'

—'আমি এখনও জীবিত আছি ত্রৈলোক্য।'

ত্রৈলোক্য কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রামপালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে জীবিত থাকতে হবে কুমার।'

মুখ তুলে চাইল রামপাল। ত্রৈলোক্য কথা বলল না। ধীরে ধীরে চলে গেল।

অপরাহ্নের আলো ম্লান হচ্ছে। পক্ষকাল বন্দীদশা চলছে। চলছে নির্যাতন। মহারাজ মহীপাল তাকে বন্দী করে রেখেছে কেন বুঝতে পারে না। প্রাণদণ্ডের আদেশতো দিতে পারে।

বুঝতে পারে না। অনেক কিছুই বোধগম্য হয় না তার। যুবরাজ মহীপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অরোহণ করেছে। বরেন্দ্রর রাজা হয়েছে। এটাই নিয়ম। নিয়মের ব্যতিক্রমতো হয়নি। কোনরকম বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়নি যুবরাজকে।

রামপাল নিজের কথা চিন্তা করল। রাজ্যের মন্ত্রী অমাত্য থেকে নিম্নতম কর্মচারী অনেকের সঙ্গেই সে পরিচিত। পরিচিত রাজধানীর মানুষের সঙ্গে। কখনও কখনও গ্রামে গ্রামান্তরেও সে যেত। দেখার আনন্দ, ঘুরে বেড়াবার নেশা ছিল। মানুষের সঙ্গে মিশতে বড় ভাল লাগে। কয়েকজন সঙ্গী ছিল। জানে না তাদের কি হয়েছে।

মনে পড়ল প্রজাপতি নন্দীর কথা। তাঁর গৃহে গিয়েছিল। মহারাজ মহীপাল তাঁর কোন ক্ষতি করবে না তো? খুবই ধীর, শান্ত প্রকৃতি জ্যেষ্ঠের। নির্বিকার। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

চিন্তা করেছে সে। তার এই পরিণতি কেন? মহীপাল কাউকে বিশ্বাস করে না। কারও পরামর্শ গ্রহণ করে না। রাজ্যের মানুষ শুধু নয়, অভিজ্ঞ মন্ত্রী-অমাত্যরা তাঁর রাজ্য পরিচালনায় অসন্তুষ্ট। তাকে কারারুদ্ধ করার কারণ ভবিষ্যৎ নিষ্কন্টক করা। আপন ভাই শূরপালকে একই কারণে কারারুদ্ধ করেছেন। যদি মনে করে....হয়তো তাই ঘটবে, পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তবে পাল সাম্রাজ্যকে শেষ করে দিয়ে যাবে মহীপাল।

পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার কথা মনে পড়ল তার। পূর্ব পুরুষদের কথা সে শুনেছে। প্রজাপতি নন্দী বলেছেন। বলেছেন আরো অনেকেই।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য আত্মকলহ আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশের রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশে রাজা নেই। ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিকরা নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না। বহিঃশত্রুর সঙ্গে সঙ্গে দস্যু তস্করের দল নির্বিচারে মানুষকে সর্বস্বান্ত করা শুরু করেছিল। অবশেষে দেশের প্রধান নেতারা স্থির করলেন পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করা প্রয়োজন এবং সকলেই তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করবেন, নাহলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অবশেষে নির্বাচিত হলেন গোপাল। বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসে রাজা হলেন তিনি।

গোপালের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে তার পিতৃভূমি বরেন্দ্র। পিতামহ দয়িত বিষ্ণু 'সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ' ছিলেন। পিতা বপ্যট ছিলেন যুদ্ধ ব্যবসায়ী। গোপালও সুনিপুন যোদ্ধা ছিলেন।

গোপালের রাজত্বকালে (৭৫০-৭৭০) সমগ্র বরেন্দ্রভূমি তাঁর শাসনাধীন হয়েছিল।

ফিরে এসেছিল শান্তি-শৃঙ্খলা। শতাব্দীব্যাপী বিশৃঙ্খলার পর রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুসমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন তিনি।

গোপালের মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসনে বসলেন পুত্র ধর্মপাল (৭৭০)। বীর, সাহসী, রাজনীতি কুশল নরপতি। স্বপ্ন দেখলেন আর্যাবর্তে এক নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনের।

ধর্মপাল তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পশ্চিমদিকে বিজয়াভিযানে নির্গত হলেন একদিন। ঠিক সেই সময় প্রতীহার বংশীয় রাজা বৎসরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য রাজপুতানা থেকে সসৈন্যে পূর্বদিকে অগ্রসর হন। পথে উভয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে পরাজিত হন ধর্মপাল।

ধর্মপালের সৌভাগ্য, ঠিক এমন সময় দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আর্যাবর্তে বিজয়াভিযান করে বৎস রাজকে পরাজিত করেন। বৎসরাজ মরুভূমিতে পালিয়ে রক্ষা পান।

ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করে ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ধর্মপাল ইতিমধ্যে মগধ, বারানসী, প্রয়াগ জয় করেছেন। যুদ্ধে ধ্রুবর কাছে ধর্মপাল পরাজিত হলেন। তবে উভয়ের মধ্যে সন্ধিও স্থাপিত হল। ধ্রুব তাঁর বাহিনী নিয়ে দক্ষিণাপথে ফিরে গেলেন। ধর্মপালের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করে নিজের আধিপত্য স্থাপন করলেন। ধর্মপাল হলেন পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ। আর্যাবর্তে সার্বভৌমত্ব লাভ করার পর তিনি কান্যকুব্জে রাজ্যাভিষেকের এক দরবার করেছিলেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি জনপদের সামন্তরা সেই সভায় যোগদান করেছিলেন। ধর্মপাল শুধুমাত্র বাংলা ও বিহার নিজের শাসনাধীনে রেখেছিলেন। এবং কান্যকুব্জে রাজা ইন্দ্রের পরিবর্তে চক্রায়ুধ নামে এক নতুন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিসিক্ত করেছিলেন।

অবশ্য নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ করতে পারেননি ধর্মপাল। বৎসরাজের পুত্র নাগভট্ট কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন। পরাজিত চক্রায়ুধ ধর্মপালের শরণাপন্ন হন। নাগভট্টের সঙ্গে ধর্মপালের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে পরাজিত হন ধর্মপাল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের তৃতীয় পুত্র গোবিন্দ নাগভট্টের রাজ্য আক্রমণ করে রক্ষা করেন ধর্মপালকে। নাগভট্টের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা শেষ হয়ে যায়। পরাজিত নাগভট্ট আত্ম-রক্ষার্থে রাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে যান। পিতার মতই আপন রাজ্যে ফিরে যান গোবিন্দ। শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করেছিলেন ধর্মপাল।

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজকন্যা রন্না দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ধর্মপালের। সাম্রাজ্য স্থাপনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পাল ছিল তাঁর বড় সহায়। বহু যুদ্ধের সফল সেনাপতি বাক্‌পাল। ধর্মপাল সম্রাট অশোকের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মৌর্য্য রাজাগণের প্রাচীন রাজধানী পাটুলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পিতার মত তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। বিক্রমশীল-বিহার তিনি নির্মাণ করেছিলেন। বরেন্দ্রর সোমপুরেও একটি বিহার নির্মাণ

করেন তিনি। এত বড় 'বিহার' ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না (রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে)।

নিজে বৌদ্ধ হয়েও পরধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না তাঁর। তিনি নারায়ণের মন্দির নির্মাণের জন্য নিষ্করভূমি দান করেছেন। শাস্ত্রানুশাসন মেনে চলতেন। প্রতি বর্ণের মানুষ যাতে স্বধর্ম পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতেন। ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে রাজ্য শাসন ব্যাপারের সম্বন্ধ স্বীকার করেননি তিনি। তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ গর্গ।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর রন্নাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দেবপাল পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। (আঃ ৮১০)। পিতা ধর্মপালের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র পিতৃরাজ্য অক্ষুন্ন রাখা নয়, অনেক নতুন নতুন রাজ্য জয় করেছিলেন। পিতৃব্য বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ধর্মপালের মন্ত্রী গর্গের পুত্র গর্ভপাণি ও প্রপৌত্র কেদার মিশ্র ছিলেন দেবপালের মন্ত্রী।

দেবপালের সময় সাম্রাজ্যের গৌরব চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। বাঙালী সৈন্যরা ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধু নদের তীর এবং দক্ষিণ ভারতের প্রায় শেষ সীমা পর্যন্ত বিজয় অভিযান করেছিল। প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত দেবপালকে অধীশ্বর বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

অপুত্রক দেবপাল। তাঁর মৃত্যুর পর (৮৫০) জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল রাজা হন। কিন্তু শান্তিপ্রিয়, সংসার বিরাগী রাজা অল্পকাল রাজত্বের (৮৫০-৮৫৪) পরই পুত্র নারায়ণ পালের হাতে রাজ্য ভার অর্পণ করে বরেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যান।

বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেন নারায়ণপাল। দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন তিনি (৫৪-৯০৮) কিন্তু তিনিও ছিলেন পিতা বিগ্রহপালের মতই শান্তিপ্রিয়, উদ্যমহীন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র তাঁর মন্ত্রী ছিলেন।

ধর্মপাল, দেবপালের বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত বিশাল পাল সাম্রাজ্য নারায়ণ পালের উদ্যমহীনতায় খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। মুহুর্মুহু শত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হন তিনি। প্রতিহাররাজ ভোজ আর্যাবর্তে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বরেন্দ্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করলেন। ভোজের গতিরোধ করা নারায়ণপালের পক্ষে সম্ভব হল না। গুরুতর রূপে পরাজিত হলেন তিনি। পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের ওপর প্রতিহার রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। কিছুদিন পরে ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল বিহার প্রদেশও অধিকার করে নিলেন।

কালচুরি রাজ কোক্কল এই সময় বঙ্গ আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। অথচ কালচুরি বংশের সঙ্গে পাল বংশের ছিল বৈবাহিক সম্বন্ধ। বিগ্রহপাল কালচুরি রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন। নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর বিবাহ হয়। অথচ কালচুরি রাজ শত্রুপক্ষে যোগদান করে বরেন্দ্র লুণ্ঠন করেন।

আভ্যন্তরীণ কলহ, চতুর্দিক থেকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, শান্তিপ্রিয় রাজা নারায়ণ পালকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। অবশ্য তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালের শেষার্দ্ধে তিনি প্রতীহারদের বিতাড়িত করে আবার বিহার-বাংলায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন।

নারায়ণ পালের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেছিলেন রাজ্যপাল (৯০৮)। তারপর দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০)। রাজ্যপাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে কিছুটা সমর্থ হয়েছিলেন। শত্রু অধিকৃত অনেক ভূখণ্ড বাহুবলে পুনরুদ্ধার করেছিলেন তিনি। আবার দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে চন্দেল্লরাজ যশোবর্দ্ধন প্রসিদ্ধ কালঞ্জর গিরি দুর্গ অধিকার করে আর্যাবর্তে প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাঁর বিজয় বাহিনি কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান করে।

সমুদয় আক্রমণের ফলে পাল রাজারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন অংশে খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। বরেন্দ্রর সীমা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় গোপালের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেন পুত্র বিগ্রহপাল। নামেই তিনি বরেন্দ্রর রাজা। তার মৃত্যুর পর বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসলেন মহীপাল (৯৮৮)। সিংহাসনে বসার দু-তিন বৎসরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ পুনরধিকার করেছিলেন। অবশ্য উত্তর বা পশ্চিমবঙ্গ জয় না করে পূর্ববঙ্গে তিনি যাননি। সমগ্র বাংলা দেশ জয় করার পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত চোলরাজ মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করলেন। সে সময় চোলরাজের মত শক্তিশালী রাজা ভারতবর্ষে ছিল না। উড়িষ্যা থেকে আরম্ভ করে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূল সমস্তই তাঁর অধীনে ছিল। মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধে ফলাফল নির্ণয় হয় নি। চোল সৈন্যরা স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল।

পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি রোধ করেছিলেন মহীপাল। বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও মিথিলায় পাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সঙ্গে ভারতের দুই প্রবল শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজ্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি বহু প্রাচীন কীর্তির রক্ষণে যত্নশীল ছিলেন। সারনাথের "সাঙ্গ ধর্মচক্র" ও"অষ্ট-মহাস্থান" "শৈল বিনির্মিত-গন্ধকূটী" প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তির সংস্কার সাধন করেছিলেন। অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহা বিহারের জীর্ণোদ্ধার এবং বুদ্ধ গয়ায় দুটি মন্দির নির্মাণ করেন। কাশীধামে নব দুর্গার মন্দির নির্মাণ তাঁরই কীর্তি। হিন্দু দেব দেবীর বহু মন্দির নির্মাণ করেন তিনি। অনেক দীঘি খনন করান। বহু নগরী সৃষ্টি করেন।

মহীপালের পর পুত্র নয়পাল বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেন (১০৩৮)। কালচুরি রাজ গাঙ্গেয় দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধই তাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা।

লক্ষ্মীকর্ণ মগধ আক্রমণ করে যুদ্ধে নয়পালকে পরাজিত করেন, কিন্তু পাল রাজধানী অধিকার করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। বহু প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে লুণ্ঠন করেন। বৌদ্ধ আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন মগধে বাস করছেন। তিনি প্রথমে এই যুদ্ধ

ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করেন নি। পরে নয়পাল লক্ষ্মীকর্ণকে পরাজিত করে কালচুরি সৈন্য বিধ্বস্ত করতে শুরু করেন, তখন দীপঙ্কর লক্ষীকর্ণ ও তাঁর সৈন্যদের আশ্রয় দেন। তাঁর চেষ্টায় উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

নয়পালের মৃত্যুর পর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেন (১০৫৪)। লক্ষ্মীকর্ণ সন্ধি ভঙ্গ করে আবার যুদ্ধাভিযান কবেন। এ যুদ্ধেও কর্ণ প্রথমে জয়লাভ করেন। পরে বিগ্রহপালের হাতে পরাজিত হন। উভয়পক্ষে আবার সন্ধি হয়। কর্ণ, কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহ পালের বিবাহ দেন।

সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে পাল রাজশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মহা মাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ বর্দ্ধমান জেলার টেক্করীতে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গে দুটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ম বংশীয় রাজারা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। পালরাজ্যের আভ্যন্তরিন দুরবস্থার সময় চালুক্যরাজ বাংলা আক্রমণ করেন। সুযোগ পেয়ে উড়িষ্যার রাজারাও বাংলা আক্রমণ করেন।

শুধু বাংলায় নয়, মগধেও পালরাজশক্তি হীনবল হয়ে পড়ে।

সিংহাসনে বসার প্রথম বছরেই বরেন্দ্র আক্রমণ করেছিলেন মাতামহ। পরাজিত হয়ে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন পিতার সঙ্গে। স্থাপন করেছিলেন বৈবাহিক সম্বন্ধ। জন্ম হয়েছিল তার।

দাসী সাগরের কাছে পিতার কথা শুনেছে রামপাল। বাল্যকালের কথা। কথায় কথায় সাগর পিতার সঙ্গে তার তুলনা করত। পরবর্তীকালে পিতার মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল হঠাৎ-ই। তার জন্মের চতুর্থ বছর থেকেই পিতার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ মহীপাল রাজ্য লাভ করেছেন। তাতে বিন্দুমাত্র দ্বেষ নেই তার। মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল তার। কিন্তু কোন দিনই তাঁরা তাকে প্ররোচিত করেননি। রাজ্য-রাজত্ব বিষয়ে তার মনে কোন রকম আকাঙ্খাও জাগেনি।

পিতার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট যাত্রার কথা হয়েছিল। মাতুল মহণ তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে খুবই আগ্রহী ছিল। যাওয়া হয়নি। মত দিয়েও যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেছিলেন রোহিনী। জননীকে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার মঙ্গলের জন্যই যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে।'

—'আমার মঙ্গলের জন্য?' বিস্মিত হয়েছিল। 'আমার কি অমঙ্গল হতে পারত?' জানতে চেয়েছিল।

—প্রাণ সংশয়ও।'

শুনেছিল। প্রশ্ন করেনি আর। কিন্তু রক্ষা তো পেল না। এই বন্দী জীবন.....মুক্তি আসবে কি?

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল তার। চকিতে মানসপটে ভেসে উঠল একটা মুখচ্ছবি। হেসে ফেলল। রাষ্ট্রকূট যাত্রা করলে তো.....

মাতুল মহণের স্বদেশ যাত্রার পরেই তাকে দেখেছিল। বালিকা কাঞ্চন। দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রক্ত মাংসের মানবী বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছিল......

কৌতুক মেশান কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রামপাল, 'তোমাদের রাজকুমারকে বন্দী করে এখানে রাখা হয়েছে! কোন বন্দীকেই এমন সুন্দর স্থানে রাখা উচিৎ নয় বলেই আমার মনে হয়। মহারাজ যদি এমন অপূর্ব ব্যবস্থার কথা জানতে পারেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি পত্র পাঠ কারাধ্যক্ষকে নির্বাসনে পাঠাবেন।'

মানুষটির দিকে তাকাল রামপাল। মুখটা পরিচিত বলে মনে হল তার।

ত্রৈলোক্য ডাকল, 'কুমার।'

লোকটি বলল, 'প্রণাম কুমার। অধমের নাম......'

ত্রৈলোকা বলল, 'আমি এর কথাই বলেছিলাম কুমার।'

—'আমি চন্দ্র মাধব। আপনার সেবক নিযুক্ত হয়েছি। আজ্ঞা করুন।'

কথা বলল না রামপাল।

মাধব বলল, 'অবশ্য এখানে আমি কালাচাঁদ নামেই অধিক পরিচিত। আপনি ইচ্ছামত সম্বোধন করবেন।'

মাথা নাড়ল রামপাল। বলল, 'জানি।'

হাসল কালাচাঁদ। বলল, অপরাধ নেবেন না কুমার। আমাকে নিশ্চয়ই পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে আপনার। ইতিপূর্বে কোথায় দেখেছেন, কিন্তু স্মরণ করতে পারছেন না?'

কালাচাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেল রামপাল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কখনও কখনও মনে হয়.....' থেমে গেল সে।

—'হয়। সাদৃশ থাকে। অপরিচিতকেও পরিচিত মনে হয়।' কালাচাঁদ বলল, 'অবশ্য আমার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যাপার।'

তাকে দেখল সে। মনে পড়ল। বলল, 'তুমি কিন্তু আমার অপরিচিত নও।'

মৃদুভাবে ঘাড় নাড়ল কালাচাঁদ। বলল, 'আপনিও আমার।'

—'তুমিতো ডাকাত।'

—'ছিলাম এক সময়।'

—'রাজস্ব বিভাগে যাতায়াত ছিল তোমার।'

চিন্তা করল কালাচাঁদ। বলল, ছিল, তবে তা প্রকাশ করা বোধহয় উচিৎ হবে না।'

—'কেন?'

কালাচাঁদ নীরব রইল।

রামপাল বলল, 'শুনেছি দিব্যর দলভুক্ত ছিলে তুমি। দলে তোমার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল বলেই সে তোমার এই অবস্থা করেছে।'

—'এটাই নিয়ম। দলপতি তার অধিকার বিপন্ন হতে দেয় না। সৌভাগ্য বলে জীবন যায়নি।' গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল কালাচাঁদ

—'অর্থাৎ?'

চুপ করে রইল কালাচাঁদ।

তাকে আবার দেখল রামপাল। দস্যু বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। নিতান্ত সাধারণ স্বাস্থ্যের একজন মানুষ। বরং দেখলে একজন নিরীহ প্রকৃতির গৃহস্থ বোধ হয়। অথচ দস্যু দিব্য বরেন্দ্রতে ধনী দরিদ্র সকলেরই ত্রাসের কারণ। চন্দ্রমাধব ছিল তার দক্ষিণ হস্ত।

—'চিন্তা করে কূল কিনারা পাবেন না কুমার।' বলল কালাচাঁদ। 'এই বেশ।'

চমকে উঠল রামপাল।

—'অদৃষ্টে ছিল কারাবাস। কিছুই করার নেই।' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সে। 'সবই অদৃষ্ট।'

—'বুঝলাম।' গম্ভীর হল রামপাল। 'ভাগ্যকে মেনে নিয়েছো, না নিয়ে উপায়ও নেই, তাই না?'

—'এই নিয়ম।' হাসবার চেষ্টা করল সে। 'নিয়মের ব্যতিক্রম বোধহয় হয় না।'

—'রাজধানীতে দেখতাম কেন তোমায়? বেশ কয়েকবারই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। নিশ্চয়ই পরিচিত বা কোন আত্মীয়ের সঙ্গে রাজস্ব বিভাগে সাক্ষাতের জন্য যেতে?'

—'যেতাম।'

—'আর সেই আত্মীয়টি নিশ্চয়ই তোমার কর্মের নির্দেশদাতা?'

শুনে স্থির দৃষ্টিতে রামপালের মুখের দিকে কয়েক মূহুর্ত নিঃশব্দে চেয়ে থাকার পর মাথা নত করল কালাচাঁদ।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রামপাল। বলল, 'শুনলাম, আমার দেখাশোনা করার জন্য কারাধ্যক্ষ তোমকে নিযুক্ত করেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'ত্রৈলোক্যের কাছে তোমার নাম জেনেছি। সকলে তোমাকে কালাচাঁদ নামে ডাকে। আমি কি নামে সম্বোধন করব তোমায়?'

হাসল কালাচাঁদ। সহজ হল। বলল, বললাম তো, আপনি আমাকে যে নামে ইচ্ছা ডাকবেন। কুমার, আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করেছি। আপনি স্পষ্টবাদি। আজ্ঞা করুন।?'

—'আজ্ঞা?'

—'নিশ্চয়ই। কারাধ্যক্ষ কি কারণে আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছেন জানি না। তবে আপনি যা আদেশ করবেন আমি তা সাধ্যমত পালন করব।'

কালাচাঁদকে আবার দেখল রামপাল। বলল, 'তুমি আমি উভয়েই মহারাজ মহীপালের বন্দী।'

—'কিন্তু অপরাধের তারতম্য আছে। সেই সঙ্গে মর্যাদা। বন্দী হলেও আপনি রাজকুমার, আমি সাধারণ দস্যু।'

—'মৃত্যুর পর মানুষের সব পরিচয় মুছে যায়, জান?'

—'জানি বৈকি। তখন শব শিব হয়ে যায়। তবে এখনওতো সে অবস্থা হয়নি।'

—'বন্দীশালাতেও তাই। এখন আমরা সমান। একটাই পরিচয়।'

—'আপনার মহানুভবতা।'

হাসল রামপাল। বলল, 'বন্দীশালায় তোমার প্রাধান্য কেমন?'

এতক্ষণ ত্রৈলোক্য নীরবে উভয়ের কথা শুনছিল। গম্ভীরভাবে বলল, 'কুমার দস্যুরা সর্বক্ষেত্রেই অন্যান্য অপরাধীদের শ্রদ্ধাভাজন।'

চিন্তা করল রামপাল। বলল, 'কুমার শূরপালকে এখানেই আনা হয়েছে। আমি তাঁর সংবাদ চাই।'

কালাচাঁদ বলল, 'পাবেন।'

—'তিনি কেমন আছেন, তাঁর ওপর কোনরকম শারিরীক নির্যাতন হচ্ছে কিনা আমি জানতে চাই।'

একটু চিন্তা করে কালাচাঁদ বলল, 'তাঁর সঙ্গে কি যোগাযোগ স্থাপন করতে চান আপনি?'

—'তা কি সম্ভব?'

—'কুমার, চেষ্টা করলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সব ব্যবস্থা করব।'

নিশ্চিন্ত হল রামপাল। শূরপালের জন্য খুবই উতলা হয়ে উঠেছে সে। সঙ্গীতসাধক বড়ই স্নেহ করেন তাকে।

একটু চিন্তা করে কালাচাঁদ বলল, 'চিন্তা করবেন না। আশা করছি, রাত্রি প্রভাতে সব সংবাদ আপনি জানতে পারবেন।

সাত

নতমুখী কন্যাকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল ভানুপ্রিয়া। বলল, 'তোমার এই অস্বাভাবিক জেদকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা কাঞ্চন। আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি.......'

—'মা।' যেন আর্তধ্বনি নির্গত হল কাঞ্চনের কণ্ঠ থেকে।

ভানুপ্রিয়া বলল, 'আমার সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করব না কাঞ্চন।'

—'কেন?' অসহায় দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

—'রাজধানীতে গোলমালের আশঙ্কা করছি আমি।' ভানুপ্রিয়া বলল, 'সেই জন্যই।'

—'তাতে আমাদের কি?' শেষ চেষ্টা করল কাঞ্চন।

—'আমি দূরে কোথাও চলে যেতে চাই। তুমি আর অমত কোর না। আর কেন যে তুমি এখানে থাকতে চাইছো, আমি বুঝতে পারছি না।'

মায়ের মুখের দিকে একবার চোখ তুলে চেয়েই মাথা নত করল কাঞ্চন।

কন্যাকে দেখল ভানুপ্রিয়া। ত্রয়োদশী কন্যা। ঠিক তাঁর মতই দেখতে হয়েছে। তাঁর.....অকস্মাৎ বুকের মধ্যে কান্নার কুণ্ডলীটা পাকিয়ে উঠল। দুর্ভাগিনী সন্তান তার। ভবিষ্যতের অবলম্বন। কিন্তু পারবে না সে। তার গর্ভধারিণী পেরেছিল। সম্ভব নয় তার পক্ষে।

কন্যকে আর একবার দেখল সে। নতমুখে নখ খুঁটছে। কেন তাকে নিয়ে সে চলে যেতে চায়, ও জানে না। সন্দেহটা অমলুক নয় তার। ভুল হতে পারে না। ভুল করেনি সে।

সন্দেহ নিরসনের জন্য ভৃগু সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে গেছে। গেছে তো গেছেই, ফেরার নাম নেই। ভৃগু এমন করে। মধ্যে মধ্যে কোথায় চলে যায়। আবার ফিরে আসে। এবার তাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে। সে যে এমন করবে, চিন্তা করতে পারেনি ভানুপ্রিয়া।

নিজের ওপরই রাগ হল তার। ভুল করেছে। বাউণ্ডুলেদের ওপর কোন দায়িত্ব দিতে নেই এটা তার বোঝা উচিত ছিল যে দায়িত্ব ভৃগুকে না দিয়ে অন্য কারো ওপর অনায়াসেই দেওয়া যেত। দেয়নি.....না দেওয়ার কারণও যথেষ্ট আছে। গোপনীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছিল।

কাঞ্চনের কাছ থেকে সরে এল ভানুপ্রিয়া। খুবই খারাপ লাগছে তার। সে চিন্তা করতে পারেনি ....কিন্তু এমনতো ঘটতেই পারে। তার তো ভুলও হতে পারে। ভুল! সত্যিই কি ভুল হয়েছ? বুঝতে পারছে না।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল এক সময়। অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। শীতের সকাল। রৌদ্রে ভরে গেছে চারিধার। উত্তাপ নেই। শীতের দিনগুলোকে একবারেই পছন্দ করে না সে। বড় জড়তা।

অথচ শীতের দিনেই তিনি এসেছিলেন। পৌষের শেষ। কদিন আকাশ ছিল মেঘলা। হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিল। এই গৃহেই সেদিন ছিল। সঙ্গে এক বৃদ্ধা দাসী। গৃহটি নগরের এক শ্রেষ্ঠীর দান। ষোড়শী কন্যার বিনিময়ে তার গর্ভধারিনী এটি লাভ করেছিল। সেই সঙ্গে অর্থ। বসন্ত সমাগমে শ্রেষ্ঠী তার অধিকারী হবেন। গণিকা বৃত্তি থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবনটা অবসর যাপন করবে মা। কন্যাকে নতুন গৃহে রেখে পুরাতন আস্তানায় চলে গিয়েছিল মা।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। দিনের আলো আছে। হঠাৎ আকাশ কালো করে ঝড় উঠেছিল। সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি। দাসীর সঙ্গে কক্ষে বসেছিল সে। হঠাৎ দ্বারে করাঘাতের শব্দে দাসী দ্বারমুক্ত করেছিল।

একটি অচৈতন্য দেহ বহন করে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। দ্বার মুক্ত হতে তারা ভেতরে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'শয়ন কক্ষ কোথায়?'

ভানুপ্রিয়া শয়ন কক্ষ দেখিয়ে দিয়েছিল। দুজনে পালঙ্কে অচেতন দেহটিকে শুইয়ে দিয়েছিল।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এখানে কোন বৈদ্য থাকে?'

—'জানি না।' মৃদু কণ্ঠে বলেছিল ভানুপ্রিয়া।

—'তুমি?' বৃদ্ধা দাসীর দিকে ফিরেছিল সে।

বৃদ্ধা তখন ভয়ে জড়সড়। কোনরকমে বলেছিল, 'এখানে থাকে না।'

—'তাহলে কোথায় থাকে?'

দাসী বলেছিল। শুনে ভ্রূকুটি করেছিল লোকটি। বলেছিল, 'চল আমার সঙ্গে।'

চলে গিয়েছিল দুজনে। অন্যজন বলেছিল, 'একটু জল নিয়ে এস তুমি।'

জল এনেছিল সে। অচৈতন্য দেহটি সামান্য কেঁপেছিল সে সময়। অস্পষ্ট শব্দ শোনা গিয়েছিল। প্রথমে কি করবে স্থির করতে পারেনি ভানুপ্রিয়া। তারপর এগিয়ে গিয়েছিল দেহটির কাছে। চমকে উঠেছিল। কপালের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। অনভ্যস্ত হাতে রক্ত মুছিয়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছিল সে। দেহটি স্থির।

বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে সঙ্গে ঝড়ের দাপাদাপি। কিছুক্ষণ পরে বৈদ্য নয়, মাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল লোকটি। মা এসে শুশ্রূষা করেছিল অচেতন মানুষটির। অনেক রাত্রে জ্ঞান ফিরেছিল। নিশ্চিন্ত হয়েছিল মা।

দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে লক্ষ্য করছিল ভানুপ্রিয়া। দেখছিল অচেতন মানুষটিকে। পরনে সাধারণ পোষাক। কিন্তু....

মা বাইরে এসে বলেছিল, 'আমি ওঁকে চিনি।'

—'চেন!' লোকটির কণ্ঠস্বর কেঁপেছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু এ অবস্থা কেন?'

লোকটি মাকে দেখেছিল। বলেছিল, 'বলা যাবে না। আমরা অপেক্ষা করছি। জ্ঞান ফিরলে আমাদের ডাকবে।'

জ্ঞান ফিরে এল মধ্যরাত্রের পর। কক্ষের একধারে বসে ঘুমে ঢুলছিল ভানুপ্রিয়া।

অস্পষ্ট কণ্ঠে যেন ডাকছেন।

মা বলল, 'বলুন।'

—'হর কোথায়?'

দুজনেই এল। উনি উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। মা বাধা দিল।

হর বলল, 'আপনি উঠবেন না।'

কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আঘাত কি গুরুতর?'

মা বলল, 'খুব বেশি নয়।'

উঠে বসলেন। বললেন, 'চল।' পালঙ্ক থেকে নামতে গেলেন। পারলেন না। মাথা চেপে শুয়ে পড়লেন। সামান্য পরে বললেন, 'এখন কি করা যায়?'

মৃদু কণ্ঠে হর বলল, 'আজ্ঞে.........।'

—'বল।'

—'এভাবে ফেরাটা কি ঠিক হবে? ওরা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ওৎ পেতে আছে। বুঝতে পারিনি এভাবে.....'

হাসলেন। বললেন, 'এভাবেই ঘটে। স্বার্থের হানি ঘটলে....যাক, শোন, আমি এখানেই অবস্থান করছি। হর, তুমি ফিরে যাও। সত্য গোপন রাখবে। আর উত্তর তুমি সাবধানে থাকবে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।' মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

—'আমার পরম সৌভাগ্য।' মা বলল, 'কিন্তু আমার পরিচয়....'

—'কি পরিচয় তোমার?'

—'আমি গণিকা।'

শুনে স্থির দৃষ্টিতে সামান্যক্ষণ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'প্রজা সন্তান তুল্য। সাধু-শয়তান সকলেই।'

সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কয়েকদিন ছিলেন তিনি। মহারাজ বিগ্রহপাল। মগধ থেকে ফেরার সময় আততায়ীর আক্রমণে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। হর ও উত্তর দুজন তাঁর অঙ্গ রক্ষক। তারাই কোন রকমে তাদের প্রভুকে রক্ষা করেছিল। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে তাঁকে নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিল।

মহারাজ নয়পালের সময় থেকেই পারিবারিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর জীবনের শেষার্দ্ধে বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। যৌবরাজ্যে নয়পাল তাঁর কোন সন্তানকেই অভিসিক্ত করতে পারেন নি। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে বরেন্দ্রর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে বিগ্রহপালকে মনোনীত করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেছিলেন বিগ্রহপাল। পারিবারিক ষড়যন্ত্র তখন কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। মন্ত্রীরা ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি দমন পীড়নের পথে না গিয়ে ভাইয়েদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করেছিলেন। রাজ্য, সিংহাসন ছাড়া ভাইয়েরা কি চায়! সেই সময় যুদ্ধ এল। কর্ণ বরেন্দ্র আক্রমণ করলেন। অবশেষে সন্ধি। ভাইয়েরা বিবাদ মীমাংসায় সম্মত হয়নি। তাদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। সিংহাসন ত্যাগের কথাও চিন্তা করেছিলেন। বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

বিশেষ প্রয়োজনে মগধ যেতে হয়েছিল তাঁকে। ফেরার পথে সৈন্যদের আচরণ কেমন বিসদৃশবোধ হয়েছিল তাঁর। আগে গৌড়-মালব-খগ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি

জাতিকে নিয়ে সৈন্যদল গঠিত হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত। সে দিন আর নেই। সৈন্য সংগ্রহ করা হয় দেশের মধ্য থেকেই। অশ্বের বড় অভাব বাংলায়। উৎকৃষ্ট অশ্ব আসত কম্বোজ থেকে। তাও সম্ভব হয় না।

সৈন্যদের আচরণ বিসদৃশবোধ হয়। পথে বার বার তারা বিরোধ করছিল নিজেদের মধ্যে। রাজধানীতে পৌঁছাবার আগেই হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছিল। অন্ধকারে কে যেন আঘাত করেছিল তাঁর মাথায়।

কদিন ছিলেন তিনি। যুবক নন—প্রৌঢ়ও নন। অপূর্ব দীপ্ত কান্তি। সুঠাম দেহ। মিষ্ট জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। ষোড়শী ভানুপ্রিয়া মুগ্ধ হয়েছিল। সব লজ্জা সঙ্কোচ দূর হয়েছিল তার। কৌতুহলি প্রশ্ন করেছিল একের পর এক। হাসিমুখে তিনি তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। মা বিব্রত বোধ করলে, তাকে শান্ত করেছিলেন।

ভাইয়েদের সঙ্গে বিরোধের কথা তিনি গোপন করেননি। আগে পাল রাজারা পুত্রদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার অর্পন করতেন! যৌবরাজ্যে অভিসিক্ত করতেন জ্যেষ্ঠকে। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হতেন তিনি। তিনিও সেই অধিকারে পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু কনিষ্ঠরা তা মেনে নিতে সম্মত হয়নি।

হর ও উত্তর যোগাযোগ রক্ষা করছিল তাঁর সঙ্গে। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন আসা যাওয়া করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'নিজ ভূমে পরবাসী আমি।'

—'কেন?' প্রশ্ন করেছিল ভানুপ্রিয়া।

—'প্রাণের ভয়ে।' হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'অবশ্য আমার প্রাণ সংশয়ের কথা গোপন আছে। আমার অঙ্গরক্ষক হর ও উত্তর খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ।'

কয়েকদিন পরে মাকে বিদায়ের কথা জানিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে আশ্রয় ও সুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলার জন্য কৃতজ্ঞতা।

মা বলেছিল, 'এ আমার শুধু কর্তব্য নয় সৌভাগ্যও।'

তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিদান নয়, কিছুটা ঋণ মুক্ত হতে চাই আমি।'

মা বুঝতে পারেননি তাঁর কথা।

তিনি বলেছিলেন, 'শোন, এ গৃহ এখন তোমার।'

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মা তাঁর দিকে চেয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন, 'নতুন জীবনের ব্যবস্থা আমি করব। চিন্তা করো না। সুস্থ জীবন।'

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন তিনি। গৃহ ও অর্থের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরদিন গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রাত্রি.....

আজও চিন্তা করতে পারে না ভানুপ্রিয়া। কেন, কেন সে সেদিন.......

গভীর রাত্রি। ঘুমিয়েছিল সে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের কক্ষে উনি ঘুমোচ্ছেন। কি যেন হয়েছিল তার। শয্যা ত্যাগ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকার আকাশ। তারারা অলস চোখে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। কানে এসেছিল ক্ষীণ কাতরোক্তি। দ্রুত পায়ে কক্ষে প্রবেশ করেছিল। ম্লান প্রদীপের আলোয় দেখেছিল কেমন যেন করছেন তিনি। কষ্ট হচ্ছে।

কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। কপালে হাত দিয়েছিল। সিক্ত ঘর্মাক্ত কলেবর। মুহূর্তে দ্বিধামুক্ত হয়ে বস্ত্র দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল শরীর।

—'কে?' জেগে উঠেছিলেন।

কথা বলতে পারেনি সে।

—ভানুপ্রিয়া! উঠে বসেছিলেন।

—'আপনার আর্তনাদ শুনে.....'

—'আর্তনাদ'। চিন্তা করেছিলেন। মনে পড়ছে, আমি-আমি যেন....

—'কি?'

প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় গভীর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন তিনি। দু'হাতে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল বক্ষে মিশে গিয়েছিল ভানুপ্রিয়া।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর কণ্ঠস্বরটা শোনা গিয়েছিল, 'এ আমি কি করলাম?'

ভানুপ্রিয়া নীরব।

—'ভানুপ্রিয়া, ক্ষণিকের তাড়নায় তোমার একি সর্বনাশ করলাম?' ককিয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ।

সে তাঁর বাহুতে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে শুধু বলেছিল, 'আপনি শান্ত হোন।'

—'আমি, অন্যায় করেছি। আমার পাপ। আমি......'

—'না মহারাজ, কোন অন্যায়, পাপ, আপনি করেননি। আমি আমি.......' কথা শেষ করতে পারেননি সে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

কাঞ্চনমালার জন্ম। আর দেখা হয়নি। সংবাদ আদান প্রদান করত উত্তর। আজ....

সংবিত ফিরে পেল ভানুপ্রিয়া। মা নেই। ভৃগুর ওপর রাগ হল তার। যদি দৃষ্টি বিভ্রম না হয়ে থাকে.....তাহলে....

বেশ কয়েকদিন পরে ভৃগু ফিরে এল। রোগা ছিপ্‌ছিপে দোহারা গঠন। একমাথা অবিন্যস্ত চুল। নাক মুখ চোখ সুন্দর। গণিকা পল্লীর সন্তান। সেখানেই বড় হয়েছে। একসময় কুকাজে তার জুড়ি ছিল না। পরে কেমন হয়ে গেল। ভানুপ্রিয়াকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। শ্রেষ্ঠীর রক্ষিতা হওয়ার সংবাদ শুনে বলেছিলেন, 'ভানু, একি করলি তুই?'

—'কি করলাম?' কৌতুকে দু'চোখ নেচেছিল তার।

—'তোর মায়ের এতো অর্থের মোহ?' মাথা ঝাঁকিয়েছিল ভৃগু।

—'অর্থের স্বপ্ন সকলেই দেখে। তুমি দেখ না?'

—'শ্রেষ্ঠী গজেন্দ্র বৃদ্ধ, কুৎসিত। খুবই কুৎসিৎ শ্রেষ্ঠী গজেন্দ্র। আমার কথা বিশ্বাস কর।'

—'গজেন্দ্রর অর্থ সুন্দর।' চোখ মটকেছিল ভানু। 'পুরুষ মানুষের রূপ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাব। আর বুড়ো হাবড়ারাই ভাল। বশে থাকবে।'

—'জীবনে অর্থটাই কি সব রে?' যেন ককিয়ে উঠেছিল ভৃগু। 'কিরে?'

—'সব হয়তো নয়। অর্থের প্রয়োজন আছেরে। প্রচন্ড প্রয়োজন। আর এই নরক থেকে তো মুক্তি মিলবে। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে না। ভাল নয়?'

—'আমি তো তাই চেয়েছিলাম।' উজ্জ্বল হয়েছিল ভৃগুর মুখ।' বিশ্বাস কর।'

—'আমাকে রাজরানী করে রাখতিস?' মুচকি হেসেছিল সে।

—'সে সাধ্য আমার নেই। তবে তোকে আমি ভালবাসি।' ভৃগু বলেছিল, 'আমার কথা বিশ্বাস কর তুই।'

—'ভালবাসায় পেট ভরে না বুঝলি। যা ভাগ।' ধমকে তাড়িয়েছিল ভৃগুকে।

চলে গেছে ভৃগু। আবার এসেছে। বার বার। কেমন হয়ে গেছে। পল্লীর নাম করা রক্ষক বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে ক্রমশ। ভানুপ্রিয়া জানে কার জন্য পরিবর্তন। কিন্তু ভৃগুকে মেনে নিতে পারেনি। জীবনে পরিবর্তন এল। এল কাঞ্চনমালা। শ্রেষ্ঠী গজেন্দ্র তার জীবনে আসেনি।

ভৃগু ফিরে এল। বলল, 'সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হলনারে ভানু।'

—'তাহলে এতদিন ছিলে কোথায়?' বিরক্ত হল ভানু। 'কোথায় গিয়েছিলে মরতে?'

—'মরতে, হ্যাঁ, সংবাদ সংগ্রহের জন্যই ঘুরে মরতে হয়েছে। পুন্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল।'

—'সেখানে কেন?' অবাক হল ভানু। 'কি হয়েছে খুলে বল।'

—'সে সব অনেক ব্যাপার। বললে বুঝবি না।'

বিরক্ত হল ভানুপ্রিয়া। কোন কথাই ঠিক ঠিক প্রকাশ করে না ভৃগু। সব ব্যাপারে হেঁয়ালী।

—'এধারে কি ঘটনা ঘটেছে শুনেছিস?' বলল ভৃগু।

—'কি ঘটনা ঘটেছে?'

—'মহারাজ তাঁর দুই ভাইকে কারারুদ্ধ করেছেন।'

শুনল ভানুপ্রিয়া। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ভৃগু বলল, 'বুঝতে পারছি, শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলি। কিন্তু তোর সন্দেহটা সত্য নাও হতে পারে।'

ভানুপ্রিয়া চুপ করে রইল।

ভৃগু একটু চিন্তা করল। এক সময় বলল, 'এখন বল, আমাকে আর কি করতে হবে?'

ওর দিকে তাকাল ভানুপ্রিয়া। কয়েক বছর আগে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ভৃগুই তাদের দেখাশোনা করে। অনেক দায় দায়িত্ব বহন করছে। বলল, 'স্থির করেছি বরেন্দ্র ছেড়ে চলে যাব।'

—'চলে যাবি!' যাবি কোথায়?'

—'জানি না। তবে এখানে আর থাকতে চাই না।'

ভানুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাইল ভৃগু। বুকের মধ্যেটা টনটন করে উঠল। যৌবনের উন্মাদনা আর নেই বললেই চলে। ভানুপ্রিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। সে স্বপ্নের অবশিষ্ট আজ আর খুঁজে পায় না। শুধু মাঝে মাঝে কি এক আকর্ষণে ওর কছে ছুটে আসে। ওকে দেখে। দেখতে ভাল লাগে। জানে মহারাজ বিগ্রহ পাল ওকে কৃপা করেছিলেন। স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু জীবনে কি পেল?

ওর মা বলতো সে কথা। বরেন্দ্র ত্যাগ করার অনেক চেষ্টাও করেছিল। কোন চেষ্টাই ফলবতী হয়নি।

ভানুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিকি কোথাও যাবে?'

—'নিষেধ করলে যাব না। আবার যেতেও পারি। কেন?'

—এখন কোথাও যেও না তুমি।' ভানুপ্রিয়া বলল, 'আমি একটু চিন্তা করে দেখি।'

—'বেশ।' উঠে দাঁড়াল ভৃগু। চলে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল ভানুপ্রিয়া। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষন। জানে, কথা যখন দিয়েছে ভৃগু কোথাও যাবে না। শুধু ভৃগু নয়, অনেকেই তাকে চেয়েছে। পায়নি। একটি রাত্রির মাত্র কয়দণ্ডের স্মৃতি। তিনিতো জোর করেন নি, আত্মসমর্পন করেছিল সে নিজে। কেন করেছিল? চিন্তা করেছে, এখনও করে। তাঁর উজ্জ্বল মূর্তিটা ধূসর হয়ে গেলেও মুছে যায়নি। তার একমাত্র সান্ত্বনা, সে পণ্যা হয়নি। জীবন যন্ত্রণার হাহাকার তার নেই।

আট

দুপুরে আহারের পর পুকুর ঘাটে বাসন ধুতে এসেছিল পঞ্চমী। পাড়ে বসে একজন ছিপে মাছ ধরছে। মুখটা অন্যদিকে ফেরান বলে চিনতে পারল না।

পুকুরটা মানীবালার। তবে পল্লীর ছেলেরা মাঝে মধ্যে ছিপ ফেলে। মাছের চেয়ে আমাছা বেশি। গেনীবালা চিৎকার চেঁচামেচি করত। এখন সে সব বন্ধ।

বাসন ধুতে ধুতে মানুষটাকে লক্ষ করতে লাগল পঞ্চমী। মুখ দেখা যাচ্ছে না।

শরীরটা কদিন বেজুত। বেরুচ্ছে না। বেরুবার প্রয়োজন তার নেই। যেতে হয় শুধু......নিজেকে সে যে এইভাবে রাজদ্রোহীদের সঙ্গে জড়িত করে ফেলবে চিন্তা করতে পারেনি। ভয় যে হয় না তা নয়। প্রকৃত পরিচয় যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, যন্ত্রণার শেষ থাকবে না। মৃত্যুকে তার ভয় নেই। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার আগে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেওয়ার কথাই তো সে প্রথমে চিন্তা করেছিল। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু মরতে গিয়ে বারবার বাধা পেয়েছে। শেষে গ্রাম ছেড়েছে।

মানীবালার আশ্রয়ে বেশ ছিল। পেটের অন্ন, পরণের বস্ত্র পেয়েছে। অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বলেই অর্থ উপার্জন করতে বেরিয়েছিল। তাই কি? না, তাকে বার করা হয়েছিল! কারা বার করেছিল তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় সে জানে না। তবে মাত্র কয়েকদিন পর থেকেই সে নিজেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। অনেক গোপন সংবাদ সে সংগ্রহ করে এনেছে। তবে মহারাজের জন্যও যে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে সে কথা কোনদিনই চিন্তা করেনি।

মাসাধিককাল পূর্বে একদিন দ্বিপ্রহরে ঘরে ফিরছে সে। এক বৃদ্ধও তার সঙ্গে সঙ্গে পথ চলছিলেন। নির্জন পথে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি পোড়াতলায় থাক তো?'

শুনেছিল। উত্তর দেয়নি।

—'কি হল, আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না?' বলেছিলেন বৃদ্ধ।

পঞ্চমী বলেছিল, 'যে প্রশ্নের উত্তর হয় না, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়ও নেই।'

—'তবু উত্তর দিতে হয়।' বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'এটাই নিয়ম।'

—'আমার নিয়ম একটু ভিন্ন। আপনি পোড়াতলায় যেতে পারেন।'

—'বটে।' নিজের মনেই গজ গজ করেছিলেন বৃদ্ধ। বলেছিলেন, 'শুনেছি তোমাদের সম্প্রদায়ে কোন শালিনতাবোধ নেই। এখন দেখলাম জনশ্রুতি সত্য।'

পঞ্চমী কথা বলেনি।

বৃদ্ধ চলতে চলতে বলেছিলেন, 'তুমি তো পোড়াতলায় থাক?'

—'না।'

—'তাহলে কোথায় থাক তুমি?'

—'জেনে আপনার কি হবে? আর আপনি জানতে চাইলে আমি বলব কেন?'

—'তুমি দেখছি খুবই দুর্মুখ। এটা ঠিক নয়।'

পঞ্চমী চুপ করেছিল।

সামান্য পরে বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রয়োজন ছিল।'

—'বিশেষ প্রয়োজন?'

—'বলতে পার।'

—'তাহলে আপনি পোড়া তলায় যান। শুনেছি, অর্থের বিনিময়ে আপনাদের মত মানুষের সেখানে প্রয়োজন মেটান হয়।'

তার কথা শুনে শব্দ করেই হেসেছিলেন বৃদ্ধ। বলেছিলেন, 'তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি, দেখছি মিথ্যে নয়।'

শুনে চলৎশক্তিহীন হয়েছিল সে।

বৃদ্ধ মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'তোমাকে বিনা কারণে অনুসরণ করছি না পঞ্চমী। ভাবছো বৃদ্ধের বোধহয় ভীমরতি হয়েছে। তা নয়।'

—'তাহলে?'

—'সেই কথাই তো বলতে চাই। একটু নির্জনে বলতে চাই।'

—'না।'

—'না কেন গো?'

—'যা বলার এখানেই বলুন।'

চিন্তা করেছিলেন বৃদ্ধ। বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। তবে তোমার গতিটা একটু মন্থর কর। মন্থরগামিনী হও। কারণ সত্যই আমি বৃদ্ধ হয়েছি।'

পথ চলতে চলতেই কথা বলছিলেন তিনি। তাকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। রাজধানীর গৃহে গৃহে তার অবাধ গতি। পুরনারীরা তাকে পছন্দ করে। কখনো নৃত্য গীতে, কখনো হাস্য কৌতুকে পুর নারীদের আনন্দ বর্দ্ধন করে সে। সুখ দুঃখের কথাও বলে।

—'আমার সম্পর্কে দেখছি অনেক সংবাদ রাখেন?' বলেছিল পঞ্চমী।

—'রাখতে হয়। পোড়া তলার বাসিন্দাদের তুমি কেউ নও। দুই বিধবার আশ্রিতা হয়েছিলে। এখন দেখা যায় সর্বত্র তোমার উপস্থিতি। বণিকের দল তোমায় বেশ পছন্দ করেন।'

—'আর?'

—'আরও অনেক কিছুই আছে। সব কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

—'বুঝলাম।' পঞ্চমী বলেছিল, 'কিন্তু কি সংবাদ সংগ্রহ করবো?'

—'মহারাজের বিরুদ্ধাচারণের সংবাদ।'

—'কেমন করে?'

—সেটা চিন্তা করে তোমাকেই স্থির করতে হবে। ছলা কলায় নিপুনা তো কম নও তুমি।'

অবাক হবার ভান করেছিল সে। বলেছিল, 'এ আপনি কি বলছেন। এ আমার বিরুদ্ধে দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কার কাছেই বা ছলা-কলার আশ্রয় নেব বলুন। শ্রেষ্ঠীদের কাছে যাই খুবই সত্য কথা। সাধারণ মানুষ আমাদের মুখ দর্শনকে অপবিত্র ভাবে। শ্রেষ্ঠীদের ভিন্ন মত। ব্যবসাস্থলে নপুংসকের আগমণ নাকি মঙ্গলের। দোষ নষ্ট হয়। অবশ্য সকলের এমত নয়। অনেক শ্রেষ্ঠীই দূর দূর করেন। আর নগরের গৃহস্থ রমনীরা নিরানন্দ জীবনে আমাকে নিয়ে একটু আমোদ উপভোগ করেন। একটু নৃত্য-গীত, কৌতুক, কিছু অশ্লীল গালি, আনন্দ দেয় তাঁদের।'

—'জানি-জানি।' বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'মহারাজের বিরুদ্ধে কথাও নিশ্চয়ই বলেন তাঁরা?'

—'তেমন কিছু.....'

—'সত্য অস্বীকার করার চেষ্টা কোর না বাছা। নারী মহলে অনেক কিছুই আলোচনা হয়। তোমাকে তা জানতে হবে। জেনে, জানাবে।'

—'আপনাকে?'

—'জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জানবে, এ রাজাজ্ঞা।'

—'বলেন কি?' চমকে উঠেছিল পঞ্চমী।

—তাই। তবে তোমার প্রত্যাশাও পূরণ করার ব্যবস্থা করা হবে। তোমায় উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তবে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে তোমায়। নির্দেশ পাবে।'

উপায় ছিল না তার। গৃহ ত্যাগ করে যে কি ভুল করেছে বুঝতে পেরেছিল। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়েছিল। মহারাজ মহীপালের গুপ্তচর নিযুক্ত হয়েছিল সে। বাধ্য হয়েই অনেক সংবাদ জানাতে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। কিছু অর্থ যে পায়নি তা নয়, তবে একাজ করতে তার বিবেকে বেধেছে। বেধেছে এই জন্য, সিংহাসনে বসার আগেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কঠোর হয়েছে, অরাজকতা দেখা দিয়েছে। শুরু হয়েছে প্রজা পীড়ন। পিতার মৃতুর পর সিংহাসনে বসে তিনি প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। বরেন্দ্রতে শান্তি শৃঙ্খলা নেই বললেই চলে।

আগে একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। কদিন আগে দ্বিতীয়বার। আর তার পরই......

সামান্য তফাতে মৎস্য শিকারি মানুষটা হঠাৎ খুক খুক করে কেসে উঠল। লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল পঞ্চমী। মুখটা দেখতে পেল না।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর কানে এল, 'পর পুরুষের মুখ দেখার সাধ তো ভাল নয়।'

তার উদ্দেশ্যেই বলা। ঠোঁট কামড়াল পঞ্চমী। চিন্তা করল। বাসন ধোওয়া শেষ। চলে গেলেই হয়। বলল, 'নিজের পুরুষ কিনা মিলিয়ে নিতে চাই গো।'

—'হিজড়ের আবার নিজের পুরুষ।'

—'আছে গো আছে। সে তুমি বুঝবে না। তা বাপু এখানে ঘাপটি মেরেছো কেন? এ গাঁয়ের মনিষ্যি বলেতো মনে হচ্ছে না। ব্যাপারখানা কি?'

—'দিনে গৃহবধূ—রাতে অভিসারিকা কেন গো?'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যেটা ধ্বক্ করে উঠল পঞ্চমীর। কোন উত্তর দিতে পরল না।

—'কি গো, চুপ কেন?'

কি বলবে চিন্তা করছে পঞ্চমী।

—'আনাচে কানাচে পেয়াদা ঘোরে, সে কথা কি জান?'

—'জানিনা। ঘোরে কেন?'

—'কেন ঘোরে, সেতো তুমিই জান।' লোকটা একটু চুপ করল। ছিপটার দিকে চেয়ে রইল খানিক। খুক খুক করে কাশল একটু। বলল, 'আজ থেকে আর রাতেরবেলা ঘর ছেড়ো না তুমি। দিনে বেরিও।

—'শরীরটায় এখনও জুত পাচ্ছি না যে।'

—'পাবে। দু-চার দিন চলাফেরা করলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্যামো হয়েছে কবরেজের কাছে যাও নি? মানী বুড়ি সব ফাঁস করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষকে দোষও দেওয়া যায় না। বুঝলে।'

চুপ করে রইল পঞ্চমী।

—'রাজ রোষে পড়লে মুস্কিলে জড়াবে। আর মুস্কিল আসান নিজেকেই করতে হবে। সাবধানে পা ফেলবে। সৈনিক, পেয়াদা, এদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। এক তরফা জুলুমতো বেশিদিন চলতে পারে না। তোমার কাজও অনেক কমে গেল।'

হয়তো গেল। শুনে পঞ্চমী কিন্তু খুশি হল না। অনেকদিন অনেক সংবাদ সে যুগিয়ে এসেছে। সৈনিক, দাণ্ডিকরা কোথায় কোথায় ঝামেলা করবে আগেভাগে খবর দিয়ে সাবধান করেছে। কি করে সে সব সংগ্রহ করেছে চিন্তা করতে পারে না। প্রায় দু'বছরের ওপর মানুষের ওপর অত্যাচার চলছে। মানুষ কতদিন মুখ বুজে সহ্য করবে?

পঞ্চমী লোকটার দিকে চাইল। মুখ দেখা যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করল,'এখন তাহলে কি করব আমি?'

—'যা হয় কিছু কর।' উঠে দাঁড়াল লোকটা।

—'তুমি কি চলে যাচ্ছ?

—'যা জানাবার জানিয়ে গেলাম তোমায়।' মাছ ধরার ছিপ গুটিয়ে নিয়ে পুকুরধার দিয়ে বাঁশ বনের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁশবন পার হলেই ধান ক্ষেত।

বাসন হাতে পুকুরধারে একটু দাঁড়িয়ে রইল পঞ্চমী। মনটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেছে। খানিকটা ফাঁকা জমি। মানীর গরু দুটো বাঁধা আছে। একটা বড় চালতা গাছ। সেটা পাশ কাটিয়ে বাড়ি।

বাড়ির কাছে এসে বুড়ো পরাণের সকটটাকে দেখতে পেল। দরজা পার করে দাঁড় করান। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। শুনতে পেল পরাণের কথা, 'বৌঠান 'কদিন মেয়েটাকে দেখতে পাইনি। সেইজন্যই একটা খবর নিতে আসা।'

মানীর গলাটা কানে এল তার, 'পঞ্চমী মেয়ে একথা তোকে কে বললে?'

অপ্রতিভ পরাণ বলল, 'ওই হল বৌঠান।'

—'না, হল না।' বুড়ি হলে কি হয়, বেশ জোর গলায়। বলল, 'দেখ বাছা, ও কি তুইও জানিস, আমিও জানি। ওকে নাম ধরেই বলবি।'

—'কিন্তু বৌঠান নামটা তো মেয়েব। পঞ্চমী।'

—'নাম মেয়ের হলে কি ও মেয়ে হয়ে গেল, না, হয় কখনো? তবে হ্যাঁ, মিথ্যে বলব না, মরণকালে আমার অনেক করেছে ও। ও না থাকলে মরে পড়ে থাকতাম কবে। মায়া পড়ে গেছে। তা হলেও ওকে মেয়ে বা ছেলে বলে মেনে নেওয়া যায় না।'

পরাণ বলল, 'বৃহন্নলারা মেয়েও নয়, ছেলেও নয়।'

পঞ্চমী ভেতরে ঢুকে বলল, 'যমের অরুচি।'

শুনে শব্দ করে হেসে উঠল পরাণ।

পঞ্চমী চোখ পাকিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতার হাসি হেসো না বুড়ো। আমি ভাল করেই জানি আমি কি। আমি কারও ভালবাসার প্রত্যাশী নই। বাড়িতে বলত হাজার জন্মের পাপে হিজড়ে হয়ে জন্মেছি। হাজার জন্ম জন্মেছি কি-না যেমন জানি না, তেমনি পাপের কথাও। এইটুকু দেখেছি যে লোকটা সৎ সে কষ্টে কাটাচ্ছে, আর যে বদমাস সে দিব্যি আছে। তাহলে যে খারাপ কাজ করছে সে পরের জন্মে পাপের ফল ভোগ করবেই?'

গেনীবালা বলল, 'করবে বৈকি। পাপ আর পারা হজম করা যায় না রে।'

—'তোমার মত?'

—'আমার মত?' থতমত খেল বৃদ্ধা। বলল, 'এখানে আমার কথা আসছে কি করে?'

—'আসছে বৈকি। হিজড়ের হাতে ভাত খেতে হচ্ছে।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধা। অনেকক্ষণ পরে বলল, —'তুই এতবড় কথা বলতে পারলি পঞ্চমী?'

—'না বলার কি আছে শুনি? কত জনেই তো দেখলে শেয়াল কুকুরের মত দূর দূর করে। ছায়া মাড়ায় না। বলে, তোর মুখ দর্শন করলে পাপ হয়।'

—'আমি তা মনে করি না। আমার মনে হয় জীবনে কিছু না পেলেও অনেক পেয়েছি আমি। তুই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস। অনেক পুণ্য করেছিলাম বলে তোকে পেয়েছি।'

পঞ্চমী বলল, 'এ তোমার মুখের কথা।'

—'নারে, বিশ্বাস কর। তোকে মা বলে ডাকতে পারি না। বাবা বলেও। তোকে আমি ভালবাসিরে।' বলতে বলতে বৃদ্ধার দুচোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

হাসল পঞ্চমী। বলল, 'থাক, খুব হয়েছে। এখন যাও ঘরে গিয়ে চুপটি করে শুয়ে পড়ো। আমি একটু আসছি।'

পরাণের সঙ্গে বাইরে এল সে।

পরাণ বলল, 'তুমি বেরুবে কবে?'

—'কোথায়?' জানতে চাইল পঞ্চমী।

—'অনেকেই তোমার খোঁজ করছে। বলেছি শরীর ভাল নয়। কাল সকালে যাবে কি?' কিন্তু কিন্তু করে কথাটা শেষ করল পরাণ।

—'কেন?' পরাণের মুখের দিকে একটু চেয়ে রইল পঞ্চমী। 'খুঁজছে আমায়?'

—'যদি যাও আমি নিতে আসব সকালে। নগরের পথ তো কম নয়। সেই জন্যই এসেছি।'

—'সেখানের অবস্থা কেমন?' গম্ভীর হল পঞ্চমী।

—'ইতর বিশেষ নয়। মহারাজ ভাইয়েদের কারারুদ্ধ করে ভাল কাজ করেননি। ভয় ভয় ভাবটা বেড়েছে। দাণ্ডিকের দল সব সময় ওৎ পেতে আছে। কখন যে কাকে ধরবে কে বলতে পারে!'

—'তাহলে তো চিন্তার ব্যাপার।' হেসে ফেলল পঞ্চমী। 'সত্যই চিন্তার।'

—'পেটের জন্যই বেরুনো। রাজ্যের হাল ভাল নয়। বসে থাকলে চলবে, তুমিই বল?'

চিন্তা করল পঞ্চমী। বলল, 'যাব। তবে একাই যাব।'

—'আমার সঙ্গে নয় কেন?'

পঞ্চমী পরাণের প্রশ্নের উত্তর দিল না।

নয়

মন্ত্রণা গৃহে একাকী বসেছিলেন মহীপাল। ঘর্মাক্ত কলেবর। বসন্তের পর গ্রীষ্মের কঠোর দিন। সূর্যোদয়ের পরমুহূর্ত থেকেই দাবদাহ শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর কোনদিন স্বস্তি ফেরে, কোনদিন ফেরে না। নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত হয়।

গবাক্ষ পথে বাইরে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন। একটুকরো আকাশ দেখতে পেলেন। ধূসর আকাশ। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গবাক্ষের কাছে এগিয়ে গেলেন। খুবই বিরক্ত তিনি। বিরক্তির কারণ....

কিছুক্ষণ পূর্বে সন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী এসেছিলেন। সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী সৌম্যকান্ত। পিতা মহারাজ বিগ্রহপালের সময় থেকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন সৌম্যকান্ত। যদিও তিনি সৌম্যকান্তকে পছন্দ করেন না। প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার কথাও চিন্তা করেছেন বেশ কয়েকবার, কিন্তু কার্যে পরিণত করেননি। বৃদ্ধের অহেতুক সর্ব বিষয়ে বাধা দান মেনে নিতেও পারছেন না।

বরেন্দ্রর অধীনস্থ সামন্তরা বর্তমানে তাঁর অনেক আদেশ অমান্য করছেন। প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য সামন্তদের সঙ্গে অলাপ আলোচনায় সমস্যা সমাধান করা হোক। তিনি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর একমাত্র বক্তব্য অধীনস্থ সামন্তরা কেন তাঁর বিরোধীতা করবেন?

সন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীকে অনেকদিন পরে সাক্ষাতের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেও সম্পর্ক মধুর নয়। কর্মঠ পুরুষ। সামন্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে প্রজাপতি নন্দী অব্যাহতি পেয়েছেন। রামপাল সন্ধিবিগ্রহিকের

স্নেহধন্য। তাকে কারারুদ্ধ করার আগে কয়েকদিন সে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়েছিল। গুপ্তচর মারফৎ সংবাদ পেয়েছিলেন প্রজাপতি নন্দীর কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল সে।

না, সেজন্য তাকে তিনি কারারুদ্ধ করেননি। শুনেছেন, কয়েকজনের পরামর্শে তিনি ভাইয়েদের কারারুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তা যে মিথ্যা এবং ভুল, তা শুধু তিনি নন, অনেকেই জানে। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মিথ্যা নয়। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বরেন্দ্রর প্রজারা উদ্যোগী হয়েছে। সৈন্য, দাণ্ডিকদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজধানীতে একদল তরুণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সংবাদ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রামপালের।

আর শূরপাল? রামপাল তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। শূরপাল তাঁর কনিষ্ঠ। সংসার বিরাগী সঙ্গীত সাধক। তাহলে তাঁকে তিনি কারারুদ্ধ করলেন কেন? যথেষ্ট কারণ আছে। সংসার বিরাগী সঙ্গীত সাধক শূরপাল রামপালের সমর্থক। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামপালের সঙ্গে তার হৃদ্যতা অনেক বেশি।

প্রজাপতি নন্দী এসেছিলেন। সঙ্গে সৌম্যকান্ত। প্রৌঢ় সন্ধিবিগ্রহিককে দেখেছিলেন তিনি। কর্মে বিচক্ষণ পুরুষ হলেও দর্শনে খুবই সাধারণ। দেখলে বরেন্দ্রর উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী বলে মনে হয় না। মনে হয় রাজ্যের একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র।

তিনি সামন্তদের বিষয়ে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'অধীনস্থ সামন্তদের অধিকাংশই অস্বাভাবিক কর দাবি মানতে চাইছেন না।'

—'অস্বাভাবিক?' ভ্রূকুটি করেছিলেন তিনি।

—'তাঁরা তাই বলছেন।' মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

—'আপনি কি বলছেন?'

—'আমি!' সামান্যক্ষণ নীরব থেকে শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'মহারাজ, আমি অধীনস্থ সামন্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি মাত্র।'

গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তাঁরা তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন আপনাকে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'উত্তরে আপনিও কিছু বলেছেন তাঁদের?'

—'উত্তর দেওয়ার অধিকার তো আমার নেই মহারাজ।'

প্রজাপতি নন্দীকে বিদায় দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর মতান্তর ঘটেছিল। উত্তেজিত হলেও তাঁর মধ্যে উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে না। নিজেকে সংযত রাখতে পারেন। বলেছিলেন, 'আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আমি চিন্তা করবো।'

চিন্তা করলেন তিনি। অধীনস্থ সামন্তদের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এতদিন যা চলে এসেছে, এখন আর তা চলা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বরেন্দ্রর অধীনতা স্বীকার করে রাজত্ব করার ইতি ঘটাতে চান তিনি।

মনে পড়ল তরঙ্গময়ীর কথা। তার আবাসে কিছুদিন যাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন, নিয়মিত না হলেও এখনও তিনি যান। লোক চক্ষের অন্তরালে এতদিন যা গোপন ছিল, এখন প্রকাশ পেয়েছে। কোনরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। নৃপতির পত্নীর সঙ্গে রক্ষিতা থাকা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। শুনেছিলেন পিতার জীবনেও......না, গোপনীয়তা প্রকাশ পায়নি। আসল সত্য অনুঘটিত থেকে গেছে। জনশ্রুতি মাত্র।

পারিবারিক বিরোধ দেখা দিয়েছে। কিছুটা বিব্রত তিনি। সর্বত্র ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। প্রজারা অসন্তুষ্ট। কর ভারে জর্জরিত। বুঝতে পারছেন। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থের পূরণ প্রজারা করবে।

দীর্ঘদিন রাজ্য রক্ষায় সৈন্য নিয়োগ সম্ভব হয়নি। অর্থের অনটন। বরেন্দ্রর সীমা সঙ্কুচিত হয়েছে। আয়ের উৎস কমে গেছে। গুপ্তচররা সংবাদ আনছে বরেন্দ্র আক্রান্ত হতে পারে। অধীনস্থ রাজ্যগুলির কোথাও কোথাও স্বাধীনতার আলোচনা চলছে। বরেন্দ্রর অধীনতা থেকে মুক্ত হতে চান অনেক নৃপতি।

অসম্ভব।

—'মহারাজ।'

ডাক শুনলেন মহীপাল। লোহিত আহ্বান জানিয়েছে। বাল্য বন্ধু তাঁর। সুযোগ সন্ধানী-চাটুকার। বিরক্ত হলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। বললেন, 'তোমার উপস্থিতির কথা কি বিস্মৃত হয়েছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল লোহিত। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'অপরাধ মার্জনা করবেন মহারাজ, প্রকাশ্য দিবালোকে অভিসারের কথা শুনেছেন কখনো?'

—'রঙ্গ করছো?' ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

—'আপনার সঙ্গে সে সম্পর্ক আমার নয় মহারাজ।'

—'বাচালতা বন্ধ কর।' গম্ভীর হলেন।

—'আমি সত্য বলছি।' বিনীতভাবে বলল সে।

—'বুঝলাম। বল, 'তোমার অতিথির সংবাদ কি?'

—'তিনি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।' এগিয়ে গিয়ে দীপাধারে অগ্নি সংযোগ করল লোহিত। কক্ষ মৃদু আলোকে পূর্ণ হল। সে বলল, 'তাকে কি নিয়ে আসব?'

—'আমার প্রস্তাব জানিয়েছো তাকে?'

—'অবশ্যই।'

—'অঙ্গরক্ষক হতে রাজি সে?'

—'বিলক্ষণ রাজি।'

চিন্তা করলেন মহীপাল। ক্ষেত্রপের (জমির জরিপ বিভাগের প্রধান) অধীনস্থ এক কর্মচারীকে তিনি অঙ্গরক্ষক পদে নিযুক্ত করতে চান। ব্যবস্থা লোহিত-ই করেছে। কিভাবে করেছে জানেন না।

দেখলেন তাকে। খুবই সাধারণ দর্শন একজন মানুষ। অথচ....চিন্তা করলেন। কিন্তু কোন উপায় নেই।

—'বল।' তার দিকে চাইলেন তিনি।

—'আদেশ করুন মহারাজ।' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

—'তোমার প্রকৃত পরিচয় অজানা ছিল আমার।

—'মহারাজ মহানুভব।'

গম্ভীর হ'লেন মহীপাল। চিন্তিত। কয়েকবার পদচারণা করলেন। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা ঠিক কি না বুঝতে পারছেন না। রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য। নিয়মিত রাজ কর্মচারী, সৈনিকদের বেতন দেওয়া ইদানীং সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য জুড়ে গোলমাল শুরু হয়েছে। অধীনস্থ সামন্তদের মধ্যে বরেন্দ্রর অধীনতা অস্বীকারের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। নিয়মিত কর প্রদানে নানান অজুহাত সৃষ্টি করছেন তাঁরা। মন্ত্রী-অমাত্যরাও তাঁর পক্ষপাতি নন। সকলেই যেন তাঁকে অস্বীকার করতে চান।

অথচ.....না, তিনি রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁর আজ্ঞা মত সকলকে চলতে হবে। তিনি লোহিতের সঙ্গীর দিকে চাইলেন। তাকে অল্পক্ষণ নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার অনুচরের সংখ্যা কত?'

—'খুবই সামান্য মহারাজ।' বিনীতভাবে বলল সে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে চাইলেন।

সে বলল, 'আপনার নিরাপত্তার প্রয়োজনে.....'

—'আমার নিরাপত্তা?' ভ্রূকুটি করলেন তিনি। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'রাজ্যের প্রয়োজনেই আমি তোমাকে আহ্বান জানিয়েছি।'

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

—'অর্থাৎ....।' কথাটা শেষ করলেন না তিনি। ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বললেন, 'এখন তুমি বিদায় নিতে পার। আমি তোমার সঙ্গে এবিষয়ে পরে আলোচনা করব।

সে চলে গেল। লোহিত দাঁড়িয়ে আছে। গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মহীপাল। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার। অদূরে প্রাসাদ। আলোকিত।

লোহিত জানতে চাইল, 'আমি কি অপেক্ষা করবো?'

—'কেন?' কথাটা বলেই লোহিতের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন তিনি। বললেন, 'শোন লোহিত, এভাবে চলতে পারে না।'

—'আজ্ঞে....'

—'জানি, প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। কর্মচারীরা গোপনে বিরুদ্ধাচারণে তৎপর। আত্মীয়রা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অধীনস্থ রাজারা সুযোগ বুঝে বিদ্রোহী হতে চাইছে।' হঠাৎ হাসলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা লোহিত, তোমার কি মনে হয়?'

—'আজ্ঞে মহারাজ।'

—'লোহিত, তোমার চাটুকারিতার বদ অভ্যাসটুকু ত্যাগ কর তুমি। মাত্রাতিরিক্ত সমীহ্ করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। আচ্ছা বাল্যকালের কথা তোমার মনে আছে?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর লোহিত ঘাড় নাড়ল।

—'আমি রাজপুত্র—তুমি এক কর্মচারীর সন্তান। আমাদের মধ্যে সখ্যতা জন্ম নিয়েছিল। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও তোমাকে আমি বেশ পছন্দ করেছিলাম। পরবর্তীকালে সে বিষয়ে কোনদিন চিন্তা করেছ তুমি?'

নীরবে আবার মাথা নাড়ল লোহিত।

—'কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল কি তোমার পক্ষে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বল।'

সামান্য নীরব থাকার পর মৃদু কণ্ঠে লোহিত বলল, নির্ভয়ে বলবো?'

—'ভয়ের কি কোন কারণ আছে?'

—'নেই, তবে বলাটা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছি না। কারণ....

—'থাক।' বাধা দিলেন মহীপাল। বললেন, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সঠিক কি-না তা যাচাই করা উচিৎ। তুমি তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন। কুপরামর্শ দিতেও পারদর্শী। বিপথগামী করতেও। অনেক সময় তুমি যেমন আমার উপকার করেছ, তেমনি অনেক ক্ষতিও। তোমার জন্যই আমি নারীতে আসক্ত হয়েছি। যাক, যা হবার হয়েছে। শোন, আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার জীবনে দুর্দিনের ঘন-ঘটা দেখা দিয়েছে। পরিণতি কি জানি না। তবে রাজা আমি। শাসন আমি করব। মন্ত্রী কর্মচারীরা আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। এখন বল, তুমি কি করবে?'

বিস্মিত হল লোহিত। কথা বলতে পারল না।

—তরঙ্গময়ীকে আমার উদ্যানবাটীতে রাখার ব্যবস্থা করছি। তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে তোমার। নামেই তুমি অমাত্য কিন্তু আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যতিত কোন কাজ তোমার নেই।' একটু চিন্তা করে বললেন, 'তাছাড়া তোমার নিরাপত্তারও প্রয়োজন।'

চমকে উঠল লোহিত।

—হ্যাঁ লোহিত। তোমাকে অপসারিত করার পরিকল্পনা আমি জানতে পেরেছি। রাজধানীতে থাকলে তুমি রক্ষা পাবে না। তুমি মগধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।'

শুনে পাষাণের মত স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল লোহিত।

মহীপাল বললেন, 'সেখানে একটা কাজের ব্যবস্থা তোমার হবে। সেই মত ব্যবস্থা পত্র তোমাকে দেব আমি।'

বিদায় নিয়ে মন্ত্রণা গৃহ থেকে বেরিয়ে এল লোহিত। তার পা কাঁপছে। বুকের মধ্যে যেন শেল হানছে। অশ্ব নয় গৃহ থেকে শিবিকায় যাতায়াত করে সে। পদব্রজেও। আজ

পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। অন্ধকারে বার বার থমকে দাঁড়াচ্ছিল। বাহকরা তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

কিছু দূর যাওয়ার পর দাঁড়াতে হল তাকে। পথ রোধ করে সামনে এক ছায়া মূর্তি। ভয় পেল না। মনে হল....

ছায়ামূর্তি বলল, 'ভয় নেই লোহিত।'

চিনতে পারল লোহিত। দিব্য। দস্যু দিব্য। অথচ তার পরিচয় এক কর্মচারী। পৌঢ়। খুবই সাধারণ দর্শন।

দিব্য বলল, 'লোহিত, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।'

—'বলুন।'

—'মহারাজের সঙ্গে এই যোগাযোগ তোমার জন্যই সম্ভব হল। এর জন্য তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

—'এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার কোন কারণ কিন্তু আমি দেখছি না। দুঃসময়ে মহারাজ আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন। আপনি তাঁকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এটুকু আমি কর্তব্য বোধেই করেছি।'

—'জানি। আমি তা স্বীকার করছি। তুমি উপকারী। কিন্তু.....হ্যাঁ লোহিত, তুমি তৃতীয় পক্ষ।'

—'সেটা কি?'

—'আমার প্রকৃত পরিচয় তুমি জান। তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব রাখা উচিৎ কি? বিচক্ষণ তুমি।'

শিহরিত হল লোহিত। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিব্যর দিকে চাইল।

দিব্য বলল, 'তবু উপকারীর.....'

বাধা দিল লোহিত। বলল, 'জানি। আশঙ্কা থাকে। হয়তো সেই জন্যই মহারাজ আমাকে বরেন্দ্র ত্যাগ করে মগধে চলে যাবার পরামর্শ দিলেন। এখন আপনি যদি মনে করেন.......কথাটা শেষ করতে পারল না সে। অন্ধকারের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়েছে দিব্য।

সামান্যক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেল যেন। ক্লান্ত অবসন্নভাবে গৃহে পৌঁছাল এক সময়।

আহার করতে ইচ্ছা করল না। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক আগেই শয্যা গ্রহণ করল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। গ্রীষ্ম ঋতু। এবছর ঝড় বৃষ্টি এখনও হয়নি। কয়েকদিন আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছে। হওয়ার দাপটে মেঘ সরে যাচ্ছে। বৃষ্টির প্রয়োজন। প্রকৃতি রুক্ষ আকার ধারণ করছে। জলাশয়গুলো কর্দমাক্ত হয়ে উঠছে। এমন অবস্থা চললে জলাভাব প্রকট হয়ে উঠবে।

রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়। লোহিত চিন্তা করল। মগধ যাত্রায় তার হয়তো মঙ্গল হবে। কিন্তু এতদিন কি করল সে? কেন করল? উঞ্ছবৃত্তি করে কি লাভ হল তার? দুরন্ত ঘৃণা তাকে নিঃশেষ করে দিল।

অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার দুচোখ জ্বালা করে উঠল। চোখে করস্পর্শ করল সে। না, জল নেই। জ্ঞান হবার পর সে কখনো অশ্রুপাত করে নি।

ক্ষুধা বোধ করল। কদিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন প্রায়। দিব্যর সঙ্গে মহারাজের যোগাযোগের কৃতিত্ব সবটা তার না হলেও দিব্যর সঙ্গে মহারাজের যোগাযোগে তার ভূমিকা কম নয়। রাজ্যের অমাত্য, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত কারো প্রতি আস্থা নেই মহারাজের। সকলকেই অবিশ্বাস আর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন তিনি। সৈন্যদের প্রতি ভরসা করেন না। সেই জন্যই দিব্যকে পরিত্রাতা রূপে নির্বাচন করেছেন। তবে কারা তাঁকে মন্ত্রণা দিয়েছে তা সে জানে না। যেমন জানে না, কাদের প্ররোচনায় দু-ভাইকে তিনি কারারুদ্ধ করে রেখেছেন।

অমাত্য পদাধিকারী সে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কর্মই করল না। করেছে শুধু মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেছে। কি লাভ হয়েছে তার? কিছু না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ডাক শুনল দ্বারের বাইরে থেকে। ভৃত্য ডাকছে তাকে।

—'কি প্রয়োজন?' জানতে চাইল সে।

মৃদু কণ্ঠে ভৃত্য বলল, একবার বাইরে আসুন।'

অন্ধকার কক্ষ আলোকিত করে দ্বার মুক্ত করল। তরঙ্গকে দেখে চমকাল, 'তুই!'

কক্ষে প্রবেশ কবতে করতে তরঙ্গ বলল, 'সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালাম বলে দুঃখীত।'

—'কি চাই?' কঠিন হতে চাইল সে।

—'কি চাইবো? না, কিছু চাইবার জন্যে আসিনি।'

—'তাহলে?'

—'বলার জন্য যখন এসেছি, নিশ্চয়ই বলব। শান্ত হয়ে বসো।'

সে দাঁড়িয়ে রইল।

তরঙ্গ তাকে চেয়ে দেখল একটু। ওষ্ঠে হাসির সুক্ষ্মরেখা। বলল, 'একটা সংবাদ জানাবার জন্য নিয়ম ভঙ্গ করে আসতে হল।'

—'প্রভাতে বলা যেত না?'

—'প্রভাতে?' অন্যমনস্ক হল তরঙ্গ। বলল, 'হয়তো বলা যেত। তবে জানোতো নারীর কৌতূহল যেমন বেশি, ধৈর্য্যও তেমনি কম।'

রুষ্ট কণ্ঠে লোহিত বলল, 'যা বলার বল।'

—'বলছি, বলছি, ব্যস্ত হচ্ছো কেন' তরঙ্গ হাসল। বলল, আচ্ছা আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি কেন করলে বলতো?'

—'এ প্রশ্ন তুই অনেক বার করেছিস আমাকে।'

—'করেছি, আবার করছি। আচ্ছা, সত্যি বলবে, তুমি কি কোনদিন যৌবনের তাড়না অনুভব করনি?'

—'তরঙ্গ।'- প্রায় চীৎকার করে উঠল সে।

—জানতে বড় ইচ্ছা করে। তোমার জন্য ঘর ছেড়েছিলাম। তুমি যা করেছো স্বার্থের জন্য। মানলাম। নারী-শরীরের প্রতি তোমার কি আসক্তি জাগে না? তুমি কি পুরুষ নও?'

চুপ করে রইল লোহিত।

—কি হল, চুপ করে রইলে কেন?

তবু কোন কথা বলল না সে।

—'নারীকে তুমি ঘৃণা কর?' তরঙ্গ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

চমকাল সে।

তরঙ্গ বলল, 'বুঝতে না পেরে ভুল করেছিলাম। পরে মনে হয়েছে। কেন?'

স্তব্ধ হয়ে গেল সে। মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠল অতীত। বাল্যের দিনগুলি। বয়ঃসন্ধিকালে নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব যে করেনি তা নয়। ঘর বাঁধার কথাও তার মনে হয়েছে, পারেনি। বাল্য স্মৃতির কষাঘাতে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হয়েছে। স্বৈরিনী মায়ের মুখটা মানসপটে ভেসে উঠেছে বার বার। রাজকর্মচারী পিতার যত্নের কোন ক্রটি রাখত না মা। বালক সে। সে সব দিনের কথা তার মনে থাকার কথা নয়। তবু মনে আছে। পিতার কর্ম ছিল রাত্রে। বিশ্রামের দিন ব্যতীত তিনি গৃহে থাকতেন না। প্রভাতে গৃহে ফিরলে মা পিতার যত্ন করতেন। সন্ধ্যায় কর্মস্থলে যাত্রা করতেন পিতা। সন্ধ্যার পরই সে নিদ্রামগ্ন হত কিন্তু বহুরাত্রি ঘুম ভেঙ্গে দেখেছে শয্যায় পিতার জায়গায় কে যেন! মাকে প্রশ্নও করেছে। মা তাকে ভুলিয়েছে।

তারপর একদিন। না, সেদিনটার কথা চিন্তা করতে চায় না সে। আজও আতঙ্কে তার বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে। সে রাত্রে মা আর তার শয্যাসঙ্গী একই সঙ্গে অজানা আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে আততায়ীকে তার পরিচিত বলে মনে হয়েছিল। মূক হয়ে গিয়েছিল সে। দাণ্ডিক এসে তাকেও প্রশ্ন করেছিল। মাথা নেড়েছিল সে। কিছু জানে না।

দিন পার হয়েছে। বছর। নাবালক পুত্রের লালন পালনের জন্য দিনের কর্ম ব্যবস্থা হয়েছিল পিতার। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে যেতেন। কৈশোরে পদার্পনের সময় পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে অসদ্ভাব ছিল না কিন্তু আন্তরিকতা গড়ে ওঠেনি। মৃত্যুর আগে পিতা একদিন তাকে কাছে ডেকে ছিলেন। তখন বেশ অসুস্থ তিনি। বলেছিলেন,—লোহিত, আজ যে কথাগুলো বলব, জানি তা অনুধাবন করার মত বয়স তোমার নয়। তবু বলতে হবে। নর নারীর সম্পর্ক, বিশ্বাস, ভালবাসার ওপর অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। সমধর্মী, সহমর্মী হতে হবে। একে অন্যের পরিপূরক। আমি চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি।'

মৃদু কণ্ঠে সে বলেছিল, 'একথা বলছেন কেন?'

পিতা তার মুখের দিকে সামান্যক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিলেন, 'সংসারে কেউ ভোলে—কেউ ভোলে না। যদিও তখন তুমি নিতান্ত বালক। শুধু এইটুকু মনে রেখ, সংশোধনের চেষ্টা যে আমি করিনি তাও নয়। করেছি। সব চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হয়েছিল। শেষে.....'

মৃত্যুর পূর্বে পিতার স্বীকারোক্তি। সত্যই সেদিন সব কথা বোঝেনি। পরে.....যৌবনের উন্মাদনায় দগ্ধ হলেও নারীর সান্নিধ্য এড়িয়ে গেছে। মনে মনে নারী বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। তরঙ্গকে দেখে বুকের মধ্যে আলোড়ন জেগেছিল। কুমার মহীপালও তখন নারী সঙ্গ কামনায় উন্মাদ প্রায়। নিত্য নতুন নারীতে আসক্ত। সংগ্রহকারী লোহিত। অন্তঃপুরে তিন পত্নী কিন্তু পত্নী অন্ত প্রাণ তিনি নন। তরঙ্গকে নিয়ে এসেছিল সে। আবেদন ছিল আশ্রয়ের। কুমার স্বীকৃত হয়েছিলেন।

তরঙ্গ যেন ফুঁসছে। প্রশ্ন করল, 'কি পেলে?'

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

—'মহারাজের উদ্যান বাটীতে আমি আশ্রয় পাচ্ছি।' 'হাসল তরঙ্গ। বলল, 'তুমি আমার ত্রাণকর্তা, সেইজন্যই সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আর একটা কথা বলে যাব।"

মুখ তুলে চাইল লোহিত।

—'তুমি আমার সর্বনাশ করেছ, কি উপকার করেছ জানি না। তবে তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়। জীবনে কিছুই পেলে না তুমি।'

শুনে তার সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। দেখল তরঙ্গ চলে যাচ্ছে। ডাকল, 'তরঙ্গ, শোন।'

তরঙ্গময়ী দাঁড়াল। তাকে দেখল। বলল, 'বুঝেছি। জানতাম তুমি ডাকবে। আজ আর তা হয় না।'

—'জানি।' শান্ত কণ্ঠস্বর লোহিতের। বলল, 'নিজের জন্য তোর সর্বনাশ করেছি, এটা পুরো মানতে আমি রাজি নই। আমি পুরুষ নই, একথাও ঠিক নয়। ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখেছি। কেন পারিনি, তা শুধু আমি জানি।'

তরঙ্গ চলে গেল।

শেষরাত্রে লোহিতও গৃহ ত্যাগ করল। প্রভাতে ভৃত্য দেখল তার প্রভু গৃহে নেই।

দশ

পার হয়ে গেছে দুটো ঋতু। আকাশে বর্ষার ঘনঘটা। কয়েকদিন যাবৎ সমানে বর্ষণ চলছে। মধ্যাহ্নের পর বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমলেও বর্ষণ বন্ধ হয় নি। করতোয়া নাকি কানায় কানায় পূর্ণ। এভাবে যদি আরো দু-একদিন বৃষ্টি হয়, কারাগারের মধ্যে নদীর স্রোত বইবে। ত্রৈলোক্য সকালে সেই কথাই বলছিল। তার মুখ মণ্ডল গম্ভীর আকার

ধারণ করেছে। দীর্ঘদিন আগে মহারাজ নয়পালের সময় বন্দীশালা জলপূর্ণ হয়েছিল। মৃত্যু ঘটেছিল অনেক বন্দীর।

কালাচাঁদ বলেছিল, 'বোধ হচ্ছে এবারও সেইরকম ঘটনাই ঘটবে। করতোয়া এর মধ্যে বহু পল্লী ভাসিয়েছে।'

ত্রৈলোক্য উত্তর করেনি। সে বেশ চিন্তিত।

পর পর দুদিন সাক্ষাৎ হয়েছে শূরপালের সঙ্গে। অবশ্যই রাত্রে। গভীর রাত্রে রামপাল গিয়েছিল। ব্যবস্থা ত্রৈলোক্য আর কালাচাঁদের।

কিভাবে তারা প্রহরীদের নজর এড়িয়ে শূরপালের কাছে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল জানে না। সংবাদের আদান প্রদান কিছুদিন যাবৎ চলছিল। সাক্ষাৎকার প্রথম।

শূরপাল বিস্মিত হয়েছিলেন। কিছুটা শঙ্কিত। বলেছিলেন, 'না-না, এভাবে তুমি এসো না। বিপদ ঘটতে পারে।'

গতরাত্রে রামপাল জানিয়েছিল, 'আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

—'প্রস্তাব। কি প্রস্তাব?' অবাক হয়েছিলেন শূরপাল।

—'আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

—'চলে যাব! কিভাবে?'

—'তেমন ব্যবস্থা করা হবে।'

সামান্যক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'ব্যবস্থা কি তুমি করেছ?'

সে চুপ করে ছিল।

—'কোথায় যাব, রাজধানীতে?'

—'না। সেখানে যাবেন না। মগধে যাবেন আপনি।'

—'মগধে, কেন?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব ছিল সে। রাজ্যের অবস্থা ভয়াবহ। অধীনস্থ রাজারা বরেন্দ্রর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধ আসন্ন। মন্ত্রী অমাত্যরা মহারাজ মহীপালকে বিদ্রোহী রাজাদের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু মহীপাল সকলের প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি যুদ্ধ করবেন।

এখন কারাগৃহে বসে সব সংবাদই পাচ্ছে রামপাল। তার ওপর দৈহিক নির্যাতন এখন বন্ধ হয়েছে। কারাধ্যক্ষ সদয় ব্যবহার করছেন। কখনো কখনো তিনি তার কাছে আসেন। দু চারটি কথাও বলে যান। তার স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থাও কিছুটা করা হয়েছে।

শূরপালের উপর দৈহিক নির্যাতন খুব একটা হয়নি। প্রথম দিকে ঘন ঘন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তিনি কখনো উত্তর দিয়েছেন, কখনো দেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'বরেন্দ্রর সিংহাসন নয়, তাঁর বাদ্য যন্ত্রগুলি পেলেই খুশি হবেন।' কারাগারে বাদ্যযন্ত্র তিনি পান নি। আহার নিদ্রায় সময় কাটান।

শয্যায় শুয়ে চিন্তা করছিল রামপাল। অনেক কথাই মনে পড়ছিল তার। পিতৃ

বিয়োগের পর মাতুল মহণের সঙ্গে যদি রাষ্ট্রকূট যাত্রা করত, তাহলে আজ এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত না। মহারাজ মহীপাল এখন কারারুদ্ধ করে রেখেছেন, যে কোন সময় হত্যার আদেশও দিতে পারেন। কেন যে জীবিত রেখেছেন কিছুটা অনুমান যে করতে পারে না তা নয়, বরেন্দ্রর প্রজারা মহীপালের প্রতি প্রসন্ন নয়। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সংবাদও তার অজানা নয়। নিশ্চয়ই প্রজাদের রোষের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেননি তিনি, সিংহাসনের নিরাপত্তার কারণে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

সিংহাসনের নিরাপত্তার কারণেই কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তবে কারারুদ্ধ করে তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নি। প্রজাদের প্রিয় সে। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবে একথা সে চিন্তা করেনি কোন দিনই। এখন সংবাদ পায়। ত্রৈলোক্য-কালাচাঁদ অনেক সংবাদই নিয়ে আসে। কি ভাবে তারা সংবাদ সংগ্রহ করে বুঝতে পারে না।

কালাচাঁদই প্রথম কথাটা বলেছিল,—'কুমার, এভাবে কষ্টের কালযাপন আপনার পক্ষে উচিৎ হচ্ছে না।'

কথাটা বুঝতে পারেনি সে।

—'যদি ইচ্ছা করেন এখান থেকে মুক্তি পেতে পারেন আপনি।' বলেছিল সে।

—'মুক্তি পেতে পারি?' বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—'পারেন।' মৃদু কণ্ঠে বলেছিল কালাচাঁদ। 'এখন মনস্থির করতে হবে আপনাকে।'

—'কিভাবে?'

—'সেটা বলাতো সম্ভব নয় কুমার। চেষ্টা করলে সবই সম্ভব।'

শুনে গম্ভীর হয়েছিল।

অল্পক্ষণ পরে কালাচাঁদ বলেছিল, 'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

—'তা নয়।' সে বলেছিল, 'মুক্তি পাওয়া যদি অসম্ভব না হয়, 'তাহলে তুমি নিজে বন্দীশালায় আবদ্ধ হয়ে আছ কেন? তুমি নিজেও তো মুক্ত হতে পার?'

গম্ভীর হয়েছিল সে। বলেছিল, 'পারি না একথা বলব না। নিরাপত্তার কারণেই এখানে আছি কুমার।'

—'নিরাপত্তার কারণে?'

—'বিশ্বাস করুন কুমার। এখান থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরুলেই দিব্য আমাকে প্রাণে মেরে দেবে। সেই জন্যই। এখানে জীবনের নিরাপত্তা আছে।'

শুনে চমকে উঠেছিল। কালাচাঁদ অনেক গোপন কথা প্রকাশ করেছিল সেদিন। যদি কুমার শূরপাল সম্মত হন কালাচাঁদ ও ত্রৈলোক্য কারাগার থেকে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে। শুধু তাই নয়, তিনি নিরাপদে যাতে মগধে পৌঁছাতে পারেন তার দায়িত্বও তারা নেবে।

—'কেন?' প্রশ্ন করেছিল সে, 'তোমরা কেন আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে চাও?'

ত্রৈলোক্য নীরবে হেসে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'কি জানি। আমাদের দুজনেরই মনে হয়েছে।'

কালাচাঁদের দিকে চেয়ে তাকেও প্রশ্ন করেছিল সে। কালাচাঁদ কোন উত্তর দেয় নি।

গবাক্ষ পথে আকাশের দিকে চাইল রামপাল। বৃষ্টি ঝরছে। বেগ কম। অন্ধকার ভাবটা কেটেছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ঘোর হয়ে আসছে আকাশ। অনেক দিন হল করাবাস চলছে। প্রথম প্রথম দৈহিক নির্যাতনের শেষ ছিল না। পর পর চারটে ঋতু পার হয়ে গেল। আরো কতদিন যে.....

চিন্তাটা শেষ হবার আগেই হাসি পেল তার। এখন মাঝে মাঝেই হাসি পায়। জীবনের কথা চিন্তা করে। কুমার রামপাল তার ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। রাজার কুমার বিনা অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করছে। হয়তো রাজকূলে জন্মানটাই তার অপরাধ। চিন্তা করে.......না, চিন্তা আসে। মন তাকে ভাবায়। আগে এমন হত না। এখন হয়। তুচ্ছাতি তুচ্ছ ঘটনার কথাও মনে পড়ে। অখণ্ড অবসর। কারাধ্যক্ষের বদান্যতায় এখন কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। চিন্তা তো আসবেই।

নির্যাতনের দিনগুলোতেও জননীর কথা মনে পড়তো বার বার। মনে পড়তো তার কথা। পুণ্ড্রবর্দ্ধন যাত্রার পূর্বে দেখা হয়েছিল। ফেরার পর মিলিত হবার কথা দিয়ে গিয়েছিল। সাক্ষাৎ ঘটেনি আর।

কাঞ্চন। কাঞ্চনমালা। দু'বছর আগে বালিকার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাৎটি মধুর ছিল না। এক বর্ষণ ক্লান্ত অপরাহ্নে প্রথম দেখেছিল তাকে। আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গিয়েছিল বলা যায়।

কিশোর রামপাল গণ্ডিবদ্ধ জীবনে অস্বস্তি বোধ করত। এজন্য অন্তঃপুর পরিচালিকা রোহিণীর কাছে জননীকে অনেক অভিযোগ শুনতে হয়েছে। জননী বলতেন, 'তুমি যখন তখন প্রাসাদ ত্যাগ করে কোথা যাও? শুনেছি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাইরে থাক তুমি।'

—'প্রতিদিন নয়।'

—'জানি। মাঝে মধ্যে প্রাসাদে ফিরতে তোমার বেশ রাত্রি হয়। বাইরে যাও কেন?'

চুপ করে থেকেছে সে।

—'কি হল, কথা বলছ না কেন?'

মৃদুকণ্ঠে বলেছে, 'ফিরতে দেরি হয়ে যায়।'

—'তুমি যাও কোথায়?'

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সত্য কথা বলেছে। প্রায়দিনই বেরিয়ে পড়ে সে। রাজধানী ত্যাগ করে এক-একদিন যেদিকে ইচ্ছা হয় চলে যায়। সঙ্গী ছাড়াই যায় সে।

জননী বলেছেন, 'এ তুমি ঠিক কর না।'

নীরব থেকেছে।

—'তুমি রাজকুমার। বংশ মর্যাদা, আভিজাত্য.....শুনেছি অতি সাধারণ বেশে তুমি পথে ঘুরে বেড়াও।'

উত্তর দেযনি।

—'কোন এমন কর?'

কি উত্তর দেবে স্থির করতে পারেনি। এক সময় বলেছে, 'আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার জন্যই......'

বাধা দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'সকলের সঙ্গে মেলা মেশায় আমার আপত্তি নেই। কিন্তু রাজকুমার'হয়ে দীন হীনের মত পোশাকে তুমি পথে বেরুবে কেন?'

—'রাজকুমারের পোশাক মানুষের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করবে মা।'

—'তাহলে তুমি বলতে চাও পোশাকটাই সব?'

—'হয়তো তা নয়। তবে.....

—'থাক।' গম্ভীর হয়েছিলেন জননী। বলেছিলেন, 'তোমার চিন্তাধারা, বিশ্বাসে আমি আঘাত করছি না। তবে বাইরের আবরণটাই সব নয়। তুমি যদি মনে করে থাক পোশাক মাহাত্মে তুমি মানুষের মন জয় করবে, তাহলে কিন্তু মস্ত ভুল করবে তুমি। আসল হচ্ছে তোমার ব্যবহার, আন্তরিকতা। মানুষের আপন জন হয়ে ওঠা কঠিন সাধনা পুত্র। আর.....'

জননীর মুখের দিকে চেয়েছিল।

—'নিজের নিরাপত্তার কথাটা ভুলে যেও না। তোমার স্বাধীনতায় আমি বাধা সৃষ্টি করব না। আমি সতর্ক করছি তোমায়।'

জননীর কথা ভোলে নি। সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করেছে। প্রকৃতির হাতছানি উপেক্ষা করতেও পারেনি। রাজধানী থেকে বেরিয়ে অশ্বারোহণে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। করতোয়ার তীরে তীরে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে কতদিন। ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি নেমেছে।

প্রাসাদে ফেরার পর মুখোমুখি হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে। অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির পৌঢ়। বিনা বাক্যব্যয়ে তার বিশ্রাম আহারাদির ব্যবস্থা করেছে।

প্রধান পরিচারক গঙ্গা। অন্যান্য ভৃত্যরা তার কথা মত চলে। কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব আবাস নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং তা বৃদ্ধা রোহিনীর নির্দেশেই। তাই হয়। রোহিণীই সবকিছু স্থির করেন। প্রধান পরিচারক রূপে নিযুক্ত হয়েছিল গঙ্গা। গম্ভীর প্রকৃতির স্বল্পভাষী পৌঢ়। তীক্ষ্ন দৃষ্টি। যেন তার অভিভাবক। নিশ্চয়ই তার মারফৎ সব কিছুই জানতে পারেন রোহিণী। অবশ্য তিনি নিজে কিছুই বলেন না। বলেছেন জননী।

তার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ কবে বেরিয়ে পড়া নিয়ে জননী বারে বারে সাবধান করেছেন। তাঁর আশঙ্কা নিশ্চয়ই কুসংসর্গে না পড়ে যায়। আশ্বস্ত করেছেন তাঁকে।

প্রাসাদ থেকে দূরে, করতোয়ার তীরবর্তী এক গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে কাঞ্চনের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। অশ্বারোহনে যাচ্ছিল সে। বালিকা কণ্ঠে ডাক শুনেছিল, 'এই শোন। হ্যাঁ, তোমাকেই ডাকছি আমি।'

বিস্মিত হয়েছিল সে। বালিকাকে দেখেছিল। বলেছিল, 'আমায় ডাকছো? কেন?'

একটা পেয়ারা গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল বালিকা। গাছের দিকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ওই যে বড়, ডাঁসা পেয়ারাটা দেখা যাচ্ছে, তোমাকে ওটা পেড়ে দিতে হবে।'

—'কিভাবে পাড়বো?'

—'পারবে না?'

দেখেছিল সে। পথের দিকে ঝুলে আছে ডালটা। অশ্বের গতি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ডালটা নামিয়ে পেয়ারাটা পেড়ে বালিকাকে দিয়েছিল। খুশি হয়েছিল বালিকা। অবিশাস্য দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'কখন থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিছুতেই পাড়তে পারি নি।'

—'এখন খুশি তো?'

কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে বালিকা তার দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'এটা তুমি নাও।'

অবাক হয়েছিল সে। বালিকাকে দেখেছিল। দোহারা গঠন। চাপা গায়ের রং। নাক চোখ সাধারণ। একমাথা ভ্রমরকৃষ্ণ কালো কেশ, আর আশ্চর্য সুন্দর আয়ত দুই আঁখি। বড় মিষ্টি মুখটি। বলেছিল, 'না-না, সে কি! ওটা তুমিই রাখ। আমার প্রয়োজন নেই।'

শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বালিকা বলেছিল, 'আমি তোমাকে দিচ্ছি। নিতে হয়।'

—'কেন?'

আবার হাসি। সরলতায় ভরা। বলেছিল, 'না নিলে দুঃখ পাব।'

হেসে ফেলেছিল সে। বলেছিল, 'তুমি দেখছি অদ্ভুত মেয়ে। ঠিক আছে নিচ্ছি। তোমার নাম কি?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, কাঞ্চন, কাঞ্চনমালা। তোমার নাম?

নিজের নাম বলা উচিৎ হবে কিনা চিন্তা করছে, দূর থেকে নারী কণ্ঠে ডাক ভেসে এসেছিল। আর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল সে। হাতের পেয়ারাটা হাতেই ছিল তার।

তারপর দীর্ঘদিন আর ওপথে যায়নি। কাঞ্চনমালা নামের বালিকার কথা বিস্মৃত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে শীতের শেষে পাতা ঝরার লগ্নে আবার কাঞ্চনের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল তার। দেখে বিস্মিত হয়েছিল। নিতান্ত বালিকার কি বিস্ময়কর পরিবর্তন! উদ্যানের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়েছিল সে। কাছে যেতেই চমকে উঠেছিল কাঞ্চন।

প্রশ্ন করেছিল, 'কি করছো? চিনতে পারছো?'

আয়ত দুই আঁখি মেলে তার দিকে একবার চেয়েই ঘাড় নেড়েছিল।

—'সেদিন পেয়ারাটা না দিয়েই চলে গিয়েছিলে কিন্তু।'

আবার চমকে উঠল কাঞ্চন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'আপনার মনে আছে সে কথা?'

—'কেন থাকবে না। মনে আছে। যাক, না দিয়ে ভালই করেছিলে। পেয়ারা খেতে আমার খুব একটা ভাল লাগে না। তবে দেখে মনে হয়েছিল তোমাদের গাছের পেয়ারা খুবই সুস্বাদু।'

—'হ্যাঁ, সেই জন্যই দিতে চেয়েছিলাম আপনাকে।'

—'পেয়ারাটা খাওয়ার সময় মনটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল তোমার?'

—'সেই পেয়ারাটা আমি খাইনি।'

—'সে কি! কেন? কি করলে তাহলে? ফেলে দিলে?'

—'না, রেখে দিয়েছি।'

—'রেখে দিয়েছো? আশ্চর্য!

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল কাঞ্চনমালা। ওকে দেখতে দেখতে মনের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করেছিল প্রথমে। মনে হয়েছিল.....সেই বালিকা! সেদিন কিছু মনে হয় নি। ভাল লেগেছিল। অনুরোধ রক্ষা করে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল বালিকার মুখ। দ্বিতীয় সাক্ষাতে সেই বালিকা মূর্তি অন্তর্হিতা। বিস্ময় বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মতই তাঁর হৃদয়কে প্লাবিত করেছিল।

তারপর বার বার ছুটে যাওয়া। কখনো দেখা হয়েছে, কখনো হয় নি। দেখা হলে বলেছে, 'কাঞ্চন, আমি এসেছিলাম।'

—'জানি।'

—'জান যদি, দেখা দিলে না কেন?'

—'আমার উপায় ছিল না। সাক্ষাৎ করার জন্য আসছিলাম। বাধা পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল।'

—'অথচ তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ পথ আমি ছুটে এসেছিলাম।'

অপরাধিনীর ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকত সে।

—'আজ আমি চললাম।'

—'চলে যাবেন?'

—'হ্যাঁ কাঞ্চন। আমার কিছু জরুরী কাজ আছে। আচ্ছা.....'

কাঞ্চন মুখ তুলে চেয়েছে।

—'আমাদের এই সাক্ষাতের কথা তোমার পিতা মাতা জানেন?'

—'না। কেন?'

—'আমি আমার জননীকে তোমার কথা বলেছি। বলেছি আশ্চর্য সুন্দর একটি বালিকার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, সখ্যতা গড়ে উঠেছে।'

মুখ মণ্ডলে আবীরের ছোঁয়া লেগেছে তার। চোখের পাতা হয়েছে ভারী। মৃদু কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে, 'আপনার জননী শুনে নিশ্চয়ই রাগ করেছেন?'

—'না, কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তোমার কথা জানতে চেয়েছেন তিনি। তোমার পিতা-মাতার কথাও।'

—'আমার পিতা নেই।'

—'আমার পিতারও মৃত্যু ঘটেছে। তোমার পিতার কি হয়েছিল?'

—'জানিনা।' জ্ঞান হবার পর থেকে আমি আমার পিতাকে কখনো দেখিনি। মাকে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাইনি। হয়তো আমার পিতা ছিল না।'

শুনে হেসেছে সে। কাঞ্চনের মনের সরলতার স্পর্শ অনুভব করেছে। বলেছে, 'ওসব কথা থাক কাঞ্চন। নিশ্চয়ই তোমার পিতা ছিলেন। কোন বিশেষ কারণবশতঃ তোমার জননী তাঁর কথা প্রকাশ করতে চান না। হয়তোবা তিক্ত কোন কারণবশতঃ।'

নীরব থেকেছে কাঞ্চন। বড় অসহায় দেখিয়েছে তাকে। মায়া জেগেছে মনে।

ইচ্ছা থাকলেও কদিন যাওয়া সম্ভব হয়নি। যেদিন গেছে দেখা পায়নি। ফেরার সময় ডাক শুনেছে। দেখেছে গম্ভীর মুখমণ্ডল। বলেছে, 'বিশেষ কারণে আসা সম্ভব হয়নি কাঞ্চন।'

—'রাজকার্য?'

—'তা নয়। সংসারের কত কাজ। আমি তো জননীর একমাত্র সন্তান। কাজকর্ম কিছু কিছু করতে হয় বৈকি।'

—'তা ঠিক। মিথ্যা সময় ব্যয় করা উচিৎ নয়। আগে কাজ।'

—'না, তা নয়। তবে......হেসে ফেলেছে। বলেছে, 'তুমি রাগ কোরনা কাঞ্চন। বিশ্বাস করো।'

—'থাক। কাজে অবহেলা ঠিক নয়। এভাবে আর আসবেন না।'

—'বেশ। তুমি যদি না চাও আসব না। আজ চলি তাহলে।' অশ্বের বল্গা ধরে এগিয়ে গেছে।

—'শুনুন।' দূর থেকে ডেকেছে কাঞ্চন।

ফিরেছে সে। কাছে গিয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছে।

—'সত্যি আর আসবেন না?' বলেছে কাঞ্চন। দু'চোখে আমন্ত্রণ।

—'নিষেধ করলে কি করে আসি?'

—'কে নিষেধ করেছে! আমি? মোটেই না।' মাথা ঝাঁকিয়েছে কাঞ্চন।

হেসেছে সে। ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। আরক্ত হয়েছে কাঞ্চন।

পার হয়েছে ঋতু। পরপর তিনটি ঋতু। দুজনের ব্যবধান কমেছে। সহজ হয়েছে। পণ্ড্রবর্দ্ধন যাবার আমন্ত্রণ এসেছে। বিবাহে যাত্রার কথা জানিয়েছে কাঞ্চনকে। ফেরার পর সাক্ষাতের দিনটির কথা বলে গিয়েছিল। সাক্ষাৎ ঘটেনি। পণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে প্রত্যাবর্তনের দিনই মহারাজ মহীপালের আদেশে দাণ্ডিকরা তাকে বন্দীশালায় নিয়ে এসেছিল। কাঞ্চন নিশ্চয়ই........

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সচকিত হল। দুজোড়া উৎসুক চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। ত্রৈলোক্য আর কালাচাঁদ।

—'তোমরা?'

—'দেখলাম গভীর চিন্তামগ্ন আপনি। সেইজন্যই বিরক্তি উৎপাদন করিনি।' বলল ত্রৈলোক্য, 'তা ভিন্ন প্রয়োজন তো সামান্যই। সন্ন্যাসী এখন পথ পরিক্রমা করছেন।'

বাক্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল না রামপাল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চাইল।

ত্রৈলোক্য বলল, 'পরণে কষায় বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সঙ্গী পরিবৃত হয়ে পদব্রজে রাজ গৃহের দিকে যাত্রা করেছেন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে।'

—'ত্রৈলোক্য!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিল প্রায়।

চকিতে স্থান ত্যাগ করল কালাচাঁদ। চাপা কণ্ঠে ত্রৈলোক্য বলল, 'আত্মসংবরণ করুন কুমার। বিপদ যে কোন্‌দিকে ওৎ পেতে আছে কে বলতে পারে!'

—'কিন্তু.....'কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার।

—'চিন্তা করবেন না। সে ব্যবস্থাও হয়েছে। আপন প্রকাষ্ঠে কুমার শূরপাল নিশ্চয়ই আছেন। তবে আজ সূর্যোদয়ের পর থেকে তিনি কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করবেন না। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কারাধ্যক্ষ যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গীত সাধনার ব্যবস্থা করছেন ততোক্ষণ তিনি আপন সঙ্কল্পে অটল থাকবেন।'

—'বুঝেছি। কিন্তু এমনটা কিভাবে সম্ভব হল? আর কারাধ্যক্ষ যদি.....'

—'নিশ্চিন্ত থাকুন। জানবেন, অসম্ভব কিছুই নয়। কালাচাঁদ অশেষ গুণের অধিকারী। ওর অসাধ্য কিছু নেই। জীবন রক্ষার্থেই ওর কারাবাস তা তো আপনাকে আগেই বলেছি। মহাকপি কারাধ্যক্ষ খুবই অসহায়।'

শুনল রামপাল। মধ্যম ভ্রাতার সঙ্গে রাত্রেই সাক্ষাৎ ঘটেছিল তার। স্নেহময় পুরুষ। বলেছিলেন, 'নিজের প্রতি যত্ন নিও।'

কি ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন বুঝতে পারেনি সে।

এগারো

দুটি গো-সকট ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে রাজমহলের পথে। গন্তব্যস্থল চম্পা (ভাগলপুর)। ভৃগুই চম্পা যাত্রার পরামর্শ দিয়েছিল ভানুপ্রিয়াকে। কারণ বরেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক বারই সে চম্পায় গেছে। সুন্দর শুধু নয়, মনোহর নগরী চম্পা, এবং কয়েকবার সেখনে যাতায়াতে বেশ কিছু পরিচিত জন আছে তার। সেখানে গিয়ে পৌছাতে পারলে নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবে। তা ছাড়া আছে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্ন। যদিও কিছু অর্থ এবং অলঙ্কার ভানুপ্রিয়ার আছে, কিন্তু তা ভাঙ্গিয়ে কতদিন চলবে

আর। ভৃগু বলেছিল, 'দেশ ত্যাগ করতে চাও ভাল কথা। আমি সাহায্য করব নিশ্চয়ই। তারপর কি হবে?'

অকপটে ভানুপ্রিয়া বলেছিল, 'সে ভাবনা আমি কোন দুঃখে ভাবতে যাব?'

অবাক হয়েছিল ভৃগু। বলেছিল, 'আমাকে জড়াতে চাও?'

—'তুমি আর জড়ালে কোথায়?'

—'সে তো তোমার জন্য। তুমিইতো আমার সর্বনাশ করেছিলে।'

—'তা বটে।' গম্ভীর হয়েছে ভানুপ্রিয়া।

ভৃগু কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেছে। গলাটা ধরা ধরা। বলেছে,'জন্মেছি নরকে। জন্মদাতার পরিচয় নিয়ে কোন চিন্তা ছিল না। অন্ধকার জগৎটাকে শাসন করেছিলাম। তোমাকে দেখে সব গোলমাল হয়ে গেল। পরে শুনেছি তোমার পিতৃ পরিচয় ছিল। ভাগ্য বিড়ম্বনায় তোমার মা শিশু কন্যা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। তুমি যা করেছ তাতে কোন অন্যায় দেখি না। তোমার কন্যারও পিতৃ পরিচয় আছে। কে তিনি?'

ভানুপ্রিয়া কথা বলেনি।

ভৃগু বলেছে, 'তুমি কি তোমার কন্যার পরিচয় কোনদিনই প্রকাশ করবে না?'

—'উপায় নেই ভৃগু।' ম্লান কণ্ঠে বলেছে ভানুপ্রিয়া।

—'ও কি পাবে?' ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে সে। বলেছে, 'চিন্তা করেছ কখনো?'

—'জানি না।' কষ্টটা বুকে চেপে বলেছে ভানুপ্রিয়া।

—'বলতে চাও ভাগ্যের পথে চলবে?' স্পষ্ট চোখে ভানুপ্রিয়ার শীর্ণ মুখখানার দিকে চেয়ে থেকেছে ভৃগু।

—'তাই।' মৃদু কণ্ঠে বলেছে ভানুপ্রিয়া।

—'তুমি আমি, আমরা সকলে, সমস্ত মানুষই কি ভাগ্য নির্দিষ্ট পথে চলছি? কি হল, চুপ করে কেন, উত্তর দাও?'

ভানুপ্রিয়া কথা বলেনি। কি বলবে সে।

হেসেছে ভৃগু। বলেছে, 'দেখ ভানু, ভাগ্য-টাগ্য আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না বলতে, ভাগ্যের দোহাই দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে আমি রাজি নই। এতটা জীবন তো আমি চেষ্টা করেছি। কি পেয়েছি, আর কি পাইনি তার হিসাব কষতে বসিনি কোনদিন। তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্ন আমার পূর্ণ হয়নি জানি। তা বলে এই নয়, বেশ্যার ছেলের স্বপ্ন দেখা শোভা পায় না। তুমি কি বল?'

—'আমি!' চিন্তা করেছে ভানুপ্রিয়া। ভৃগু তার জন্যই সব ছেড়েছিল সে জানে। ভৃগুকে তার তখন খারাপ লাগেনি, আজও লাগে না। ওর মধ্যে এক সময় প্রচন্ড হিংস্রতার প্রকাশ পেয়েছিল। সে সময় প্রকাশ্য দিবালোকে ও বেশ কয়েকজনকে খুন পর্যন্ত করেছে। আবার সেই ভৃগুর কি আশ্চর্য পরিবর্তন। ও বলেছে, তার জন্যই। ভানুপ্রিয়া তা মানতে পারেনি। আসলে ভৃগু যা করেছিল তা অন্ধ আক্রোশে, বঞ্চনার

জ্বালায়। পরিচয় হীন অন্ধজগতের সন্তান ভৃগু ব্যর্থতায়-গ্লানিতে ক্ষিপ্ত, হিংস্র, উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। সে চেয়েছিল সবকিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিতে। অন্ধকার জগতের অধিবাসীনিদের নয়, যারা ক্ষণিকের তাড়না চরিতার্থ করতে আসে, যারা সৃষ্টি করেছে জগৎটাকে, তাদের হুঁশিয়ারী দিতে।

কিন্তু একা ভৃগুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। পণ্যা নারীর সৃষ্টিতো দীর্ঘকাল পূর্বে। বার-বধূর সৃষ্টি পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। ফসল ভৃগুরা। বড় কষ্ট, যন্ত্রণা তাদের। পরিচয়হীন। কিছুই নেই। কেউ নেই। জঞ্জাল তারা।

ভৃগু বলেছে, 'কি হল ভানু, চুপ করে আছ কেন?'

—'কি বলব আমি?' ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে ভানুপ্রিয়া।

—'তুমি কি কিছুই বলবে না?' সাগ্রহে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে ভৃগু।

—'আমি কোনদিন চিন্তা করিনি।'

—'ঘর বাঁধার স্বপ্ন তুমি দেখনি কোনদিন? দুচোখে কৌতুক উপছে পড়েছে ভৃগুর।

—'মিথ্যা বলব না, দেখেছি। আবার ভয় হয়েছে। ঘৃণা জেগেছে। আমার জন্ম ঘরেই। ভাগ্য মাকে নরকে ঠেলে দিয়েছে।'

—'ভাগ্য না তোমার মায়ের সৌন্দর্য?'

জানে ভানুপ্রিয়া। কাল হয়েছিল মায়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য। বলেছিল, 'ওকথা থাক ভৃগু।'

—'থাক।' গম্ভীর হয়েছিল সে। বলেছিল, 'এখন বল।'

—'বলার দিন তো শেষ হয়ে যায়নি ভৃগু।

ভৃগু আপন মনেই মাথা নেড়েছে। সঙ্গী হতে সম্মতি জানিয়েছে। একসময় নিজের মনেই হেসে উঠেছে।

—'কি হল?' জানতে চেয়েছে ভানুপ্রিয়া।

—'এর নামই বোধহয় ভাগ্য, তাই না ভানু? কারণ ভিন্ন নাকি কোন কাজ হয় না। শুনেছি এ কথা। আচ্ছা আমি কি কারণে তোমাদের সঙ্গী হবো? তোমাদের রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব নেব, বলতে পার? কিসের প্রত্যাশায়?'

—'প্রত্যাশা কিছু কি নেই তোমার? ধরা ধরা কণ্ঠস্বর ভানুপ্রিয়ার।

—'ছিল কি-না তাতো তুমি জান। আজ যে নেই তাও বলব না। তবে একটা কথা মাঝে মাঝেই মনে হয় আমার।'

—'কি কথা?'

—'মনে হয় তোমাদের মা মেয়ের মধ্যে আমি কেন?'

—'তোমার প্রয়োজন নেই বলছো?'

—'তা ঠিক নয়। তোমাকে আপন করে পাবার ইচ্ছাটা এখন আর জাগে না। দৈহিক আকর্ষণ আগের মত আর অনুভব করি না। হয়তো বয়সের ধর্ম। শুধু.....

—'শুধু কি?'

—আজ মনে হয় তুমি ভাল থাক। কাঞ্চনের যেন কোন কষ্ট না হয়।'

—'আমিও তো তাই চাই ভৃগু।'

—'কি?'

—'তোমার মত বন্ধু যেন না হারাই।' ওর একটা হাত চেপে ধরেছে ভানুপ্রিয়া।

—'মা-মাগো।'

কন্যার ডাকে সংবিত ফিরে পেল ভানুপ্রিয়া। তার দিকে তাকাল।

—'আমার ভাল লাগছেনা মা।' কাঞ্চন বলল, 'এভাবে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

—'কি করতে চাও তুমি?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে কন্যার মুখের দিকে চাইল ভানুপ্রিয়া।

—'যদি বল, তাহলে আমি একটু হাঁটতে পারি। বল মা।'

পক্ষকাল এইভাবে চলছে। সকট দুটির ব্যবস্থা ভৃগুই করেছে। সমস্ত দিন পথ চলা। সন্ধ্যার পূর্বে কোন পান্থশালায় রাত্রিবাস। একটি সকটে সাংসারিক জিনিসপত্তর। অন্যটিতে মা মেয়ে। সকটের আগে পথ চলে ভৃগু। হাতে তার একটি দণ্ড।

ভানুপ্রিয়া বলেছে, 'ভৃগু তুমিও তো সকটে বসে যেত পার।'

ভৃগু বলেছে, 'ভানু, পথ চলতে আমি অভ্যস্ত। আমার জন্য চিন্তা করো না।'

—'চিন্তা করি ভৃগু। জানি তোমার একটি পা কমজোরি। দেখি, পথ চলতে তোমার বেশ কষ্ট হয়।'

—'সামান্য হয় এখন। তবে আমি পারছি। সকটে যেতে আমার ভাল লাগবে না।' হেসেছে সে।

—'তবু মধ্যে মধ্যে চড়লে আরামবোধ করবে।'

এখন তাই করে ভৃগু। চালকরা জোর করে। ওর জন্য মধ্যে মধ্যে কষ্ট অনুভব করে ভানুপ্রিয়া। কষ্ট অনুভব করে আর একজনের জন্য। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কোর। ক্ষণিকের দুর্বলতায় নয়। বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখার মুহুর্ত থেকেই ভালবেসেছি। তোমাকে আমি অযত্ন করব না। স্বীকৃতি দেব।'

—'না।' মৃদু কণ্ঠে বলেছিল ভানুপ্রিয়া।

—'কেন নয়। তুমি তো......

—'তা হয় না মহরাজ।'

—'যদি তোমার গর্ভে সন্তান এসে যায়। যদি.....'

—'সে জন্য চিন্তা করবেন না। তার সত্য পরিচয় প্রকাশ হবে না কোনদিন।'

তিনি মেনে নিতে পারেননি তার কথা। অনেক বুঝিয়েছিলেন। বোঝেনি যে তা নয়। বুঝেছিল ভানুপ্রিয়া, কিন্তু বিব্রত করতে মন চায়নি তার। রাজ্যারম্ভে যিনি প্রবল শত্রুকে পরাভূত করেছিলেন, তিনিই নিকট আত্মীয়দের শত্রুতায় ব্যতিব্যস্ত। শুনেছে উত্তরের কাছে। মগধ থেকে ফেরার সময় আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভাগ্যের জোরে রক্ষা পেয়েছেন। সেই জন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। তা ভিন্ন......

—'মা।' ডাকল কাঞ্চন।

কন্যার মুখের দিকে চাইল ভানুপ্রিয়া।

—'আমি একটু পথ চলতে চাই মা।' বলল কাঞ্চন।

বুঝতে পারছে ভানুপ্রিয়া। খুবই কষ্ট হচ্ছে ওর। বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া এভাবে মন্থর গতি গো-সকটে একভাবে বসে যেতে কষ্ট তারও কিছু কম হচ্ছে না। দিনান্তে যাত্রা শেষ হবার পর নেমে দাঁড়াতে পারে না। পা ঝিন ঝিন করে। মাথা ঘোরে। যদিও বসার ব্যবস্থা বেশ ভালই করেছে ভৃগু। তবু কষ্ট হয়। এভাবে চলতে অভ্যস্ত নয়।

কন্যাকে দেখল ভানুপ্রিয়া। ওর জন্যই তাকে দূরে চলে যেতে হচ্ছে। ভুল তার হয়নি। ভুল করতে সে পারে না। যদিও সঠিক কিছু জানা সম্ভব হয়নি ভৃগুর পক্ষে। কুমার রামপালকে দেখতে পায়নি ভৃগু। যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাতে কুমার প্রাসাদে আবদ্ধ থাকেন না। তিনি প্রায়দিনই অশ্বারোহণে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ান। প্রত্যক্ষ দর্শীরাই ভৃগুকে জানিয়েছিল। পাল রাজবংশে কুমার শূরপাল আর রামপাল ব্যতিক্রম। একজন সঙ্গীত সাধনা করেন। সঙ্গীতের বাইরে জগৎ-সংসার নিয়ে তাঁর কোন চিন্তা ভাবনা নেই। অন্যজন কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে মেলামেশায় অভ্যস্ত। দেখলে কেউ ধরতেই পারবে না তিনি রাজকুমার।

ভানুপ্রিয়া প্রথমে বুঝতে পারেনি। কাঞ্চন গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে প্রায়ই চলে যায়। যায় বাল্যকাল থেকেই। নামেই উদ্যান। কোন পরিচর্যা নেই। কিছু ফলের গাছ, আগাছাব জঙ্গল। সাবধান করেছে, বাধা দেয়নি। কি করবে, কোন সঙ্গী নেই। কাছেই করতোয়া। চারিদিক নির্জন। শ্রেষ্ঠীর উদ্যান বাটী। রক্ষিতার জীবন যাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল তার। মা তাকে তার নরক জীবন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিল। পরিবর্তিত হল ভাগ্য।

একা একা বড় হয়েছে কাঞ্চন। সকালে দুপুরে উদ্যানে গিয়ে বসে থাকত। সতর্ক, সাবধান করেছে কন্যাকে। একদিন ......হ্যাঁ, সেদিন ওকে ডাকতে না গেলেই বুঝি ভাল করত সে। তাই মনে হয়। তাকে দেখার মুহূর্তে তার সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। কাকে সে দেখল? কাকে? ভ্রম?

তারপর? তারপর? কদিন দেখল। না, ভুল হতে পারে না। একজনের প্রতিচ্ছবি। ভুল হওয়ার নয়। এমনকি দাঁড়ানোর ভঙ্গি, পদক্ষেপ, বড় মিল-বড় মিল।

—'কাঞ্চন, কে ওই তরুন?'

মায়ের প্রশ্নে ক্ষণিক চিন্তা করেছিল কন্যা। বলেছিল, 'আমার সখা।'

—'সখা!'

—'হ্যাঁ মা। তাই বলেন উনি। দীর্ঘকাল পূর্বে দেখা হয়েছিল। আবার এসেছেন।'

—'পরিচয় জান? কোথায় নিবাস?'

—'জানি। উনিই বলেছেন। রাজধানীর কাছেই গৃহ। পিতা নেই। জননী আছেন।'

—'আর কিছু?'

—'আর কিছু জানি না। জানতেও চাই নি।'

—'তোমার পরিচয় জানে?'

—'বলেছি আমি। একথাও বলেছি আমি পিতৃ পরিচয়হীনা।'

শুনেছে ভানুপ্রিয়া। বুক কেঁপেছে। কিশোরী কন্যার চোখের দৃষ্টিতে দেখেছে.....না, সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় গোপন করেছে তরুন। ভৃগু কুমারের শারিরীক বর্ণনা জানিয়ে কিছুটা রহস্য উদ্ধার করেছে। চলেছে স্থানান্তরে। যদিও কুমার কারাগৃহে।

কাঞ্চন ডাকল, 'মা।'

—'যাও।' ভানুপ্রিয়া বলল, 'তবে বেশি এগিয়ে যাবে না।'

চলন্ত সকট থেকে নেমে পড়ল কাঞ্চন। দু'পাশে শষ্যক্ষেত। চঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। দেখতে লাগল ভানুপ্রিয়া।

সামান্য পরে কাছে এল ভৃগু। ডাকল, 'ভানু।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভৃগুর দিকে চাইল সে।

—'যদি মনে কর.....'

—'না ভৃগু।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সে, 'ওর খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

—'তোমার?'

—'আমার কথা বাদ দাও।

—'কেন?' ওর চোখের দিকে চাইল ভৃগু। বলল, 'অহেতুক চিন্তা তোমার।'

ভৃগুর চোখ থেকে চোখ সরাল না ভানুপ্রিয়া। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'চিন্তা করছি, না এলেই পারতাম।'

—'না ভানু, চলে আসার প্রয়োজন ছিল। তোমার কন্যার জন্য। আমার মনে হয় চম্পাতে তোমার কন্যার নতুন জীবনের সূচনা হবে। সে নিশ্চয়ই.....' কথাটা শেষ করল না ভৃগু।

—'তাই কোর।'

—'কিছু তো করতে হবে ভানু।' হাসল ভৃগু।

ভানুপ্রিয়া তাকে একটু দেখল। বলল, 'হাসলে কেন ভৃগু?'

—'কেন হাসলাম?' একটু উদাস হল সে। কিছুটা আত্মগতভাবেই বলল, 'এখন

মাঝে মধ্যেই হাসি পায় আমার। এখনকার জীবনটার কথা ভেবেই। না-না, বিশ্বাস কর ভানু, খারাপ লাগে না। নিজেকে তোমাদের একজন বলেই ভাবার চেষ্টা করি। ঠিক করি না? তুমি কি বল?'

ভানুপ্রিয়া চুপ করে রইল।

—'মানুষের সব আশা তো পূরণ হয় না। কাজে তো লেগে গেলাম। কি, তাই না?'

তবু চুপ করে রইল ভানুপ্রিয়া।

—'আমার কথা শুনে বোধহয় বিরক্ত হচ্ছো। ভাবছ, কোন....না-না, সে চিন্তা কোর না। আমি নিশ্চয়ই তোমার সম্মান রক্ষা করব। আর সময়তো অনেক কিছুই পাল্টে দিয়েছে। মনটারও পরিবর্তন হয়েছে। এখন কাছে থাকাটাই ভাল লাগে। বিশ্বাস কর। তোমার মেয়েকে আমি সত্য সত্যই স্নেহ করি। সুন্দর, ফুলের মতই।'

কথাটা বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ভৃগু। অনেকটা দূরে চলে গেছে কাঞ্চন। ভানুপ্রিয়া চোখ বুজল। সত্যই সে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ভৃগু আছে।

মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল ভৃগু। এখন এগিয়ে আসছে। কাঞ্চন তার চলার গতি দ্রুত করল। ভাল লাগছে। অনেকদিন পরে হঠাৎ ভাল লাগার স্পর্শ পেল। দীর্ঘদিন হল মন বিষণ্ণ। কিছুই ভাল লাগে না তার। বলে গিয়েছিল আসবে। এসেছিল কি-না জানে না সে। সেদিন যেতে পারেনি। নিশ্চয়ই ফিরে গিয়েছিল। আর এল না।

বরেন্দ্র ত্যাগ করতে তার মন চায়নি। প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু মায়ের কথা অমান্য করতে পারেনি। ভৃগুও তাকে বুঝিয়েছিল। চম্পার কথা বলেছিল।

ভৃগু কেউ নয়। মায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক অনুমান করেছিল। একটু বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মানুষটা। খুবই অগোছাল। পোশাকে পারিপাট্য দেখেনি জ্ঞান হবার পর থেকে। দোহারা গঠন। নাক চোখ সাধারণ। একমাথা কাঁচা পাকা চুল। অথচ দেখলে বৃদ্ধ বলে কখনও মনে হয় না। চোখের দৃষ্টিতে চঞ্চলতা। দেখলে অস্থির মনে হয়। মাকে কখনও খুব ভালভাবে কথা বলতে শোনেনি ভৃগুর সঙ্গে। মানুষটা মায়ের কাছে এলে শান্ত হয়ে যায়। কেন, বুঝতে পারেনি কাঞ্চন।

এখন ভৃগু তার দিকে এগিয়ে আসছে। দুটো গো-সকট অনেক দূরে। তাদের চম্পাতে পৌঁছে দেবে। দাঁড়াল কাঞ্চন। বলল, 'কি হল?'

—'তোমার মা বেশী দূরে যেতে নিষেধ করছে।'

—'কেন?'

—'নির্জন পথ। ভয়ের কারণ নেই একথাও বলা যায় না।'

—'দস্যুর ভয়?'

—'দস্যু ছাড়া হিংস্র জন্তু জানোয়ারেরও অভাব নেই। আরো দণ্ড খানেকের মধ্যেই একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। সেখানে আহার এবং বিশ্রাম নেব আমরা।'

—'তারপর?'

—'সূর্যাস্তের আগেই গঙ্গার ধারে একটা গঞ্জ পড়বে। বেশ বড় গঞ্জ। সেখানে অনেকগুলো পান্থশালা আছে। আজকের রাত্রিবাস।

—'তোমার দেখছি সবই পরিচিত।'

ভৃগু চুপ করে রইল।

—'আচ্ছা ভৃগু, তোমায় একটা প্রশ্ন করব?' এক সময় বলল কাঞ্চন।

ভৃগু কাঞ্চনের দিকে চাইল। ভানুপ্রিয়া তাকে নাম ধরে সম্বোধন করে। কাঞ্চনও। ভৃগুই তাকে শিখিয়েছে। মৃদু আপত্তি করেছিল ওর মা।

—'আচ্ছা তুমি আমার কে হও?' একসময় জিজ্ঞাসা করল কাঞ্চন।

—'সম্পর্ক?' কাঞ্চনের মুখের দিকে চাইল ভৃগু। 'তুমি সম্পর্কের কথা জানতে চাইছো?'

—'হ্যাঁ।' কাঞ্চন বলল, 'সকলের সঙ্গেই, যারা পরিচিত, একটা সম্পর্ক থাকে তো?'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল ভৃগু। বলল, 'তোমার কি মনে হয়? মনে হয় না তোমার?'

—'আমার?' চিন্তা করল কাঞ্চন। 'আমার তো অনেক কথাই মনে হয়। বুঝতে পারি না।'

—'কি তুমি বুঝতে পারনা কাঞ্চন?'

—'তুমিতো কোথায় কোথায় চলে যাও। যখন থাকতে না তোমার কথা মাকে জিজ্ঞাসা করলে মা রূঢ় ব্যবহার করত আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গেও করে। 'কেন?'

—'আমি তোমাদের কেউ নই বলেই করে কাঞ্চন। সত্যই কোন সম্পর্ক নেই।'

—'অথচ মনে হয়.....' চুপ করে গেল কাঞ্চন।

—'কি মনে হয় তোমার? গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল ভৃগু।

—'আমাদের অবলম্বন তুমি। শুধু বুঝতে পারি না দেশ ত্যাগ কেন? কেন এই যাওয়া? তুমি জান কিছু?'

কিছু যে জানে না তা নয়, জানে। সব কথা বলেনি ভানুপ্রিয়া। বুঝেছে সে। কাঞ্চনের জন্মদাতার পরিচয়.....একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভৃগুর। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আত্মীয়তা, সম্পর্ক, গড়ে ওঠে কাঞ্চন। তোমার জন্যও আমি চিন্তা করি। আমার কেউ নেই, কেউ নও তুমি, তবুও।' হাসল। বলল, ভেবেছিলাম......হল না, হতে দিলে না তুমি।'

—'আমি?' অবাক হল কাঞ্চন। 'আমি কি করলাম? কি করেছি তোমার আমি?'

—'কি করেছ সেটাই বুঝতে পারি না। বড় চিন্তা হয়। বড় ভাবাও আমাকে।' হাসল ভৃগু। 'বিশ্বাস কর কাঞ্চনমালা।'

ভৃগুর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের দিকে চাইল কাঞ্চন। উজ্জ্বল দুই চোখের দৃষ্টি তার মুখের ওপর ন্যস্ত। বড় ভাল লাগল তার। মনে হল দু'চোখের দৃষ্টিতে অফুরন্ত স্নেহ ঝরে পড়ছে।

বার

দ্রুত পদক্ষেপে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন মহারাজ মহীপাল। দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য তিনি অন্তঃপুরে গিয়েছিলেন কিন্তু আজ আহার করা তাঁর ভাগ্যে লেখা নেই। তিন পত্নীর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে আসন ত্যাগ করে উঠে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। দ্রুতপদক্ষেপে চলার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও করছিলেন তিনি। আহারের স্পৃহা তাঁর চলে গেছে, এখন যাবেন কোথায়! দ্বিপ্রহরে কয়েক দন্ডের জন্য অন্তঃপুরে এসে আহার এবং বিশ্রাম করেন। এখন কি করবেন তিনি?

উদ্যান বাটিতে যাওয়া যায়। এতদিন যা অপ্রকাশ্য ছিল, এখন আর তা নেই। তরঙ্গময়ীকে রক্ষিতা রূপে উদ্যান বাটিতে স্থান দিয়েছেন। এটি কোন নিন্দনীয় ঘটনা নয়। শুধু পত্নীরাই তার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে টিকা টিপনি, পরিহাস করে। এতদিন সীমা অতিক্রম করেনি। আজ সহ্য করতে পারলেন না।

আহ্বান শুনে দাঁড়াতে হল তাঁকে। দাসীটিকে চিনতে পারলেন। অন্তঃপুর চালিকা রোহিনীর দাসী। করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, 'কিছু বলবে?'

'কর্তা মা আপনাকে স্মরণ করেছেন।' মৃদু কণ্ঠে জানাল সে।

ক্ষণিক চিন্তা করলেন তিনি। পিতৃস্বার সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। প্রয়োজনও হয় না। বুঝতে পারলেন না হঠাৎ কেন তিনি সাক্ষাৎ করতে চান! অবশ্য আগেও এমন হয়েছে। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

প্রণাম জানিয়ে চলে গেল দাসী।

তিনিও রোহিনীর আবাসের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রাসাদের পূর্বপ্রান্তে তিনি থাকেন। শেষ প্রান্তে। শুনেছেন প্রয়োজন না হলে নিজের আশ্রয় ছেড়ে বিশেষ কোথাও যান না। সারাদিন পূজা অর্চনা নিয়েই সময় কাটান। কিন্তু অন্তঃপুরের সব কিছুই তাঁর নখদর্পনে। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনার কথা তাঁর কাছে পৌছে যায়। যেন সহস্র চক্ষু তিনি।

কক্ষদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রোহিনী। তাঁকে দেখে বললেন, 'এসো।'

পিতৃস্বসাকে প্রণাম করলেন মহীপাল।

রোহিনী বললেন, 'হাত মুখ ধুয়ে নাও।'

বুঝতে পারলেন না মহীপাল। তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

—'তুমি অভুক্ত। আগে আহার করে নাও।'

—'এই জন্যই কি.....'

বাধা দিলেন রোহিনী। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু আলোচনা আছে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে আহারে বসলেন তিনি। চিন্তা করলেন, রোহিনী কি করে জানতে পারলেন তিনি অভুক্ত। প্রশ্নও করলেন।

উত্তর দিতে সামান্য সময় নিলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'এ প্রশ্ন নিরর্থক।'

বুঝতে পারলেন তিনি। বৃদ্ধার কথা আগে শুনেছেন। বুদ্ধিমতী মহিলা। বয়সের ভারে শরীর কিছুটা ন্যুব্জ, কিন্তু......না, অসন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বৃদ্ধার স্নেহের পাত্র হলেও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি কোনদিনই। বরং বরাবর বৃদ্ধাকে এড়িয়ে চলেছেন। শূরপালের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বৃদ্ধার। প্রতিদিনই প্রণাম করে যেত সে। তবে তাকে কারারুদ্ধ করার পর সাক্ষাৎ হলেও কিছু বলেননি। রামপালের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। তিনি নিজে যেভাবে ভাইয়েদের সঙ্গে পিতৃস্বসার যোগাযোগের সংবাদ জেনেছেন, তিনিও নিশ্চয়ই সেইভাবেই অন্তঃপুরের সমস্ত ঘটনার কথা জানতে পারেন। এটাই স্বাভাবিক।

—'এ যুদ্ধ কি সংঘটিত না হলেই নয়?'

বৃদ্ধার শান্ত মৃদু কণ্ঠের প্রশ্নে চমকে উঠলেন মহীপাল। তাঁর দিকে চাইলেন।

—'যদিও রাজ্য পরিচালনা, রাজ্য রক্ষা বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। এ সম্পর্কে তোমাকে কোনরকম পরামর্শ দেওয়াও আমার উচিৎ নয়। আমি শুধু জানতে চাইছি। যুদ্ধ কি এড়ান যায় না?' খুবই ধীরে কথাগুলি বললেন রোহিনী।

—'না'। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই খারাপ শোনাল।

—'তাহলে আমার কিছু বলার নেই।' শান্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা।

মহীপাল একটু সময় নিলেন। বরেন্দ্রর সামন্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা তো তিনি করেননি। বিদ্রোহী হয়েছে সামন্তরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যদিও মন্ত্রীরা তাঁকে সামন্তদের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির পরামর্শ দিয়েছেন। তা সম্ভব নয়। বললেন, 'যুদ্ধ আমি চাইনি।'

বৃদ্ধা বললেন, 'জানি। বরেন্দ্রর সে সামর্থ্যও নেই।'

মহীপাল নীরব রইলেন। রোহিনীও। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করলেন তিনি। বললেন, 'আপনার কথা অস্বীকার করছি না। সমবেত সামন্তদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে হয়তো বা পরাজয় ঘটতে পারে কিন্তু পাল বংশের সম্মান, ঐতিহ্য, সম্ভ্রম বজায় থাকবে।'

—'সম্মান, ঐতিহ্য, সম্ভ্রম—কি বলতে চাইছো তুমি?'

—'বুঝতে পারছেন না?'

—'পারছি না, বলব না, কিন্তু তিনটির একটিও কি রক্ষা করেছ তুমি? বংশের ইতিহাসে কোনদিন ভাইকে কারারুদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে কি? বরং ভাইয়ের বুদ্ধি বাহুবলে রাজ্য বিস্তার ঘটেছে।'

—'জানি। তাঁরা নমস্য। সামন্তদের সঙ্গে ভাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা কখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি।'

—'তুমি বলতে চাইছো...........

বাধা দিলেন মহীপাল। বললেন, 'পরামর্শ দাতাদের প্ররোচনায় নয়, প্রমাণ সংগ্রহের পরই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছি। জানবেন, দু-ভাই-ই আমার স্নেহের পাত্র ছিল।'

আর কথা বললেন না রোহিনী। নত মস্তকে বসে রইলেন। মহীপালের অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করেন না। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

এক সময় মহীপাল আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। বিনীতভাবে বললেন, 'আমার ব্যবহারে হয়তো আঘাত পেয়ে থাকবেন। জানবেন, এ ভিন্ন আমার সামনে অন্য পথ নেই।'

রোহিনী চোখ তুলে চাইলেন তাঁর দিকে।

ধীর পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন মহীপাল। দাসী এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। তিনি তার দিকে চাইলেন।

দাসী বলল, 'ছোট কুমারের জননী এসেছেন। কিন্তু.....

—'কি?'

—'আপনি তো এখনও অভুক্ত?'

—'তা হোক। তুই গিয়ে বল, আমি আসছি।'

দাসী চলে গেল। রোহিনী উঠলেন। খাওয়ার স্পৃহা তাঁর চলে গেছে। কয়েকদিন যাবৎ অমঙ্গল চিন্তায় খুবই কাতর তাঁর মন। মহীপালের স্বর্গত জননীর কথা মনে পড়ল তাঁর। খুবই অবুঝ এবং জেদী ছিল সে। অকারণে অশান্তির সৃষ্টি করত। আত্মাভিমানী ছিল। খুবই সুন্দরী ছিল সে। সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে ভালবাসত। দুই পুত্রের মধ্যে জননীর রূপ এবং গুণের অধিকারী হয়েছে জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ শূরপাল রাজবংশের সন্তান হয়েও বংশের ধারা পায়নি। বরং মাতুল বংশের ধারা বর্তেছে তার মধ্যে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের এক সামন্ত কন্যা ছিল ওদের জননী। কন্যা জন্মের পর পত্নী বিয়োগ ঘটেছিল তাঁর। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নি। কন্যার পরিণয়ের পর ভাইয়ের হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে একবার ফিরেছিলেন। কিছুদিন পরে আবার দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি তাঁর।

শূরপাল তার মাতামহের মতই আত্মভোলা, উদাসীন প্রকৃতির হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গীত সাধনায় রত হয়েছিল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিবাহ দিয়েছিলেন। সামান্য দিন পরে পত্নী বিয়োগ ঘটায় নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল সে। তিনি বিশ্বাস করেন না জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত ছিল।

ষড়যন্ত্র তিনি অস্বীকার করেন না। বরেন্দ্রর রাজ পরিবারে ষড়যন্ত্র নতুনও নয়। কিশোর রামপাল ষড়যন্ত্রকারীদের একজন একথা ভাবলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। চঞ্চল প্রকৃতির কিশোর স্বার্থ চিন্তার অনেক উর্দ্ধে।

রামপাল জননী যৌবনশ্রী উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়েছিল। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি তাকে

দেখলেন। বিষাদ প্রতিমা যেন। রাষ্ট্রকূট তনয়াকে প্রথম দিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। পরে মনোভাব পরিবর্তন হয়েছিল। যৌবনশ্রী ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমতী ও নম্র স্বভাবা। খুব অল্পদিনের মধ্যেই বরেন্দ্রর খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে ভাষা পর্যন্ত আয়ত্ব করে নিয়েছিল। ভাল লেগেছিল তাঁর। মতের পরিবর্তন ঘটেছিল।

প্রশ্ন করলেন, 'কি হল, তুমি?'

হাসলেন যৌবনশ্রী। ম্লান হাসি।

আসন গ্রহণ করলেন তিনি। বললেন, 'এসো, আমার কাছে বস।'

মৃদু কণ্ঠে যৌবনশ্রী বললেন, 'আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।'

—'অন্যায় হয়েছে, কেন? অবাক হলেন। 'কি অন্যায় হয়ে গেল তোমার?'

—'বোধ হচ্ছে এখনও আপনার আহার হয়নি। আমি এখন যাচ্ছি। পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।'

—'আমার যে আহার হয়নি, একথা কে বলল তোমাকে, দাসী?'

—'আজ্ঞে না।' একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হল।'

—'সঠিক অনুমান তোমার।' গম্ভীর হলেন। বললেন, 'তবে আজ আর আহার করবো না। যদি ইচ্ছা হয় রাত্রে সামান্য কিছু আহার করবো।'

—'না, না, এমন করবেন না। আপনার শরীর কিছুদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছে না। অনাহারে থাকা আপনার পক্ষে ঠিক নয়।'

উদাস হলেন রোহিনী। যৌবনশ্রীকে দেখলেন। বললেন, ঠিক আছে। শোন, চিন্তা কোরনা। তেমন অঘটন যদি কিছু ঘটে, এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত থাক, অন্তঃপুরে প্রবেশ করার সাধ্য শত্রুদের হবে না। তুমি সেই আশঙ্কাতেই আমার কাছে এসেছ তো?'

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ল যৌবনশ্রী। তাঁর মনে হল বৃদ্ধা যেন অন্তর্যামী।

হাসলেন রোহিনী। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'ভয় কি?' আমি তো আছি।'

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি বসেছিলেন দুজনে। মহারাজ মহীপাল আর দিব্য। মন্ত্রণা গৃহের দ্বার রুদ্ধ। বাইরে সতর্ক প্রহরা। কক্ষ নিষ্প্রদীপ।

দুজনেই বসে আছেন। দীর্ঘক্ষণ নির্বাক। এক সময় মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'অহেতুক চিন্তা করছেন কেন মহারাজ।'

—'চিন্তার কারণ কি নেই?'

—'স্বীকার করছি আছে। তবে আমার সঙ্গীদের ওপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন। যুদ্ধ বিদ্যাতে যথেষ্ট পারদর্শী তারা।'

—'মেনে নিলাম তোমার কথা। কিন্তু বিদ্রোহী সামন্তদের সৈন্য সংখ্যা তো কম নয়। তোমার লোকেরা কি করতে পারে সেখানে, তুমি বল?'

—'অস্বীকার করছি না মহারাজ। তবে....'

—'বল।'

—'মন্ত্রীদের পরামর্শ মত আপনি সামন্তদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিলেই পারতেন। আমার কথায় অসন্তুষ্ট হবেন না। যুদ্ধে প্রাণহানি ঘটে। আমি সেইজন্যই......'

—'থাম। বিরক্তি প্রকাশ পেল মহীপালের কণ্ঠে। বললেন, 'শোন দিব্য, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করছি না। আমি আমার মনের সন্দেহটুকুই প্রকাশ করেছি মাত্র।'

—'মহারাজ আমি নিজের জীবন দিয়েও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব।'

—'সে বিশ্বাস আমার আছে। শোন দিব্য, আমি রাত্রি প্রভাতে সসৈন্যে সীমান্তে যুদ্ধ যাত্রা করবো। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

দিব্য বলল, 'মহারাজ আপনি যেমন আদেশ করবেন, আমি পালন করবো।'

চিন্তা করলেন মহীপাল। বললেন, 'না, তুমি পৃথকভাবে যাত্রা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হব আমরা। এখন তুমি যেতে পার।'

প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল দিব্য। অন্ধকার মন্ত্রণা গৃহে একাকী বসে রইলেন মহীপাল। দিব্যর কথা চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। দিব্যকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়? আবার দিব্যর ওপর নির্ভর করা ভিন্ন কোন পথও তাঁর সামনে নেই। রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য। সৈন্যবল অনেক হ্রাস পেয়েছে। মন্ত্রীরা বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলেছিলেন। অসম্ভবা। বরেন্দ্রর অধীনতা মুক্ত হতে চান সামন্তরা। তা তিনি মেনে নিতে পারেন না।

আগামী কাল প্রভাতে যুদ্ধ যাত্রা করবেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রধান সেনাপতি সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। দিব্যর সঙ্গীরাও মিলিত হয়েছে সৈন্যদের সঙ্গে।

জরিপ বিভাগের কর্মচারী দিব্য। দস্যু! কখনো চিন্তা করতে পারেননি তিনি। দিব্যর অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত বরেন্দ্র। তাকে ধরার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছে। বহুবার তার বহু সঙ্গী ধরা পড়েছে কিন্তু দলপতি সম্পর্কে তারা কোন সংবাদই দিতে পারেনি। কারণ দলপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলেও দলপতির মুখদর্শন কখনো করেনি তারা।

বরেন্দ্রর ত্রাস দিব্যর সংবাদ এনেছিল লোহিত। যোগাযোগ সেই ঘটিয়ে ছিল। লোহিত বরেন্দ্র ত্যাগ করে চলে গেছে।

আসন ত্যাগ করে উঠলেন মহীপাল। মন্ত্রণা গৃহের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। নিষ্প্রদীপ চতুর্দিক। অঙ্গ রক্ষক এগিয়ে এল তাঁর কাছে।

—'যশ শর্মা।'

—'আজ্ঞে মহারাজ।'

—'একবার উদ্যান বাটিতে যাব।' শুধুমাত্র তুমি আমাকে অনুসরণ কর।'

যশশর্মা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তিনি এগিয়ে গেলেন। উদ্যান বাটির দূরত্ব কিছু কম নয়। আলোকিত রাজপথ। যুদ্ধ সংবাদে নাগরিকরা আপন আপন কাজ শেষ করে গৃহে ফেরার চেষ্টা করছে, কিন্তু পথ জনহীন নয়। অনেকেই মহারাজকে পদব্রজে যেতে দেখে বিস্মিত হল।

বিস্মিত হল তরঙ্গময়ী। বলল, 'এ আপনি কি করেছেন মহারাজ?'

—'কি করলাম?' অবাক হলেন তিনি।

—'দীর্ঘ পথ আপনি অরক্ষিত অবস্থায় পদব্রজে এলেন। যদি.....' কথাটা শেষ করল না সে। আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে মুখে।

—'ঠিক তাই। আমি দেখছিলাম আমার আততায়ীরা আমাকে হত্যা করার জন্য ওৎ পেতে আছে কি-না। দেখলাম আমার আশঙ্কা সত্য নয়। এতদিন মিথ্যাই আমি ভয় পেয়েছি। আমার প্রতি জনরোষ আছে সত্য কিন্তু আমার জীবনহানি কেউ চায় না।'

তরঙ্গময়ী নীরব রইল। কি-ই বা বলতে পারে সে। মহীপাল সম্পর্কে তার মনে কোন দুর্বলতার জন্ম হয়নি। একান্ত নিরুপায়, বাধ্য হয়েই দেহদান করে একজন মানুষের কাম চরিতার্থ করেছে।

—'কি ভাবছ তরঙ্গ?'

কণ্ঠস্বরে মহারাজের দিকে চাইল সে। কথা বলল না।'

মহীপাল বললেন, 'প্রভাতে আমি যুদ্ধযাত্রা করছি।'

তরঙ্গময়ী নীরব রইল।

—'লোহিতের সংবাদ আমি জানি না। সে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর তার সন্ধানের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। পাওয়া যায়নি। আচ্ছা......'

তরঙ্গময়ী তার দিকে চাইল।

—'লোহিত কেন চলে গেল বলতে পার তুমি?'

—'না।' মাথা নাড়ল সে।

—'শোন, যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মতই জীবিত থাকা বা মৃত্যু ঘটা। যদি না ফিরি তুমি কি করবে স্থির করে নিও।'

তরঙ্গময়ী নির্বাক।

বসেছিলেন মহীপাল। উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'তোমার শরীর আমাকে তৃপ্ত করেছে, বলতে পার তোমার সান্নিধ্য আমার অনেক যন্ত্রণাও ভুলিয়েছে।' একটু নীরব রইলেন। তরঙ্গকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। বললেন, 'যদিও এসব কথা বলার সময় এখন নয়। কখনো কখনো তোমার প্রতি রূঢ় আচরণও করেছি।'

মহীপালের দিকে মুখ তুলে চাইল তরঙ্গ।

মহীপাল বললেন, 'এবার যাই।'

—'আপনি কি পদব্রজেই প্রাসাদে ফিরবেন?' বলল তরঙ্গময়ী।

—'কেন?'

—'আততায়ীরা যদি.....'

অন্যমনস্কভাবে তরঙ্গময়ীর মুখের দিকে চাইলেন মহীপাল। তাকে দেখলেন। ওষ্ঠে এক টুকরো মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর। কথা না বলে এগিয়ে গেলেন। দাঁড়ালেন আবার। বললেন, 'চিন্তা কোর না।'

তের

পট পরিবর্তন হয়েছে বরেন্দ্রর। বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত মহীপাল রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কোথায় তিনি আত্মগোপন করেছিলেন, কেউই জানে না। কয়েক দিন পর তাঁর ক্ষত বিক্ষত গলিত মৃতদেহ করতোয়ার তীরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। বরেন্দ্রর সিংহাসন অধিকার করেছে দিব্য। অভিষেকের পর দস্যু দিব্য হয়েছে বরেন্দ্রর রাজা। মৃত মহারাজ মহীপালের গলিত শব রাজকীয় মর্যাদায় সৎকার করার ব্যবস্থা করেছে সে। রাজ অন্তঃপুর বাসিনীদের অভয় দিয়েছে। তাঁরা সকলে অন্তঃপুরেই থাকবেন। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার।

মহীপালের সিংহাসনারোহণের আগে থেকেই বরেন্দ্রে অরাজকতা শুরু হয়েছিল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মানুষ। কিছু কিছু বণিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোপনে রাজধানী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, এখন প্রকাশ্যেই রাজধানী ত্যাগ করা শুরু হয়ে গেছে। রাজা দিব্যর আশ্বাস বাণীতে কেউ কর্ণপাত করছে না।

দিব্যর সিংহাসনারোহণের কয়েক দিন পরে পোড়াতলা বাসিনীরা নগর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। সংখ্যায় প্রায় পনের কুড়ি জন। দুটি গো-সকট বোঝাই গৃহস্থালীর জিনিষ। একজন বর্ষীয়সী সকটে বসেছিল। স্থূলাঙ্গী। হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। দলের প্রধান সেই। বাকি সকলে সকটের সঙ্গে হাঁটছিল।

মধ্যাহ্নের আগেই বর্ষিয়সী যাত্রা স্থগিত করল। পথের পাশে একটি দিঘীর ধারে চালককে গাড়ি থামাতে বলল সে। হেঁকে বলল, 'নে, সকলে মিলে তাড়াতাড়ি দুটি ফুটিয়ে ফেল।'

একজন বলল, 'পেটে আগুন ধরেছে বুঝি?'

বর্ষিয়সী বলল, 'পেটে নয়, কপালে আগুন ধরেছে। যা বলছি, তাই কর।'

চালকরা গাছতলায় কোদাল দিয়ে মাটি কেটে উনান তৈরি করে কাঠ আনতে গেল। কজন গো-সকট থেকে চাল, আলু, মাটির বড় হাঁড়ি নামাল। দিঘি থেকে জল নিয়ে এল। জানতে চাইল, 'কি, পাক হবে?'

—'সেদ্ধ ফেনাভাত করে নে। আলু দিয়ে দে। ঘি আর কাঁচা লঙ্কা আছে তো?

—'তা আছে।' বলল একজন। 'আজ তিনদিন হল ফেনাভাত আর আলু সেদ্ধ চলছে। মুখে অরুচি ধরে গেল যে মাসী।'

কটমটিয়ে তার দিকে চাইল বর্ষিয়সী। কষ্টে সকট থেকে নামতে নামতে বলল, 'তোর মা আমার শ্বাশুড়ি ছিল। কোন আক্কেলে আমাকে তুই মাসী বলিসরে আবাগীর বেটি। আগে প্রাণ নিয়ে রাজ্যের বাইরে চল, তারপর যত পারিস রাজভোগ খাওয়াব।'

—'দশ দশটা বছর যেমন খাওয়াচ্ছ?'

—'খাওয়াচ্ছি না তো কি নিখাগি হয়ে আছিস! গতর কি এমনি এমনি হচ্ছে?'

—'তোমার মত?'

—'আমার মত হতে চাস তো হ'না কেন। কে তোকে না হতে বলছে শুনি?'

—'হলে তোমার রাজ্যপাট চলে যাবে ভাই। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীর দোসর।'

শুনে দু-তিন জন হি-হি করে হেসে উঠল। একজন হাতে তালি বাজিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'কিগো বৌঠান কেমন দিল?'

বর্ষিয়সী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'মরণ।'

—'মরণ বৈকি গো নাত জামাইয়ের শ্বাশুড়ি। শোন বাপু, তোমার এই কর্তাপনা আমার কিন্তু ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি।'

—'আবার আবাগীর বেটা......'

—'সেই ভুল করছো ঠাকুমা। আমরা বেটাও নই বেটীও নই—হিজড়ে।'

বর্ষিয়সী তার দিকে একবার কটমটিয়ে চেয়ে রান্নার আয়োজন যেখানে হচ্ছে এগিয়ে গেল সেদিকে। পোড়াতলা বাসি বা বাসিনী এরা। গৃহস্থের আনন্দ উৎসবে নাচ গানের জন্য ডেকে নিয়ে যেত এদের। সন্তান সন্ততি জন্মালে খবর পেয়ে নিজেরাই গিয়ে হাজির হত। মেয়ে মহলে নাচ গান করে নবজাতক-জাতিকাকে কোলে নিয়ে রিষ্টনাশ করিয়ে আবদার জানতো নতুন কাপড়ের, অর্থের। সিধেতো ছিলই। গৃহস্থরা সাধ্যমত প্রার্থনা পূরণ করত। এছাড়া পথের ধারে নাচ গানের আসর বসাতো। চার পাঁচ জনের এক একটি দল বেরিয়ে পড়ত সকালে। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসত পোড়াতলার মহল্লায়। তারপর.....হ্যাঁ, আরো একটা জীবন ছিল। ঘৃণীত জীবন। পেটের জন্য করতে বাধ্য হত।

আগে এক রকম চলে যেত। কিন্তু মহারাজ মহীপালের রাজত্ব শুরু হওয়ার পর অসৎ রাজ কর্মচারি, দাণ্ডিকের দল ওদের বিব্রত করা শুরু করেছিল। জোর জবরদস্তি, অর্থ আদায় করত। নগর ছেড়ে গ্রামের দিকে যাওয়ার কথা অনেকবারই চিন্তা করেছে ওরা কিন্তু যায়নি। নগরে অনেক সুযোগ সুবিধা। নগরের মানুষের অর্থ আছে। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের সংখ্যা খুবই কম। দরিদ্রের বাসভূমি গ্রাম। অর্থের বড়ই অভাব গ্রামে।

নানান চিন্তা করে ওরা গ্রামে যায়নি। কখনো কখনো যায়। কয়েকদিন গিয়ে কোন গঞ্জে আশ্রয় নেয়। আবার নগরে ফিরে আসে।

বর্ষিয়সীর নাম রাধা। আছে ভানু, জবা, শীতলা। দলের প্রধান বা প্রধানা। রাধা তার দল নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেছে। চলে এসেছে নিঃশব্দে। সিংহাসনে বসেছে দিব্য।

রাজধানীতে চলছে গোলমাল। কদিন লুটপাট কম হয়নি। প্রতিরোধও গড়ে উঠেছিল। এখন নতুন রাজার সৈন্যরা দিনরাত্রি টহল দিচ্ছে। ভয় পাওয়া মানুষদের বোঝাচ্ছে। রাধা তার দল নিয়ে খুবই সাবধানে চলে এসেছে। আসতে হয়েছে তাকে।

রান্না শুরু হয়েছে। শীত শেষের রোদ বাঁচিয়ে গাছের তলায় তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে সকলে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে উনানে কাঠ দিয়ে ফুটন্ত হাঁড়িতে উঁকি দিয়ে দেখে আসছে। রাধা ঘুরে ঘুরে দেখছে চারিধার।

একটা গাছতলায় বসে আছে তিন জন। নীরবে বসে আছে তারা। রাধা এসে দাঁড়াল। দেখল তিন জনকে। একজনের দিকে চেয়ে বলল, 'কদিন খাওয়া দাওয়ার খুবই.....'

কথাটা শেষ হল না রাধার, তার আগেই কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিক হৈ-হৈ করতে করতে এসে পড়ল। মুহূর্তে পাংশু আকার ধারণ করল রাধার মুখ। পরক্ষণেই সে চাপা গলায় বলল, 'আমি আসছি।'

দ্রুত সৈনিকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাধা।

অশ্ব থেকে নেমে পড়ল সৈনিকরা। সংখ্যায় ছয়জন। বলল, 'এই তোমরা এখানে কি করছো?'

জ্বলন্ত উনানের দিকে দেখিয়ে রাধা বলল, 'চোকের মাথা খেয়েছো নাকি বাছারা?'

সৈনিকদের একজন বলল, 'হিজড়ের দল।'

রাধা বলল,'হ্যাঁগো বীর পুরুষ, কপাল দোষে হিজড়ে হয়েই জন্মেছি। নাহলে তো গেরস্থের ঘরে মা, মাসী, মাগ হয়ে থাকতাম।'

—'যাবে কোথায়?'

—'কোথায় যাব তা জানি না। বেরিয়েছি পেটের ধান্দায়।'

—'তুমিই দলের পাণ্ডা?'

—'পাণ্ডা কি না জানি না। আমিই সকলের দেখাশোনা করি।'

—'কতজন আছ তোমরা?'

—'ষোল জন।'

—'সকলেই হিজড়ে?'

রাধা সৈনিকের দিকে চোখ মটকে চাইল। বলল, 'হিজড়ের দলে সোমত্থ ছুঁড়ি কোন দুঃখে থাকতে যাবে শুনি।'

—'না-না, আমি সে কথা বলছি না।' সৈনিক বলল, 'আমরা দু'জনকে খুঁজতে বেরিয়েছি। তারা দুজন হিজড়ে সেজে তোমাদের দলে নেই তো?'

—'হিজড়ে সেজে থাকবে! মেয়ে মানুষ?' মরণ।

—'না পুরুষ।' সৈনিক বলল, 'দুজন পুরুষের কথা বলছি।'

—'পুরুষ মানুষ হিজড়ে সাজতে যাবে কোন দুঃখে শুনি? আর পুরুষ মানুষকে হিজড়ে সাজিয়ে আমরা সঙ্গে নেব কেন? তবু যদি সন্দেহ থাকে দেখে নাও তোমরা। এতো রাত নয়, দিন। তা হ্যাঁ বাপু, পুরুষ মানুষ দুটি কারা?'

গম্ভীর হল সৈনিক। বলল, 'তোমাদের সঙ্গে তারা নেই যখন, শুনে কি করবে?'

—'বললে জানতে পারতাম।' চোখ মটকাল রাধা। 'বলাতো যায় না কখন উপকারে লাগি।'

সৈনিক বলল, 'দুই রাজকুমার। শূরপাল আর রামপাল।'

—'কুমার দুজনের কি হয়েছে? তাঁরা তো.......'

—'বন্দীশালা থেকে পালিয়ে গেছে।'

—'পালিয়ে গেছেন? হায় কপাল! কি করে পালাল গো?'

—'সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

—'আশ্চর্য ব্যাপার তো! দু-দুটো পুরুষ মানুষ পালিয়ে গেল? কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!'

সৈনিক বলল, 'পালিয়ে যাবে কোথায়! ধরা পড়তেই হবে।'

রাধা বলল, 'দেখ বাপু, যদি সন্দেহ হয় আমাদের দেখতে পার। হিজড়ে বলে আমাদের অনেকেই ক্ষৌর কর্ম করে। এক মুখ দাড়ি নিয়ে শাড়ি পরে নাচলে তো কেউ পয়সা দেবে না। মেয়ে সেজে আছি কি সাধে—পেটের দায়ে।'

সৈনিকরা একটু চেয়ে চেয়ে দেখল। রাধার দলের তিন চার জনের দিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না। শ্মশ্রু-গুম্ফের চিহ্ন মাত্র নেই, মেয়েলী গঠন, দেখতেও সুন্দর—কে বলবে নপুংসক!

চলে গেল অশ্বারোহী সৈন্যরা। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল চারজন। সৈন্যরা চলে যেতে হেসে উঠল একজন, ত্রৈলোক্য। সেও হিজড়ের ছদ্মবেশে চলেছে রাধার দলের সঙ্গে।

পঞ্চমী চোখ পাকাল তাকে। 'বিপদ কাটেনি দাদা। সীমান্ত যত কাছে এগিয়ে আসছে, ততোই সতর্কতা দেখা দেবে। হাসার সময় পরে পাবে।'

রামপাল নীরব। চিন্তিত। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর আগেই কারামুক্তি ঘটেছিল তার। সেদিন মধ্যরাত্রে সে যখন গভীর নিদ্রামগ্ন। তার প্রকোষ্ঠে এসেছিল কারাধ্যক্ষ। ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলেছিলেন, 'বলিহারি কুমার, বন্দী অবস্থায় এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে আপনাকেই প্রথম দেখলাম।'

শয্যায় উঠে বসেছিল সে।

কারাধ্যক্ষ বলেছিলেন, 'যুদ্ধের সংবাদ কিছু জানেন?'

—'কিছু কিছু শুনেছি মাত্র।' উত্তর দিয়েছিল সে।

—'এখন কি করবেন, সে বিষয়ে কিছু স্থির করেছেন?'

কি উত্তর দেবে চিন্তা করে পারেনি। প্রদীপের আবছা আলোয় কারাধ্যক্ষের বিশাল শরীরটার দিকে চেয়েছিল।

—'নির্যাতন কিছু কম করিনি আপনার ওপর।' কারাধ্যক্ষ বলেছিলেন, 'নির্যাতন না করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আমি দাস মাত্র। প্রভুর নির্দেশ পালন করতেই হবে। না হলে অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ছিল। এখন পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। বলুন কি করতে চান?'

—'কি করবো?' রামপাল বুঝতে পারেনি কারাধ্যক্ষের কথা।

—'অনেক কিছুই করতে পারেন। মধ্যম কুমারের পথ অনুসরণ করতেও পারেন।'

চমকে উঠেছিল সে।

কারাধ্যক্ষের ওষ্ঠে হাসি ফুটে ছিল। পরক্ষণে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'কিছুই অজানা নয় কুমার। যদিও মধ্যম কুমারের পরিবর্তে একজন আছে সেখানে। অসম্ভব বলে কিছু নেই।' একটু নীরব থেকে বলেছিলেন, 'শুনুন, সময় খুবই কম। প্রস্তুত হয়ে নিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দীশালায় গোলমাল শুরু হবে। কারারক্ষীরা বন্দীদের পীড়ন করবে। দু'চারজন মারাও যাবে। তারমধ্যে আপনি একজন এবং মধ্যম কুমার।'

অবাক বিস্ময়ে কারাধ্যক্ষের মুখের দিকে চেয়ে জানতে চেয়েছিল সে, 'সেটা কি করে সম্ভব?'

—'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই বলেই। রন্ধনশালাটি নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত। কাল-বিলম্ব না করে রন্ধনশালার পশ্চাতভাগে আপনি চলে যান। বিদায় কুমার।'

চলে গিয়েছিলেন। কয়েক মূহুর্ত স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিল সে। ষষ্টেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছিল। কারাধ্যক্ষ্যের কথা মত রন্ধনশালার পশ্চাতে উপস্থিত হতে অন্ধকারে কে যেন স্পর্শ করেছিল তাকে।

—'কে?'

—'আমি। ভয় নেই।' কালাচাঁদের কন্ঠস্বর।

অন্ধকারের মধ্যেই কারা প্রাচীরের বাইরে চলে এসেছিল তারা। প্রাচীর উত্তীর্ণ হবার সব ব্যবস্থাই করা ছিল। আর বাইরে আসার কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই বন্দীশালার মধ্য থেকে গোলমাল শোনা গিয়েছিল। করতোয়ার তীরে প্রস্তুত ছিল নৌকা। সেখানে আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য, ত্রৈলোক্য!

রাত্রি প্রভাত হয়েছিল এক সময়। এক নির্জন স্থানে নৌকা বাঁধা হয়েছিল। কালাচাঁদ বলেছিল, 'কুমার, এবার আমি বিদায় নেব। ত্রৈলোক্য আপনার সঙ্গী হবে এখন থেকে। আশা করছি, বরেন্দ্র ত্যাগ করতে পারবেন আপনি।'

—'তুমি কোথায় যাবে?'

—'আমি কোথাও যাব না, আমাকে বরেন্দ্রতেই থাকতে হবে। কিছু ঋণ আছে আমার, সেটুকু পরিশোধ করতে হবে।'

—'কি ঋণ তোমার? কার কাছে?' জানতে চেয়েছিল সে।

উত্তর দেয়নি কালাচাঁদ। মৃদু একটু হেসেছিল শুধু।

কালাচাঁদের মুখের দিকে চেয়েছিল সে। সুন্দর সুঠাম একটি পুরুষমূর্তি, দেখলে কালাচাঁদকে কেউ-ই দস্যু বলে বিশ্বাস করবে না। দস্যু দিব্যর প্রধান সহকারী ছিল সে একসময়। দাণ্ডিকরা তাকে ধরে বন্দীশালায় পাঠায়। বিচার হয়েছিল। সারা জীবনের শাস্তি কারাবাস। অবশ্য কালাচাঁদ বলেছিল ভিন্ন কথা। দিব্যর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই অনেক কষ্টে বন্দীশালায় আশ্রয় নিয়েছিল সে।

ত্রৈলোক্যর সঙ্গে সেই নির্জন স্থানে নৌকা থেকে অবতরণ করেছিল। কালাচাঁদকে নিয়ে চলে গিয়েছিল নৌকাটি। দুটো দিন সেখানেই লুকিয়ে ছিল তারা। তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে দুজন গ্রাম্য যুবক তাদের কাছে এসেছিল, সঙ্গে এক বৃদ্ধ। ত্রৈলোক্য যেন জানত তারা আসবে। তাদের দেখতে পেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে। কিন্তু তাদের প্রস্তাব শুনে মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল তার। শুধু বেশ পরিবর্তন নয়, সেই সঙ্গে রূপ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। প্রথমে অস্বীকার করেছিল সে। অসম্ভব। নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'নারী সাজলে আপনাকে সুন্দর মানাবে কুমার। আমাকে কেমন মানায় তা আমি জানি।'

—'তুমি কি এর আগে নারী রূপ ধারণ করেছ?

—'কত বার। শেষবার তো দাণ্ডিকরা আমায় নারীর ছদ্মবেশেই ধরেছিল। সে এক অশ্লীল ব্যাপার। মনে পড়লে ঘেন্না করে। অথচ দাণ্ডিকদের ঘরেও স্ত্রী-কন্যা আছে। শুনবেন কি হয়েছিল?'

গম্ভীর হয়েছিল সে। ত্রৈলোক্য বলার উৎসাহ হারিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীরূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কয়েকটা দিন দুই যুবক তাদের দেখা শোনার দায়িত্বে ছিল। দু'বেলা আহারের ব্যবস্থা তারাই করেছিল। কদিন পরে জানিয়ে ছিল, 'কাল প্রভাতেই আপনাদের স্থান ত্যাগ করতে হবে।'

—'কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের?' জানতে চেয়েছিল সে।

—'আমরা নই।' এক যুবক বলেছিল, 'আজকের রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে।'

—'আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার কে অর্পন করেছে তোমাদের?'

দুজনেই নীরব ছিল।

—'কি হল, উত্তর দাও।'

—'ক্ষমা করবেন আমাদের।' বলেছিল একজন।

খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। বন্দীশালায় প্রথম কয়েকদিন নির্যাতন চলেছিল তার ওপর। তারপর থেকে নির্যাতনের নামে কিছুটা লোক দেখান অভিনয়। ত্রৈলোক্য এসেছিল পরিচারক রূপে। হয়ে উঠেছিল পরিচালক। তারপর চন্দ্রমাধব। একজন খুনী তস্কর। অন্যজন দস্যু দিব্যের প্রধান সহকারী। দিব্যের রোষ

থেকে রক্ষা পাবার জন্য বন্দীশালায় আশ্রয় নিয়েছিল দাণ্ডিকদের সাহায্যে। বলেছিল,, 'সব কিছুই সম্ভব হয়েছে অর্থের সাহায্যে। সকলেই বল আর অর্থের বশীভূত।' সেইসঙ্গে দিব্যর কিছু পরিচয়ও প্রকাশ করেছিল সে। বলেছিল, 'দিব্য দস্যু হলেও সমাজ বহির্ভূত নয়। সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি। যদিও তার সত্য পরিচয় আমার পক্ষেও জানা সম্ভব হয়নি। শুধু আমরা, তার আজ্ঞাবাহীর দল ছিলাম সমাজ বহির্ভূত। দিব্য বহুরূপী। তার প্রকৃত রূপ কোন্‌টা, কেউ-ই জানে না। সর্বস্তরে তার প্রচণ্ড প্রভাব।'

কালাচাঁদের প্রভাব যে কিছু কম নয় তারও প্রমাণ পেয়েছিল। বন্দীশালা থেকে মধ্যম ভ্রাতা শূরপাল চলে গেছেন। সমস্ত ব্যবস্থা কালাচাঁদই করেছিল। শূরপালের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল অন্য কেউ। কে? জানে না। তারও কারা জীবনের অবসান ঘটাবার প্রস্তাব দিয়েছিল কালাচাঁদ। সম্মত হয়নি সে। প্রশ্ন করেছিল, 'কেন আমাদের দু ভাইকে বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করতে চাইছ তুমি?'

শুনে অনেকক্ষণ নীরব ছিল সে। এক সময় বলেছিল, 'দেখুন কুমার, কেন যে আপনাদের মুক্ত করতে চাইছি, সঠিক কারণ বলা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু জানি, মহারাজ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের প্ররোচনায় আপনাদের দু-ভাইকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। মহারাজ মহীপালের শাসনে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। একটা পরিবর্তন চায়। সকলেই চায় দমন, পীড়ন, অত্যাচারের অবসান।'

গম্ভীরভাবে সে জানতে চেয়েছিল, 'তার সঙ্গে আমাদের কারা মুক্তির কি সম্বন্ধ?'

সুক্ষ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল কালাচাঁদের ওষ্ঠে। বলেছিল, 'হয়তো নেই, আবার আছেও।'

বুঝতে পারেনি। চিন্তা করেছে। কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। কালাচাঁদ ত্রৈলোক্যের মত তার আত্মপরিচয় কখনই প্রকাশ করেনি। সে শুধু বলেছিল দস্যু দিব্যের প্রধান সহকারী ছিল সে। তার বেশি কিছু নয়।

দুই যুবক ও বৃদ্ধ তাদের নতুন বেশ ধারণ করিয়েছিল। মহারাজ মহীপাল বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত-নিহত। বরেন্দ্রর সিংহাসন অধিকার করেছে দিব্য। বন্দীশালায় তাদের সন্ধান করেছিল। না পেয়ে ক্ষিপ্ত। চতুর্দিকে চর ঘুরছে। সৈন্যরা খুঁজে ফিরছে। মহারাজ মহীপালের সৈন্য আর চরেরা। না, মহারাজ মহীপালের নয়, বরেন্দ্রর রাজা এখন দিব্য। এক দস্যু অধিকার করেছে বরেন্দ্রর সিংহাসন। দুই যুবক সাবধান করে বিদায় নিয়েছিল।

পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই যে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না তার! পঞ্চমী!

—'তুমি!'

—'হ্যাঁ কুমার। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এসেছি।' মাথা নিচু করে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল পঞ্চমী।

—'তোমরা কারা?'

—'আমরা। গেলেই দেখতে পাবেন। সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

—'কোথায় নিয়ে যাবে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল সে।

—'আপনাকে সীমান্ত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের ওপর।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। নপুংসকদের একজন হয়ে পথ চলেছে। পঞ্চমী তার পূর্ব পরিচিত। সে যখন ছোট ছিল, পঞ্চমী রাজ অন্তঃপুরে যেত। তাকে সে বহুবার দেখেছে। কিন্তু কারা তাকে সীমান্ত পার করে দেওয়ার জন্য তাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে সে কথা বলেনি পঞ্চমী। শুধু বলেছিল, 'কুমার, আমাদের যারা এ দায়িত্ব দিয়েছে তারা আপনার শুভার্থী।'

—'তারা কারা?'

—'আমি জানিনা কুমার।'

—'সত্যই তুমি জান না?' ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছে, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কারণ জ্যেষ্ঠের রাজ্য পরিচালনায় অসন্তুষ্ট কিছু মানুষ প্রতিকারের তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য কি সঠিক আমি জানতাম না, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁরা প্রতিবাদ জানাতেন। নাগরিকদের বলতেন। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে সে সময় আমার অল্প বিস্তর পরিচয়ও হয়েছিল। আর আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুমিও তাদের পরিচিত।'

পঞ্চমী বলেছিল, 'এ আপনি কি বলছেন কুমার?'

—'সত্য কথাই বলছি। নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না?'

পঞ্চমী মাথা নত করে নীরব ছিল।

—'আমার কৌতুহল একটু বেশি। আমি তোমার বাসস্থানের সন্ধানও করেছিলাম সে সময়।'

—'কেন?' অবাক হয়েছিল পঞ্চমী।

—'বলতে পার কৌতুহলের বশবর্তী হয়েই।' হেসে ফেলেছিলে সে। 'বরেন্দ্রর রাজকুমার আমি। রাজপ্রাসাদে সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন যাপন করাই আমার উচিৎ ছিল, তা নয় মাতুল মহণের পরামর্শ মত আমি সাধারণ মানুষের একজন হয়ে মিশে গিয়েছিলাম। রাষ্ট্রকূট রাজ্যে মাতুলও তাই করে। আর প্রাথমিক দ্বিধা কেটে যাবার পর যথেষ্ট আনন্দ আর তৃপ্তি অনুভব করেছি। রাজ্যের মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ যেমন দেখেছি, প্রত্যক্ষ করেছি দারিদ্র্য। অনুভব করেছি বরেন্দ্রর সমস্ত মানুষ সুখী নয়। কষ্ট হয়েছে। অতি বৃদ্ধের কাছে শুনেছি বরেন্দ্রর স্বর্ণ যুগেও প্রজাদের মধ্যে অভাব-অনটন-দারিদ্র্য ছিল। অনাহার হয়তো ছিল না। মহীপালের রাজত্বে যেমন দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অনাহারও দেখা দিয়েছিল। আচ্ছা, যে বৃদ্ধার আশ্রয়ে তুমি ছিলে তিনি আছেন, না গত হয়েছেন?'

বিস্মিত পঞ্চমী বলেছিল, 'আছে। ভিন্ন ব্যবস্থা হয়েছে তার।'

—'আর তুমি তো দলবদ্ধভাবে থাকতে না?'

মাথা নিচু করে চিন্তা করেছিল পঞ্চমী। বলেছিল, 'আপনার জন্যই......'

বুঝতে পেরেছিল সে। তার জন্যই নপুংসকদের সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু তার এই বরেন্দ্র ত্যাগের আয়োজন কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে? অন্তরালে থেকে কে এই ব্যবস্থা করছেন? যদিও সে জানে বহু মন্ত্রী, উচ্চরাজকর্মচারীর প্রিয় সে। মহীপালের শাসন পরিবর্তনের চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। প্রজাপতি নন্দীর কাছে ইঙ্গিত পেয়েছিল সে।

সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। নপুংসকের দলের মধ্যে সেও একজন। নৃত্য গীত যাদের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন। রাধা দলের নেতা বা নেত্রী। নির্বিকার ভাবেই তাদের গ্রহণ করেছিল।

ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'বুঝলেন কুমার, এ হল অভিশাপ। মহাপাপ না করলে কেউ..... ছিঃ ছিঃ, ঘেন্নায় মরে যাই।'

বুঝতে পারে নি ত্রৈলোক্যের কথা। মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছে।

—'নিশ্চয়ই অভিশাপ। বিশ্বাস করুন। উর্বশীর অভিশাপে অর্জুনকে নপুংসকের জীবন যাপন করতে হয়েছিল। বৃহন্নলা হয়েছিল অর্জুন। আমাকে নিশ্চয়ই কোন পেত্নী অভিশাপ দিয়েছিল।' হেসে উঠেছিল ত্রৈলোক্য। 'জানি না শেষ পরিণতি কি!'

হাসতে গিয়েও গম্ভীরভাবে সে জানতে চেয়েছে, 'তুমি তাহলে কিন্নলা হয়েছ?'

ত্রৈলোক্য বলেছে, 'তাই তো, খুবই চিন্তার ব্যাপার কুমার। নারী নয়, পুরুষও নয় এরা, তবু সকলের একটা করে নাম আছে। পঞ্চমী, রাধা, টগর। একজনের নাম আবার খেঁদি। ওই যে সখী সখী দেখতে, চোখ মটকে হাসে। কি কষ্ট বলুন তো, কি অভিশপ্ত জীবন। সমাজে সংসারে ঠাঁই নেই। আপনি রাজা হলে এদের জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন।'

শুনে অবাক হয়েছে। সন্দেহের বশে জ্যেষ্ঠ কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন তিনি নিহত। বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেছে দিব্য। যে পক্ষকাল পূর্বেও ছিল এক রাজকর্মচারী। গোপনে দস্যু দল পরিচালনা করত। পথ চলতে চলতে শুনেছে দিব্যকে বরেন্দ্রর ত্রাতা রূপে প্রচার করা হচ্ছে। উপমা টানা হচ্ছে দূর অতীতের। পাল বংশের প্রথম পুরুষকে গোপাল। দুর্দশাগ্রস্ত বরেন্দ্রকে উদ্ধার করার জন্য জনগণ যাঁকে রাজপদে অভিসিক্ত করেছিলেন। সুশাসনে যিনি বাংলার শ্রী ফিরিয়ে ছিলেন। দূর করেছিলেন অনাচার। বৃদ্ধি করেছিলেন গৌরব।

পাল বংশের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ঝড় ঝঞ্ঝা কম বয়ে যায়নি। মুহু-র্মুহু বৈদেশিক আক্রমণে দুর্বল হয়েছে রাজশক্তি। এভাবে রাজ্য হারা না হলেও সীমা সঙ্কুচিত হয়েছে। পারিবারিক ষড়যন্ত্রে ক্ষত বিক্ষত পালবংশ। বরেন্দ্র থেকে মুছে গেল পাল বংশের নাম।

তাকে নীরব থাকতে দেখে ত্রৈলোক্য জিজ্ঞাসা করেছে, কি চিন্তা করছেন কুমার?'

সত্য কথাই বলেছে সে, 'ত্রৈলোক্য তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছো। তুমি, স্বপ্নই দেখছো।'

—'কেন কুমার, এতে স্বপ্ন দেখার তো কিছু নেই। যা সত্য তাই বললাম।'

—'যা বলেছ তার মধ্যে সত্যতা নেই ত্রৈলোক্য।'

ত্রৈলোক্য গম্ভীর হয়েছে। বলেছে, 'কে বললে কুমার সত্যতা নেই। সম্পূর্ণ মগধ পাল বংশের অধিকারে না থাকলেও মগধের শাসক তো পালবংশ। কুমার শূরপাল মগধের পথে যাত্রা করেছেন। তবে তিনি যাবার সময় বলে গেছেন, খুব বেশি দিন শাসন ভার বহন করার ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি সেখানে আপনার প্রতীক্ষায় থাকবেন।'

—'বল কি ত্রৈলোক্য!' শুনে বিস্মিত হয়েছে সে। 'তোমরা তাহলে.. ....'

—'হ্যাঁ কুমার। আপনাকে মগধ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তেছে আমার ওপর।'

—'তুমি, তোমার ওপর, আমি বুঝতে পারছি না। কে বা কারা তোমায় এ দায়িত্ব দিয়েছে? আর বন্দীশালায় খুনের অপরাধে তুমি তো শাস্তিভোগ করছিলে?'

—'তাই। সমস্ত জীবনই বন্দীশালায় কাটাতে হত আমায়। হল না। হয়। এমন অসম্ভব, প্রয়োজনে সম্ভব হয়। অবশ্য প্রথমে আমিও অবাক হয়েছিলাম। তবে কে বা কারা আপনাদের দু-ভাইয়ের জীবন রক্ষায় তৎপর সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কালাচাঁদ বললেও হয়তো বলতে পারত। তাকেতো আর পাওয়া যাবে না।'

—'সে কোথায় গেল কিছু জান তুমি?'

—'কিছুই জানি না। আপনি যতটুকু জানেন, আমিও ঠিক ততোটুকুই জানি। তবে আমাদের মত অপরাধীরা দুই কুমারের রক্ষণাবেক্ষণে। নিশ্চয়ই বিস্মিত হচ্ছেন?'

নীরব থেকেছে সে। পথ চলেছে। মাঝে মাঝেই অপরিচিত মানুষ তাদের কাছে কাছে ঘোরাফেরা করেছে। রাধা খুবই কড়া ধাতের। কখনো ভাল কথা বলেছে, কখনো দূর-দূর করেছে।

সৈন্যরাও এসেছে তাদের খোঁজে। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যেমন এইমাত্র কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিক এসেছিল। রামপালকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে তারা। বন্দীশালা থেকে রামপাল আর শূরপাল যে পালিয়েছে এ সংবাদ আর গোপন নেই। দিব্যর আদেশ, যেমন করেই হক দুভাইকে ধরতে হবে।

পঞ্চমীর সঙ্গে রাধা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। রাধা বলল, 'কুমার, কিছু মনে করবেন না। এবার আপনাদের খোঁজে যদি সৈন্যরা আসে দূরে থাকবেন না। সকলের মধ্যে মিশে যাবেন আপনারা।'

ত্রৈলোক্য প্রশ্ন করল, 'কেন দিদি?'

সম্বোধনে মুখ ব্যাজার করল রাধা। বলল, 'কেন বুঝতে পারছ না বাছা?'

ত্রৈলোক্য মাথা দোলাল। বলল, 'বুঝতে পারলে কি আর......'

—'থাক।' বাধা দিল রাধা। বলল, 'তোমার যে মোটা বুদ্ধি তা তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। একপাল হিজড়ের মধ্যে মিশে থাকলে তোমরা যে তা নও ধরে কে! 'অবিশ্যি তোমার ওই মোটা ভ্রূ আর থুতনির কাঁটা দাগ দেখলে মনে সন্দেহ

জাগবে। মেয়েলী ভাব তোমার মধ্যে একেবারেই নেই। আর গোবদা দুই পায়ের পাতা। যেন হাতীর পা।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই হেসে উঠল পঞ্চমী। বলল, 'মাসীর আমার কড়া নজর।'

—'তুই থাম বাছা।' ঝঙ্কার দিল রাধা। বলল, 'আর কটা দিন ঠাকুরের ইচ্ছায় কাটাতে পারলে স্বস্তি পাই।'

—'কোন্ ঠাকুরের ইচ্ছা দিদি? প্রশ্ন করল ত্রৈলোক্য।

কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল রাধা। ভারী শরীরটা টেনে টেনে চলে গেল।

পঞ্চমী বলল, 'তোমরা এসো। পাক হয়ে গেছে।'

তিন নয়, পাঁচটা দিন পার হয়ে গেছে নির্বিঘ্নে। রাধা তার দলবল নিয়ে ভিন্ন পথে এগিয়ে গেছে। কিছুদিন পরে আবার রাজধানীতে ফিরে যাবে ওরা। রাধা বলেছিল, 'অনেক বছর হল পোড়াতলায় আছি। মায়া কি কাটান যায়।'

বিদায় নিতে এসেছিল পঞ্চমী। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ত্রৈলোক্য, 'তুমিও কি আবার রাজধানীতে ফিরবে?'

পঞ্চমী কথা বলেনি, শুধু হেসেছিল একটু।

দুজন এগিয়ে চলল। নারী নয়, পুরুষ মূর্তি। মগধের দূরত্ব কিছু কম নয়।

একদল বৌদ্ধশ্রমণ পথ চলছে। পরণে কষায় বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক। তরুন এবং বয়জ্যেষ্ঠ মিলিয়ে দলটি। ধীর গতি তাঁদের। কোন ব্যস্ততা নেই। বিক্রমশীল বিহারে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন তাঁরা। এগিয়ে চলেছেন মুদগগিরির (মুঙ্গের) পথে।

শীত শেষ হয়ে এসেছে। শ্রমণের দল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পথ চলেন। দ্বিপ্রহরে সামান্য ক্ষণের জন্য পথের পাশেই আহার-বিশ্রাম। আবার বিশ্রামের সময় যদি স্থানটি ভাল লেগে যায় সেখানেই সেদিনের মত যাত্রা বিরতি। অবশ্যই পরিচালকের অনুমতি ক্রমে। কখনো লোকালয়ে, কখনো বা পথের পাশের গাছতলায় রাত্রি বাস করেন।

সেদিনও দ্বিপ্রহরে যাত্রা বিরতি ঘটেছে। লোকালয় থেকে সামান্য দূরে একটি আম্রকুঞ্জে আহার বিশ্রামের আয়োজন হয়েছিল। মনোরম পরিবেশ। সকলেরই ভাল লেগেছিল। সে দিনটি সেখানেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

অপরাহ্নে তরুন শ্রমণরা আম্রকুঞ্জের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একজন কিছু দূরে রিক্ত শষ্যক্ষেত্রের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যুবক নন তিনি, আবার প্রৌঢ়ও।

এক সময় এক বালক এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি তার দিকে চাইলেন।

বালক মৃদু কণ্ঠে বলল, 'প্রভু, একজন আপনার দর্শন চান।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি বালকের দিকে চাইলেন।

দূরের এক বটবৃক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বালক বলল, 'তিনি ওখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

চিন্তা করলেন শ্রমণ, তারপর ধীর পদক্ষেপে বটবৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

উষ্ণীবে মুখ ঢেকে একজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদ কণ্ঠে ডাকল, 'কুমার।'

—'কে!' ভীষণভাবে চমকে উঠলেন তিনি।

লোকটি ধীরে মুখ থেকে তার উষ্ণীব সরিয়ে নিল।

চমকে উঠলেন শ্রমণ। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'লোহিত, আপনি!'

চোদ্দ

সভা ভঙ্গ হতে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা একে একে বিদায় নিলেন। মন্ত্রণা গৃহের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে বিদায় জানাল দিব্য। মহারাজ দিব্য। বরেন্দ্র অধিপতি। দাঁড়িয়ে রইল সে। দেখতে লাগল সকলের চলে যাওয়া। চিন্তা করল। আগে এমন নিশ্চয়ই ঘটতো না। বরেন্দ্র অধিপতি তাঁর অধীনস্থদের বিদায় জানাচ্ছেন এদৃশ্য কল্পনাতেই শোভা পায়। না, তাও নয়।

অন্যমনস্ক হল সে। মনটা তার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। একটা কথাই তার মনে হল, রাজা সাজতে সে চায়নি। রাজা সাজতে হয়েছে তাকে। ভাগ্য। ভাগ্যই তার হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়েছে। তাই কি? চমকে উঠল সে। মনে হল, কেউ যেন প্রশ্নটা করল পাশ থেকে। দেখল। কেউ নেই। ক্লান্ত অপরাহ্নে চারিদিক নিস্তব্ধ। মন্ত্রণা গৃহের দ্বারের কাছে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে রাজবেশ। দস্যু নয়, এখন সে মহারাজ দিব্য। পুরানো পরিচয় মুছে গেছে।

যায় কি? আবার চমকে উঠল সে। যায় না। আবার.....চেষ্টা করবে সে। সেই জন্যই মন্ত্রণা গৃহে আলোচনা সভা আহ্বান করেছিল। রাজ্যের অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের আহ্বান জানিয়েছিল। মন্ত্রীদের পরামর্শ ও কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চায়। অথচ আজকের এই বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা সৃষ্টিতে এক সময় ইন্ধন যুগিয়েছে সে নিজে। অসাধু মন্ত্রী এবং রাজকর্মচারীদের অর্থবলে বশীভূত করে মহারাজ মহীপালকে বিভ্রান্ত করেছে। রাজকর্মচারীর ছদ্মবেশে দস্যু দিব্য বরেন্দ্রর দিকে দিকে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এখন সে শান্তি প্রয়াসী। তার স্বপ্ন দেখা সার্থক হয়েছে। দস্যু হয়েছে রাজা। সবই সম্ভব। শুধু.....

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার কপালে। চন্দ্রমাধব। বালক চন্দ্রমাধবকে সে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল। অপুত্রক সে। সন্তান স্নেহে...... না, ঠিক স্নেহে নয়, প্রয়োজনে চন্দ্রমাধবকে লালন পালন করেছিল। ভাই রুদোক আছে। বিবাহিত রুদোককে সেনাপতি করেছে। নিশ্চয়ই তার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। দিব্যর বংশধর। বালক চন্দ্রমাধবকে

লালন পালন করেছিল তার দস্যুবৃত্তি পরিচালনার জন্য। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসম সাহসী চন্দ্রমাধব। সমস্ত দায়িত্বভার তাব ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল সে। নিশ্চিন্ত হওয়াই হয়েছিল তার কাল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নিজে হয়ে উঠেছিল........তা হয় না। কিন্তু তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। বিশ্বাসঘাতক রাজশক্তির আশ্রয় নিয়েছিল। নিরাপদ হয়েছিল বন্দীশালায়।

হতাশায় মাথা নাড়ল দিব্য। তার ব্যর্থতা। শুধু চন্দ্রমাধব নিজে নয়, দুই রাজকুমারও বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে। গুপ্তচরের দল যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতে জানা গেছে, কুমার শূরপাল গেছেন পাটুলিপুত্রের দিকে। কুমার রামপালের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। চন্দ্রমাধবকে করতোয়া নদীতে নৌকায় দেখা গিয়েছিল। ধরারও চেষ্টা হয়েছিল। ধরা যায়নি। নিশ্চয়ই সকলকেই ধরা যাবে।

অপরাহ্ন সমাগত প্রায়। মন্ত্রণা গৃহ থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের দিকে চলতে লাগল দিব্য। অঙ্গরক্ষক তাঁর সঙ্গে থাকে না। নিষেধ করেছে। পুরাতন প্রাসাদ, অন্তঃপুর, কিছুই অধিকার করেনি সে। সব কিছুই আগের মত আছে। শুধুমাত্র রাজ্য এবং রাজসিংহাসন তার। যদি সে প্রাসাদ এবং রাজ অন্তঃপুর নিজের অধিকারে নিয়ে আসত, নিশ্চয়ই প্রজাদের মনে তার সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। তা সে চায় না। প্রজাদের বিশ্বাস এবং সমর্থন চায় সে। পাল বংশকে আশ্বস্ত করেছে। চারিদিকে প্রচার করছে সে কথা। অত্যাচারী মহীপালের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্যই সে বরেন্দ্রর সিংহাসন অধিকার করেছে। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই তার ক্ষমতা দখল।

চিররুগ্না পত্নী। পত্নীর প্রতি বিশ্বস্ত সে। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেনি। এক সময় সিন্ধুবালাও অনেক অনুরোধ করেছিল। পারেনি। আসলে নারী নয়, ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছে সে। সমাজে নিম্নশ্রেণী ভুক্ত দিব্য চেয়েছে উত্থান। পুরুষানুক্রমে চাষ আবাদ করত তারা। অভাব, অনটন ছিল নিত্য সঙ্গী। অশিক্ষা, নিরক্ষরতা ছিল দিব্যদের শ্রেণীর অঙ্গ-ভূষণ। ব্যতিক্রম সে। অপ্রত্যাশিতভাবে শিক্ষার আলো এসে পড়েছিল বালক দিব্যর জীবনে। শিক্ষাগুরু তাকে বলেছিলেন, এগিয়ে যা, থামবি না। বিগ্রহ পালের রাজত্বে কর্মলাভ করেছিল। বরেন্দ্রর প্রতিটি প্রান্তে কর্মসূত্রে ঘুরেছে। ঘুরতে ঘুরতে যোগাযোগ হয়েছে বহুজনের সঙ্গে। সৃষ্টি করেছে......

—'মহারাজ।'

দাসী মেথরের মায়ের কণ্ঠস্বর। সিন্ধুবালার একমাত্র দাসী মেথরের মা। রোগা লম্বা শরীর। পোড়া কাঠের মত গায়ের রং। গোলাকার জবা ফুলের মত রাঙ্গা বড় বড় দুটি চোখ। সিন্ধুবালার প্রিয় দাসী। প্রৌঢ়া। বালক মেথর পিতৃ বিয়োগের পর একরাত্রে গৃহ ত্যাগ করে কোথায় চলে গেছে। তাকে আর পাওয়া যায়নি। হয়তো মরেই গেছে সে। প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গার পর পুত্রশোকাতুরা জননী পুত্রের উদ্দেশ্যে একপ্রস্থ কান্না কাটি করে কর্ম শুরু করে। রাজবাটিতে এসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সিন্ধুবালাকে খুবই যত্ন করে সে।

—'মহারাজ।' আবার ডাকল মেথরের মা।

দিব্য তার দিকে চাইল। বলল, 'বল শুনছি।'

—'যদি সময় পান একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।'

আগে মেথরের মা তুমি বলত। কর্তা সম্বোধন করত। এখন মহারাজ এবং আপনি বলে। বলল, 'তোমার মাকে গিয়ে বল আমি আসছি।'

চলে গেল মেথরের মা। দূর থেকে ভাই রুদোককে আসতে দেখা গেল। পরনে রাজবেশ, কোমরে ঝোলান দীর্ঘ তরবারি। বলিষ্ঠ তরুন। নিয়মিত অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ব করছে। নিষ্ঠা আছে। বিনয়ী। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, কিছু বলবে?'

হাসল দিব্য। বলল, 'না, আমি তোমাকে দেখছিলাম।'

লজ্জিত হল রুদোক। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দিব্য বলল, 'তুমি যাও, তোমার বৌঠানের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

—'শুনছিলাম বৌঠানের শরীর বিশেষ সুবিধের যাচ্ছে না?'

—'হ্যাঁ, ধন্বন্তরি এসেছিলেন। দেখে গেছেন।'

—'বৌঠানের ব্যামো কি সারার নয়?'

—'কি জানি।' অন্যমনস্ক হল দিব্য। দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত সন্তান প্রসব করার পরই শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয় সিন্ধুবালার। ভাগ্যগুণে সুন্দরী ও সুরসিকা পত্নী লাভ ঘটেছিল তার। একটু অধিক বয়সেই বিবাহ করেছিল। বাসরে অন্যের কান বাঁচিয়ে সিন্ধুবালা চুপি চুপি বলেছিল, 'সই-সখীরা সব দু ছেলের মা হয়ে গেছে। কপালে বর জোটেনি আমার। ভেবেছিলুম কোন ঘাটের মড়া বা দোজ বরের সঙ্গেই আমার বে হবে। এতদিন কি আমার জন্যই বে না করে বসেছিলে?'

নির্লজ্জ বলে মনে হয়েছিল। না, নির্লজ্জ নয়, সিন্ধুবালা রসিকা। ধর্মপ্রাণা। শান্ত। মুখের হাসি কখনো ম্লান হতে দেখেনি।

তাকে দেখে সিন্ধুবালা আহ্বান জানাল, 'আসুন মহারাজ। দাসী আপনারই প্রতীক্ষায় কালযাপন করছে। মেথরের মা, তুই একটু এখান থেকে যা বাপু। একটু কথা বলব।'

মেথরের মা বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল।

দিব্য বলল, 'ওকে ভাগালে কেন? অন্য দিন ওতো থাকে।'

—'থাকে, তবে থাকা ঠিক নয়। ওর তো সে হুঁশ থাকে না। ও মনে করে এই বুঝি চোখ উল্টে গেল আমার। থাকে সেবা করার জন্যই।'

—'তোমার শরীরটা.....'

—'শরীরের কথা ছাড়। রোগ হলে রোগ যন্ত্রণা থাকবে। ও নিয়ে তোমাকে অযথা চিন্তা করতে হবে না। রোগ নিয়ে বেশ আছি আমি। মেথরের মা যখন রয়েছে, আমার চিন্তা কি। চিন্তা তোমার জন্য।'

—'আমার জন্য?'

—'হবে না?' ঠোঁট ফোলাল সিন্ধুবালা। 'রাজা হওয়ার ঝক্কি কি কম? খাওয়া ঘুমানো মাথায় ওঠে। আমি তো কিছুই দেখতে পারি না। সেই জন্যই বলছিলাম......'

—'একটা বিয়ে করি।'

—'মন্দ কিঁ। করাতো উচিৎ। তোমার মনে হয় না একজন রানি থাকলে ভাল হত। হয় না?'

—'মনের কথা বলছো?'

একটু চুপ করে রইল সিন্ধুবালা। বলল, 'দেখ, মিথ্যে বলব না। মেয়েরা সব দিতে পারে, স্বামীর ভাগ ছাড়া। সে রোগে বিছানায় পড়ে থাকলেও। তবে আমিতো কিছুই দিতে পারলুম না তোমাকে। কষ্ট হলেও সত্যিকে মেনে নিতে হবে বইকি। কি, তাই নয়?

একটু চিন্তা করে দিব্য বলল, 'আমারও মনে হয়।'

—'তবে আমি ছাড়তে চেয়েছিলুম, এখনও চাই।' সিন্ধুবালার কণ্ঠটা ম্লান। বলল, 'বিশ্বাস কর।'

—'করি। তবে এই বয়সে?'

—'বয়স এমন কিছু বেশি হয়নি তোমার। যদিও দেখলে বয়সের তুলনায় অনেকটা বেশি দেখায় তোমাকে। ঠাকুরের কত বয়স হয়েছিল। মাথার চুল ছিল কালো। বিয়ের আগেই তোমার চুল পেকেছে। আর এখনতো তুমি রাজা। তোমার পর সিংহাসনের গতি কি হবে?

দিব্য চুপ করে রইল।

হাসল সিন্ধুবালা। বলল, 'সাধারণ মানুষ দু-তিনটে বিয়ে করে। ভাত কাপড় দিতে পারুক আর না পারুক। পাল রাজাদেরতো বেশ কয়েকজন করে রানি ছিল। সেই রাজাদের সিংহাসনেই তো তুমি বসেছো?'

দিব্য পত্নীর মুখের দিকে সামান্যক্ষণ চেয়ে রইল। বলল, 'আমি কি সেজন্য সিংহাসন দখল করেছি বলতে চাও?'

পাংশু মুখে হাসি ফোটাল সিন্ধুবালা। বলল, 'রাজধর্ম তো তোমায় পালন করতে হবে। করাই উচিত।'

—'রাজধর্ম!' পত্নীর মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে আকাল দিব্য। দেখতে লাগল।

—'নয়তো কি। রাজা হয়েছ, রাজাদের ধর্ম পালন করবে না?' হাসল সিন্ধুবালা। 'তুমিও কর।'

গম্ভীর হল দিব্য। পত্নীকে দেখল। প্রশ্ন করল, 'তুমি কি খুশি হওনি সিন্ধু?'

—'খুশি?' চিন্তা করল সিন্ধুবালা। তাকে বিমর্ষ দেখাল। বলল, 'আমারতো খুশি হওয়াই উচিৎ, তাই না?'

কথা বলল না দিব্য।

সামান্য অপেক্ষা করল সিন্ধুবালা। স্বামীকে দেখল। রাজকার্য করত স্বামী। এখন রাজা। না, খুশি হতে পারেনি সে। প্রায় বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর অনেক কিছুই মেনে নিতে পারেনি। বিবাহের পর প্রায়ই স্বামী রাত্রে গৃহে থাকত না। তা নিয়ে কিছু কিছু অশান্তি যে হয়নি তা নয়। মতান্তর ঘটেছে। বিবাহের চতুর্থ বৎসরে মৃত সন্তান প্রসব করেছিল সে। আর তারপর থেকেই একটু একটু করে শরীর ভেঙ্গেছে, বাসা বেঁধেছে রোগ। এখন ভাল করে হাঁটতে পারে না। বেশিক্ষণ কথা বললে বুকের মধ্যে কাঁপে। প্রচণ্ড মাথা ঘোরে। খেতে পারে না। চোখে ঘুম নেই। শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখেনি স্বামী। রোগমুক্তি ঘটেনি।

—'সিন্ধু।' পত্নীকে স্পর্শ করল দিব্য।

স্বামীর আহ্বানে চোখ তুলে চাইল সিন্ধুবালা।

দিব্য বলল, 'আময় ভুল বুঝনা। ভাগ্য বলেই আমি বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসতে পেরেছি। জানি ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়ার মত বয়স আমার আছে। আমি তা চাই না। আমি চাই দেশের অরাজকতা দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।' চুপ করল। সত্যই তাই চায় সে। সেইজন্যই অভিজ্ঞ মন্ত্রী এবং রাজকর্মচারীদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করছে। মহারাজ ধর্মপালের কথা সে শুনেছে। বৌদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গের পরামর্শানুযায়ী চলতেন। ধর্মপালের পর পুত্র দেবপাল বসে ছিলেন সিংহাসনে। গর্গের পুত্র গর্ভপাণি ছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। গর্গের প্রপৌত্র কেদার মিশ্র পিতার মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। রাজ্য পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা তার নেই। এক সময় যারা তাকে সাহায্য করেছে, উৎকোচে বশীভূত হয়ে মহারাজ মহীপালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আজ তারা তার রাজ্যলাভের পর সুযোগ সন্ধানীর ভূমিকা গ্রহণে উদ্‌গ্রীব। তারা তাকে তাদের হাতের খেলার পুতুলে পরিণত করে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায়। তাদের অভিসন্ধি অজ্ঞাত নয়। তাই তাদের কৌশলে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যদি প্রয়োজন হয়, নির্মম হতেও তার বাধবে না।

চিন্তা করল সে। দুরূহ কর্তব্য তার সামনে। দস্যু দিব্যের দুর্নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। যাবে কি? চমকে উঠল সে। এ চিন্তা নিরন্তর তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সিন্ধুবালা বলল, কি ভাবছো?'

নীরবে পত্নীর মুখের দিকে চাইল দিব্য।

সিন্ধুবালা একটু অপেক্ষা করল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'একটা খবর দেবার ছিল তোমায়। জানি তুমি ব্যস্ত। তবু মেথরের মাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে ছিলাম।'

—'কি খবর?' স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে তাকাল।

—'একজন এসেছিল আজ।' খুব আস্তে, সন্তর্পণে, কথাটা উচ্চারণ করল সিন্ধুবালা।

—'কে এসেছিল? কার কথা বলছো তুমি?'

একটু চুপ করে থেকে সিন্ধুবালা বলল, 'কে আসতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

—'আমার?' চিন্তা করল দিব্য। বলল, 'না আমার কারো কথাই মনে হয় না। কে আসবে। কে এসেছিল?'

—'চন্দ্রমাধব।'

—'চন্দ্রমাধব!' ভীষণভাবে চমকে উঠল সে।

—'হ্যাঁ। দেখা করে গেল আমার সঙ্গে।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন আকার ধারণ করল দিব্যর মুখমণ্ডল। বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'বল, কখন সে এসেছিল, গেল কোথায়?'

অবাক হল সিন্ধুবালা। চন্দ্রমাধবকে কৈশোরবেলা থেকে দেখছে সে। মাসী বলে ডাকত। কখনো কখনো দু'চারদিন এসে থাকত শ্বশুরবাড়িতে। কিছুদিন আগে, বছর পার হয়ে গেল প্রায়, শেষবার এসেছিল চন্দ্রমাধব। তারপর আজ দেখল। তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। উত্তর এড়িয়ে গেছে। হেসেছে। অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে। বলেছিল, 'তোমায় খুবই অসুস্থ দেখে গিয়েছিলাম মাসী। অনেক দূরে গিয়েছিলাম। দেখতে এলাম একবার।'

—'সিন্ধু।'

ডাক শুনে স্বামীর দিকে চাইল সিন্ধুবালা।

দিব্য বলল, 'সে যখন এসেছিল আমাকে একটা খবর পাঠান উচিৎ ছিল তোমার।'

—'খবর পাঠান উচিৎ ছিল?' কথাটা বুঝতে পারল না। বলল, 'কেন, খবর দেবার কি আছে? তুমি তো আমাকে সে কথা আগে বলনি। তাছাড়া তার কথা জিজ্ঞাসা করলে তুমিইতো বলতে সে চলে গেছে, —কি বলতে না?'

দিব্য কথা বলল না। পত্নীকে একটু দেখল। তারপর দ্রুত চলে গেল। চন্দ্রমাধব রাজধানীতে এসেছে। তার এমনই দুঃসাহস সে প্রাসাদে পর্যন্ত হানা দিয়েছে। দস্যু দিব্যর প্রধান এবং একমাত্র বিশ্বাসভাজন সহকারী ছিল সে। এখন শত্রু। মতান্তর দেখা দিয়েছিল নির্বিচারে লুণ্ঠন নিয়ে। ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়েছিল সে। ধনীর সর্বস্ব হরণে তার অমত ছিল না কিন্তু গরীবের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে তার বেধেছিল। কিন্তু দিব্যর প্রয়োজন ছিল অর্থের। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে রূপ দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেখানে ধনী দরিদ্রের বিচার করলে চলবে কেন? তাই.....না, চন্দ্রমাধবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। সে আশ্রয় নিয়েছিল বন্দীশালার নিরাপদ আশ্রয়ে। এখন ফিরে এসেছে। এবার সে নিশ্চয়ই.....না, পারবে না। রাজ শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু স্থির নিশ্চিত হতে পারল না দিব্য। চন্দ্রমাধব.....

পনেরো

রাজমহলের পথে তেলিয়াগড়ি গিরিপথ পার হয়ে গঙ্গার তীরে তীরে পাটুলিপুত্র পৌছাবার সহজ পথ, বা নৌকা যোগেও পাটুলিপুত্র পৌঁছান সহজতর। কিন্তু ও পথ পরিহার করেছিল দুজনেই। কর্ণসুবর্ণ থেকে রাঢ়ায় প্রবেশ করেছিল তারা। কঙ্কগ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছিল নপুংসকের দলটি।

বিদায় নেবার সময় রাধা বলেছিল, 'বাছারা সাবধানে থেক। চোখ কান খোলা রেখে পথ চলবে। কেমন।'

দুজনের কেউই একটি কথাও রলতে পারেনি। অনেকদিন এক সঙ্গে পথ চলেছে। মন ভারাক্রান্ত।

পঞ্চমীও বিদায় জানিয়েছিল।

তারপর থেকে দুজনে পথ চলছে। এক গ্রাম্য তরুন আর তার সঙ্গী। অজয় নদের তীর ধরে এগিয়ে ছিল তারা। সাঁওতাল পরগণা পার হয়ে পীঠী স্পর্শ করে গয়ায় যাবে। সেখান থেকে রাজগৃহ, নালন্দা হয়ে উদন্তপুর। গঙ্গাকে দুরে রেখে শোন নদীর পথে পাটুলিপুত্র পৌছবার পরিকল্পনা করেছিল। কারণ দিব্যর গুপ্তচরদের এড়িয়ে পথ চলতে হবে। বরেন্দ্রর নতুন রাজার আদেশ, যেমন করেই হোক দুই কুমারকে ধরতে হবে। জীবিত অথবা মৃত। গুপ্তচরদের যাতায়াত আছে রাজমহলের পথে। তারা ভিন্ন পথ ধরেছিল। পাটুলিপুত্রে পৌঁছাতে দীর্ঘদিন লাগবে। লাগুক। ধরা পড়ার ভয় থাকবে কম।

ত্রৈলোক্য তার সঙ্গের অর্থ, বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিস দু'ভাগ করেছিল। দেখেছিল রামপাল। অবাক হয়েছিল। তার বয়ে নিয়ে আসা পুটুলীতে যে এত জিনিস আছে, বুঝতে পারেনি। বিশেষ করে অর্থ। অর্থের পরিমাণ কিছু কম নয়। প্রশ্ন করেছিল, ত্রৈলোক্য, এসব তুমি পেলে কোথায়? কে দিয়েছে?'

ত্রৈলোক্য একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দিয়েছে।'

—'কে দিয়েছে ত্রৈলোক্য?'

ত্রৈলোক্য চুপ করে রইল।

—'কি হল, বলবে না?

হাসল ত্রৈলোক্য। বলল, 'একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবেন?'

—'বিশ্বাস না করার কি থাকতে পারে। তুমি বল।'

—'আছে। আপনার গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন ভুতুড়ে কাণ্ডের মত। রাজা বন্দী করল। বন্দীশালা থেকে মুক্ত করল কোন অদৃশ্য শক্তি। অবশ্য মধ্যে নির্যাতন কিছু সহ্য করতে হয়েছে আপনাকে। আমি বা কালাচাঁদ অদৃশ্য শক্তির নির্দেশেই চলতে বাধ্য হয়েছি। আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনাকে পাটুলিপুত্র পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার। মাঝে কোথা থেকে হিজড়ের দল এসে সীমান্ত পার করে দিয়ে গেল। ভুতুড়ে কাণ্ড নয়, কি বলেন আপনি?'

—'আমি কিছুই বলব না। শুধু জানতে চাইছি, নির্দেশ কে দিচ্ছে?'

—'সেটা জানলেতো বলব আপনাকে।' হাসল ত্রৈলোক্য।' আর এই অর্থ দিয়েছে রাধা। যাবার সময় বলে গেছে ভাগ করে নিই যেন।'

—'কেন?'

—'তাও জানি না।'

অর্থ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস ভাগ করে নিজেদের কাছে রেখেছিল। পথ চলেছিল একসঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে চলা হল না। পান্থশালা নয়, পথে এক গৃহস্থের কাছে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। গৃহস্বামী কিছুক্ষণ তাদের দেখেছিলেন। একের পর এক প্রশ্ন করেছিলেন। শেষে বলেছিলেন, 'আমি দুঃখীত, তোমাদের আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তোমরা অনত্র আশ্রয়ের চেষ্টা করে দেখ।'

ত্রৈলোক্য জানতে চেয়েছিল, 'এখানে কোথায় গেলে আশ্রয় পেতে পারি বলতে পারেন?'

—'সেটা বলা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে, তোমরা অন্য কোন গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করে দেখতে পার। তবে আমার মনে হয়, এ গ্রামে কেউ-ই তোমাদের আশ্রয় দিতে সম্মত হবে না।'

দু'জনেই গৃহস্বামীর দিকে চেয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন, 'পক্ষকাল পূর্বে তোমাদের মতই দুজন সন্ধ্যার পূর্বে এ গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এক গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। দুজনেই বৃদ্ধ। গৃহস্বামী শুধু আশ্রয় নয়, রাতের আহারও দিয়েছিল তাদের। ফলস্বরূপ মধ্যরাত্রে সেই গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছিল।'

—'সে কি!'

—'হ্যাঁ, আশ্রয় প্রার্থী দুজন ছিল লুণ্ঠনকারী। গৃহের সকলে নিদ্রামগ্ন হলে তারা গৃহদ্বার মুক্ত করে লুণ্ঠনকারী দলের গৃহ প্রবেশের ব্যবস্থা করেছিল। তোমরা দুজনে যে অসৎ উদ্দেশ্যে আসনি তাতো আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই তোমাদের আশ্রয় দিতে আমি অপারগ। তোমরা এবার আসতে পার।'

শুনে দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিল।

গৃহস্বামী বলেছিলেন, 'তোমরা হাসছ কেন?'

ত্রৈলোক্য বিনীতভাবে বলেছিল, 'মার্জনা করবেন। আপনাকে অসম্মান করার জন্য আমরা হাসিনি।'

—'তাহলে কি কারণে হাসলে?'

—'হাসলাম।' ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'আজকের রাত্রিও বৃক্ষবাসে অতিবাহিত করতে হবে সে কথা চিন্তা করেই আমরা দুজনে হেসেছি। কি তাই না কুমার?'

রামপাল সমর্থন করেছিল তাকে।

—'কুমার। কোথাকার কুমার তোমার বন্ধু?' জানতে চেয়েছিলেন গৃহস্বামী।

—'বন্ধু আমার নামে কুমার। কোন রাজ্যের নয়।'

—তোমার বন্ধু কিন্তু সুপুরুষ।'

—'সেই জন্যই তো নামকরণ সার্থক হয়েছে। আমি দয়াল, আমার যদি কুমার নাম হত, মানতো আমাকে?'

প্রৌঢ় গৃহস্বামী ত্রৈলোক্যকে দেখে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'মনে হয়, না। আর বৃক্ষ বাসটি কি?'

—আজ্ঞে পথ চলতে বেশ কবার রাত্রিবাসের জন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে বৃক্ষবাস করতে হয়েছে। আজও তাই করতে হবে। আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা করবেন। সন্ধ্যা আসন্ন। আমরা চললাম।'

চিন্তিতভাবে গৃহস্বামী বলেছিলেন, 'চলে যাবে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, বিড়ম্বনার কারণ হতে চাই না। চল কুমার।'

—'দাঁড়াও।' গৃহস্বামী বলেছিলেন, বুঝতে পারছি তোমরা দস্যু-তস্কর নও। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়াই গৃহস্থের ধর্ম। কিন্তু আমি একরকম নিরুপায়। কন্যারা শ্বশুরালয়ে। দুই পুত্রই স্থানান্তরে গেছে। আমরা দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গৃহে আছি। দু একজন দাসদাসী অবশ্য আছে। তবে একটি সর্তে আমি তোমাদের আশ্রয় দিতে পারি।'

—'সর্ত?' বৃদ্ধের মুখের দিকে দুজনেই চেয়েছিল।

—'হ্যাঁ।' রাত্রে কি তোমাদের বাইরে ওঠার অভ্যাস আছে?' জানতে চেয়েছেন বৃদ্ধ।

—'আজ্ঞে না। নিদ্রামগ্ন হলে প্রভাতের সূর্যোদয়ের পর আমাদের দুজনেরই নিদ্রাভঙ্গ হয়।'

উজ্জ্বল হয়েছিল গৃহস্বামীর মুখমণ্ডল। বলেছিলেন, 'তাহলে তোমাদের আশ্রয় দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

—'আর সর্ত?'

—'সেটি অবশ্য তোমাদের পালন করতে হবে। সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমাদের অস্ত্র আছে?'

—'তা অবশ্য....

—'থাকাটাই স্বাভাবিক। অস্ত্র আমার কাছে থাকবে। আর রাত্রে তোমাদের আমি গৃহবন্দী করে রেখে দেব।'

রামপাল বলেছিল, 'গৃহ বন্দী করে রাখবেন?'

—'অবশ্যই আমার নিরাপত্তার কারণে। চিন্তা করে দেখ, আমার প্রস্তাবে তোমরা সম্মত আছ কি-না?'

সন্ধ্যা আসন্ন। ধূসর ছায়া গ্রাস করছে প্রকৃতিকে। অপরিচিত স্থানে আশ্রয় সন্ধানের অবকাশ নেই। গৃহস্বামীর প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে উপায় কি। সজ্জন ব্যক্তি। রাতের

আহার দিয়েছিলেন। ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলাম। আশ্রয় দিয়েছেন। আবার আহার কেন?'

গৃহস্বামী হেসে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার অতিথি। সেবা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য।'

—'এবং গৃহবন্দী করে রাখাও।'

ত্রৈলোক্যের কথায় হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'চল, রাত্রি হচ্ছে আহার করে নাও।'

গৃহটি দ্বিতল ও বেশ বড়। মৃত্তিকা নির্মিত। বেশ সম্পন্ন গৃহস্বামী। গৃহের গঠন শৈলি ভিন্ন ধরনের। গ্রামে প্রবেশ করার পর এ ধরনের অনেকগুলো গৃহই তাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। অবশ্য সাধারণ আকৃতির সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ গ্রামটিতে সম্পন্ন গৃহস্থের সংখ্যা কম নয়। ডাকাতি-লুণ্ঠন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গৃহের আলাদা কোন প্রাচীর নেই। চারিদিক ঘিরে গৃহ। মধ্যে বিশাল চত্বর। সদর দ্বার পার হয়ে গলিপথ, আবার দ্বার—গলিপথ। তিনটি এমন দ্বার অতিক্রম করে উন্মুক্ত চত্বরে পৌঁছান যায়। প্রতিটি কক্ষদ্বারই খুব ছোট আকারের। একটি ছয় সাত বছরের বালকের পক্ষে অনায়াসে কক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব। উচ্চতা বেশি হলে মাথা নিচু করে কক্ষে প্রবেশ করতে হয়। গৃহস্বামী তাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে মাথা নিচু করে প্রবেশ করে বলেছিলেন, 'তোমরা হয়তো অভ্যস্ত নও, মাথা নিচু করে ভেতরে এসো তোমরা।'

কক্ষটি আয়তনে মাঝারি। শয়নের চৌকি আছে। রামপাল জানতে চেয়েছিল, 'আপনার গৃহে এ ব্যবস্থা কেন?'

—'কি ব্যবস্থা?'

—'দ্বারগুলি দেখছি উচ্চতায় খুবই ছোট।'

—'হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনেই ছোট করতে হয়েছে।'

—'আপনাদের অসুবিধা হয় না?'

—'আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তোমরা কিছুদিন এখানে যদি বাস কর, অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।'

—'তেমন ইচ্ছা আমাদের দুজনের বিন্দুমাত্র নেই। কি ত্রৈলোক্য, তোমার আছে নাকি?'

—'রক্ষে কর।' গম্ভীর হয়েছিল সে। নিদ্রামগ্ন হওয়ার আগে আজ প্রার্থনা করবো সূর্যোদয়ের পূর্বেই যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়।'

গম্ভীর হয়েছিলেন গৃহস্বামী। বলেছিলেন, 'এদিকে এমন গৃহ অনেক দেখতে পাবে। দুটি করে দেওয়াল আছে। প্রতিটি কক্ষেরই দরজা ছোট।'

—'দস্যুদের ভয়ে কি? জানতে চেয়েছে রামপাল।

—সঠিক অনুমান। প্রায়ই ডাকাতের দল আসে। ঘরের মধ্যে ঢোকার সময় মাথা নিচু করে ঢুকতে হবে।'

—'সেই সময় আঘাত করা যায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর ডাকাতি হয় সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতেই।'

গৃহস্বামী চুপ করে রইলেন। রাতের আহারের পর দুজনে শুয়ে পড়েছিল। গৃহস্বামী অবশ্য তাদের সঙ্গের আত্মরক্ষার অস্ত্র নিয়ে নেননি বা কক্ষদ্বার রুদ্ধ করেননি। ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'আমাদের সঙ্গের অস্ত্রগুলো নিয়ে রাখুন।'

—'এখন আর প্রয়োজনবোধ করছি না।' বলেছিলেন তিনি। 'তোমাদের কক্ষদ্বারও মুক্ত থাকবে।'

—'সেকি! যদি আমরা....

বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বুঝেছি সে সম্ভাবনা নেই।'

—'বিশ্বাস করছেন?'

—'দেখিনা। তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত। শুয়ে পড়।' চলে গিয়েছিলেন তিনি।

সত্য সত্যই পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল দুজনে। ত্রৈলোক্য শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নাসিকাধ্বনি শোনা গিয়েছিল তার। রামপাল ঘুমাতে পারেনি। পারেও না সে। প্রতিরাত্রেই তার জননীর কথা মনে পড়ে। দস্যু দিব্য বরেন্দ্রর রাজা হয়েছে। অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে সে? জননী কি জীবিতা আছেন? দিব্য কি অন্তঃপুরিকাদের সম্ভ্রম রক্ষা করেছে? জানে না। কিছু জানার উপায়ও নেই।

মনে পড়ে অনেক কথাই। অজস্র স্মৃতি ভেসে ওঠে। রাতের নিদ্রা হরণ করে অতিত। কখনো কখনো মনে পড়ে কাঞ্চনের কথা। কাঞ্চনমালা। সদ্য কিশোরী কন্যা। তরুণ হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অকপটে জননীকে জানিয়েছিল কাঞ্চনের কথা। তিনি একটু একটু করে সব কথাই জেনেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, 'পুত্র, কাঞ্চনের সব কথাই শুনলাম। তুমি কি শুধুমাত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছো? শোন, আমার কাছে কোন রকম সঙ্কোচ করবে না।'

—'না মা। তোমার সৌন্দর্যের কাছে সে তুচ্ছ। তার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিষণ্ণতাও আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। হাসিটি সুন্দর কিন্তু তার মধ্যেও যেন বেদনার প্রকাশ।'

—'তার পিতৃ পরিচয় সে সত্যই জানে না?' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন করেছিলেন জননী।

—'না। বলতে পারেনি সে। তার মা নাকি তাকে বলেছে, পিতৃ পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে।'

—'আশ্চর্য!'

—'হ্যাঁ মা।' বড় দুঃখী কাঞ্চন।'

—'দুঃখী কন্যাতো আরো আছে রাম।'

—'জানি মা। দেখেছিও। তবু কাঞ্চনের মত দুঃখী আমি আর দেখিনি।'

জননী নীরবে চিন্তা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'রাম, আজ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে কোন কথাই গোপন করনি। এরজন্য আমি গর্ববোধ করি। তুমি বড় হয়েছো। বুদ্ধিমান তুমি। আশা করবো এমন কাজ তুমি করবে না, যাতে তোমার পিতার নাম কলঙ্কিত হয়।'

জননীর মনের কথা বুঝেছিল সে। কাঞ্চনের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিল। অনেক সময় কাঞ্চনের সঙ্গে রঙ্গও করেছে। বলেছে, 'আচ্ছা কাঞ্চন, মনে কর.....'

বাধা দিয়ে মুচকি হেসে কাঞ্চন বলেছে, 'মনে করলাম।

—না-না, ঠাট্টা নয়।'

—'নয়?'

—'না, মনে কর বরেন্দ্রর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে হঠাৎ-ই তোমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে.....'

বাধা দিয়ে কাঞ্চন বলেছে, 'শ্রেষ্ঠী পুত্র কেন, রাজপুত্রের সঙ্গেও তো সাক্ষাৎ ঘটতে পারে, কি পারে না?'

—'হ্যাঁ, 'তাও সম্ভব।'

—'এবার বল, কি বলতে চাও?'

—'তখন আমার কি হবে?'

—'তোমার আবার কি হবে? কিছুই হবে না তোমার। তুমি থাকবে।' হেসেছে কাঞ্চন। বলেছে, 'মিথ্যা চিন্তা তোমার।'

—'যদি তোমার মা আমাকে আসতে নিষেধ করেন?'

—'নিষেধ করবেন?' চিন্তা করেছিল কাঞ্চন। 'তা অবশ্য হতে পারে। তবে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

—'চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে কাঞ্চন। আমি তো আর আসবো না।'

—'আসবে না? তাহলে আমিই যাব তোমার কাছে।'

—'আমাকে কোথায় পাবে তুমি?'

কয়েক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু শান্ত কণ্ঠে কাঞ্চন বলেছিল, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমি ঠিক তোমাকে খুঁজে বার করবো। বিশ্বাস কর, কথা দিলাম।'

কাঞ্চন তাকে কথা দিয়েছে। মনে মনে হেসে ফেলল রামপাল। কোথায় কাঞ্চন, আর কোথায় সে! মহারাজ মহীপালের বন্দীশালাতেই জীবনটা শেষ হয়ে যেত, ভাগ্য বলে মুক্তি পেয়েছে, এখন প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। লক্ষ্য মগধ, কিন্তু সেখানে পৌঁছানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে, না দিব্যর পাঠানো ঘাতকদের হাতে নিহত হতে হবে, কে বলতে পারে। মনে পড়ে। প্রতিদিন নিদ্রাহীন রাত্রি তাকে কুরে কুরে খায়। জননীর ম্লান-বিষন্ন

মুখখানি বেদনায় অন্তর·পূর্ণ করে তোলে। কাঞ্চনের প্রতি অনুরাগ অস্বীকার করে না। কষ্ট হয়।

ত্রৈলোক্য অঘোরে ঘুমাচ্ছে। গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে রাত্রি। তন্দ্রা ঘনাচ্ছে চোখে। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ টুটে গিয়েছিল তন্দ্রা। গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর, 'দ্বার খোল।'

দ্বার মুক্ত করেছিল ত্রৈলোক্য।

গৃহস্বামী বলেছিলেন, 'শোন, তোমাদের এখন-ই চলে যেতে হবে।'

—'কোথায়?' জানতে চেয়েছিল ত্রৈলোক্য।

তার দিকে চেয়ে গৃহস্বামী বলেছিলেন, 'কুমার, আপনি মহারাজ বিগ্রহপালের পুত্র কিনা জানি না, তবে তাঁর সঙ্গে আপনার চেহারার সাদৃশ আছে। দীর্ঘদিন পূর্বে আমি একবার রাজধানী গিয়েছিলাম। সে সময় তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আশ্রয় প্রার্থী আপনাকে দেখে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। ছদ্মবেশ ধারণ করেও আপনি.....'

ত্রৈলোক্য জানতে চেয়েছিল, 'এখন আপনি একথা বলছেন কেন?'

—'বলছি এই কারণে, এইমাত্র কয়েকজন পলাতক কুমার রামপালের সন্ধানে এসেছিল।'

—'তারা কারা?'

—'জানি না।' গৃহস্বামী বলেছিলেন, 'আপনাদের আশ্রয় দেওয়ার সংবাদ আমি অস্বীকার করেছি। তারা চলে গেছে। তবে আমার মনে হয় তারা আবার আসবে।'

ত্রৈলোক্যের মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল। রামপাল বলেছিল, 'আপনার অনুমান সঠিক, আমিই কুমার রামপাল।'

গৃহস্বামী কয়েক মুহূর্ত তারদিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, 'আপনারা প্রস্তুত হয়ে নিন।'

—'ধরিয়ে দেবেন?' জানতে চেয়েছিল ত্রৈলোক্য।

—'অতিথিকে রক্ষা করাই গৃহস্থের ধর্ম। আমি আমার এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে আপনাদের সঙ্গে দিচ্ছি। সে আপনাদের গ্রাম পার করে দিয়ে আসবে। যারা আপনাদের সন্ধানে এসেছিল তাদের সংখ্যা কম নয় বলেই আমার মনে হয়েছে। কয়েক দিনের মত আহার্য্য বস্তু আমি সঙ্গে দিচ্ছি। সাধ্যমত আপনারা লোকালয় এড়িয়ে চলবেন।

ভৃত্যের সঙ্গে গোপন পথে গৃহস্বামী তাদের গৃহ থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

রামপাল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'যারা আমাদের সন্ধানে এসেছিল তারা যদি আবার আসে?'

ক্ষণিক চিন্তা করে তিনি বলেছিলেন, 'যেখান থেকে তারা সংবাদ সংগ্রহ করেছে, সংবাদের সত্যতা যাচাই করে তারা আসবেই।'

—'তখন?'

—'তখন?' আশ্রয় প্রার্থী দুজন আমার কাছে এসেছিল একথা আমি অস্বীকার করিনি। শুধু বলেছি, আমি তাদের আশ্রয় দিইনি। এবার বলবো যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় গৃহ তল্লাসী করো।'

অন্ধকারের মধ্যেই তাদের গ্রামের সীমানা পার করে দিয়েছিল গৃহস্বামীর ভৃত্যটি।

ত্রৈলোক্য জানতে চেয়েছিল, 'তুমি কি এখন গৃহে ফিরে যাবে?'

—আজ্ঞে না। আমি এখানে রাত্রি কাটিয়ে সকালে নদীতে মাছ ধরে ফিরবো।'

গৃহস্বামীর নির্দেশ। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গিয়েছিল তার। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলছিল। প্রাণের ভয়ে। দুদিকে শষ্যক্ষেত। পশ্চিমে জঙ্গল। রাত্রে জঙ্গলের দিকে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন গৃহস্বামী। বন্যবরাহের প্রচণ্ড উৎপাত এদিকে। এছাড়া বিষধর সাপও আছে।

ত্রৈলোক্য জানতে চেয়েছিল, 'আর বাঘ?'

—'তাও দেখা যায়।' গৃহস্বামী বলেছিলেন, 'বনে সব কিছুই আছে। শুধু হিংস্র জন্তু জানোয়ার নয়, দস্যুদেরও আস্তানা। সাবধানে পথ চলো।'

সাবধানেই পথ চলেছে দুজনে। নীরবে। শেষ হয়েছে রাত্রি। পূর্বাকাশে ফুটেছে উষার আলো। দাঁড়িয়ে পড়েছে ত্রৈলোক্য। প্রশ্ন করেছে, 'কুমার, এবার কি হবে?

—'কি হবে?' ওর মুখের দিকে চেয়েছে রামপাল।

—'এবার আমরা কি করবো?' জানতে চেয়েছে ত্রৈলোক্য।

বুঝতে পেরেছে রামপাল। 'বলেছে, 'পথতো চলতে হবে।'

—'হবে, তবে বিচ্ছিন্নভাবে।'

—'বিচ্ছিন্নভাবে?'

—'হ্যাঁ কুমার। আমি চিন্তা করেছি। আর একসঙ্গে পথ চলা আমাদের যুক্তিযুক্ত হবে না। যদি আমরা একসঙ্গে পথ চলি দিব্যর প্রেরিত ঘাতকরা খুব সহজেই আমাদের সন্ধান পেয়ে যাবে।'

—'তা অবশ্য ঠিক।'

—'শুনুন, এখন আমরা এখানেই অবস্থান করবো। লক্ষ্য রাখবো দিব্যর ঘাতকরা এ পথে আমাদের অনুসন্ধানে আসে কি-না।'

ত্রৈলোক্যের কথা মেনে নিয়েছিল রামপাল্। তাছাড়া শরীরও ক্লান্ত। সারা রাত্রি অনিদ্রায়, উত্তেজনায় কেটেছে। বেশ কিছুদিন বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। সে দিনটা তারা দুজনে নির্জন প্রান্তরে কাটিয়েছিল। একটি মানুষেরও দেখা মেলেনি। রাত্রে প্রথমে ঘুমিয়ে ছিল ত্রৈলোক্য। সতর্কভাবে পাহারা দিয়েছে রামপাল্। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে শয্যা গ্রহণ করেছিল সে। গাছের পাতা দিয়ে ত্রৈলোক্যই শয্যা প্রস্তুত করেছিল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম ভাঙ্গিয়ে ছিল ত্রৈলোক্য। তখনও আবছায়া অন্ধকার জড়িয়ে আছে গাছের পাতায়। ধূসর আকাশ। বলেছিল, 'কুমার উঠে পড়ুন, এবার আমাদের যাত্রা করতে হবে।'

প্রাতঃ কৃত্য শেষ করে শুরু হয়েছিল পথ চলা। সামনে দীর্ঘপথ। এ পথের সন্ধান ত্রৈলোক্যের কিছুটা জানা আছে। সামনে সাঁওতাল পরগণা। রাজগৃহ, নালন্দা, উদণ্ডপুর, পার হলে শ্রীনগর ভুক্তি। পাটুলিপুত্রে পৌঁছাতে দীর্ঘদিন লাগবে। লাগুক। নিরাপত্তার কারণেই তারা এপথে এসেছিল, কিন্তু দিব্য তার ঘাতকদের পাঠিয়েছে।

পথ চলতে চলতে রামপাল জিজ্ঞাসা করেছিল, ত্রৈলোক্য, আমরা কখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হব?'

—'যে কোন সময়।' পথ চলতে চলতেই উত্তর দিয়েছিল ত্রৈলোক্য।

—'অর্থাৎ?'

—'লোকালয়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন আমাদের দেখা দেবে, ঠিক তখন থেকেই আমরা আর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবো না।'

—'বুঝলাম না।'

—'আউ গ্রামের আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী আমাদের যে আহার্য দ্রব্য দিয়েছেন আরো দুদিন আমরা লেকালয় এড়িয়ে পথ চলতে পারবো। তারপরই আমাদের লোকালয়ে আশ্রয় নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে। তখন আর একসঙ্গে চলা সম্ভব হবে না।'

দ্বিতীয় রাত্রি নির্বিঘ্নে কেটেছিল। কিন্তু তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষেই বিঘ্ন উপস্থিত হল। গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে। ত্রৈলোক্য প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়েছিল। সামন্য পরেই ফিরে এসে বলল, 'কুমার, সর্বনাশ হয়েছে।'

—'কি হল?'

—'মনে হচ্ছে ঘাতকের দল পৌঁছে গেছে।'

—'কোথায়?'

—ঝর্ণার ধারে। শুনুন কুমার, আপনি এখনই বনভূমির দিকে চলে যান।'

—'আর তুমি?'

—'আমি যে পথে এসেছি সেদিকেই যাব।'

—'সে কি!'

—'এছাড়া কোন উপায় নেই। আমার মনে হচ্ছে আমাকে ওরা দেখেছে। আপনি আর বিলম্ব করবেন না।'

একরকম বাধ্য হয়েই গাছ পালার আড়ালে বনভূমির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল রামপাল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পিছন ফিরে দেখেছিল একদল অস্ত্রধারী ত্রৈলোক্যকে ঘিরে ধরেছে। তারপর কি হল সে জানে না। বনভূমির মধ্য দিয়েই পথ চলেছে। কোথাও সংকীর্ণ পথ আছে, কোথাও নেই। পথ করে এগিয়েছে। দুটো দিন তার কিভাবে কেটেছে

জানে না। ভাগ্যবলে কোন হিংস্র জন্তুর সামনে তাকে পড়তে হয়নি। রাত্রে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিয়েছে। নিদ্রাহীন কেটেছে রাত্রি। বন্য বরাহের ছোটাছুটি দেখেছে সে সময়।

তৃতীয় দিন বাত্রি প্রভাতে দেখা মিলেছে একটি ছোট্ট গ্রামের। খুবই ছোট গ্রাম। কয়েকটি বাড়ির সমষ্টি। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে শষ্যক্ষেত। বনভূমি গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রামটি ছুঁয়ে। একটি ছোট মন্দির। জীর্ণ। বিশাল এক বটগাছ যেন গ্রাস করে আছে মন্দিরটিকে। অনেক চিন্তার পর পায়ে পায়ে মন্দিরটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। শিব মন্দিব। দূর থেকে যত ছোট মনে হয়েছিল, মন্দিরটি ততো ছোট নয়, তবে বেশ জীর্ণ।

বাইরে থেকে মন্দিরের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। কেউ নেই। শূন্য মন্দির।

কি করবে? গ্রামে যাবে? চিন্তা করেছিল। কিন্তু গ্রামে প্রবেশের সাহস হয়নি। ত্রৈলোক্যের কি হয়েছে জানে না। যদি দিব্যর লোকেরা তাকে পীড়ন করে, যদি সে সত্য প্রকাশ করে দেয়, তাহলে সমূহ বিপদ। ঘাতকের দল নিশ্চয়ই তার সন্ধানে আসবে। গ্রামটিকে এড়িয়ে যেতে পারতো সে, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। গতকাল থেকে এক বকম অভুক্ত অবস্থায় আছে। শরীর চলৎশক্তি হীন। বিশ্রাম নয়, প্রথমে তার প্রয়োজন আহারের।

—'কে?'

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল। পিছনে এক কিশোরী। হাতে পূজার সামগ্রী।

—'কে আপনি?' আবার প্রশ্ন করল কিশোরী।

—'আমি, আমি, আশ্রয়প্রার্থী।' কোন রকমে বলল সে।

—'আশ্রয় প্রার্থী?'

—'হ্যাঁ। আর আশ্রয় না পেলেও ক্ষতি নেই, আমি ক্ষুধার্ত।'

কিশোরী সামান্যক্ষণ নিরীক্ষণ করল তাকে। চোখে চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করল, 'আপনার সঙ্গী কোথায়?'

—'সঙ্গী!'

—'আপনারা দুজন ছিলেন?'

বিস্মিত হল সে। অস্বীকার করতে পারল না। বলল, 'ছিলাম। কিন্তু.....'

—'মনে হয় আপনাদের সন্ধানে তিন দিন আগে একদল সশস্ত্র মানুষ এ গ্রামে এসেছিল। আপনি কি তাদেরই একজন?

বুঝতে পারল সে। নীরব রইল।

—'আপনার সঙ্গী কোথায়?'

তাকে দেখল সে। খুবই সাধারণ এক গ্রাম্য কিশোরী। সুশ্রী। বলল, 'একটা অনুরোধ করবো?'

—'বলুন।'

—'হ্যাঁ, আমাদের সন্ধানেই সশস্ত্র মানুষের দল এ গ্রামে এসেছিল। রামপাল বলল, গোপন করে কোন লাভ হবে না বুঝেই বলছি। আবার তারা আসতে পারে।'

—'আসতে পারে?' চিন্তা ঘনাল কিশোরীর চোখে।

—হ্যাঁ, আমি পালাতে সমর্থ হলেও আমার সঙ্গী পারেনি।'

—'তিনি ধরা পড়ে গেছেন?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু আমার ধরা পড়লে চলবে না।' মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, 'আমি ধরা দেবা না।'

—'কি করবেন?'

—'আমি চলে যাচ্ছি। শুধু একটা অনুরোধ, তারা যেন.....

—'চলে যাবেন কেন? বললেন অভুক্ত।' কিশোরী বলল, 'অভুক্ত মানুষকে চলে যেতে দেওয়া উচিৎ নয়।'

—'উপায় নেই।' ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তার ওষ্ঠে। 'চললাম।'

—'দাঁড়ান।' সামনে দাঁড়াল কিশোরী। বলল, 'যাবেন না আপনি। আসুন আমার সঙ্গে।'

—'কোথায়?'

—'মন্দিরে আসুন। আপনার সন্ধানকারীদের মন্দিরে প্রবেশের সাহস হবে না। এখানে থাকুন। আমি আপনার খাবার নিয়ে আসছি।'

মন্দিরে প্রবেশের মুহূর্তে দাঁড়াল কিশোরী। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল।

—'আমি বৌদ্ধ। হিন্দুর মন্দির......

—'অপবিত্র হবে?' স্পষ্ট চোখে তার দিকে চাইল কিশোরী। বলল, দেবতার মন্দির কখনো অপবিত্র হয় না মানুষের প্রবেশে।'

চমকে উঠল সে। কিশোরীর দিকে তাকাল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে কিশোরী বলল, 'আপনি বিপন্ন। আসুন।'

ষোল

অন্তঃপুরের পিছন দিকে রোহিণীর মহলের রান্নাশালার পাশে, গ্রীষ্মের ক্লান্ত দুপুরে রোহিণীর খাসদাসী পূর্ণ অনেকদিন পরে একজন মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে জমে থাকা সব কথা হুড়-হুড় করে বলে যাচ্ছিল। রোহিণীর খাসদাসী পূর্ণর বয়স কম হল না। বয়সে রোহিণীর চেয়ে ছোট হলেও খুব বেশি ছোট নয় সে। রোহিণীকে স্বামী পরিত্যক্তা বলা চলে। তাঁর মেজাজের জন্য সেনাপতি স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। পূর্ণবালা বিধবা। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই ঠাকুমা তার সইয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তার

যখন একটু একটু বোধবুদ্ধি হচ্ছে। আকারে ইঙ্গিতে চোখের চাহনীতে বরের সঙ্গে ভালবাসা জন্মাচ্ছে, খুনসুটি শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় ওলাউঠায় দুম করে তার কচি বরটা মারা গেল। বর মরার পর বাপের ঘরে চলে এসেছিল। কান্নাকাটি খুব যে একটা করেছিল তা নয়, তবে মধ্যে মধ্যে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যেত। খেতে ইচ্ছে করতো না। রাতে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙ্গে যেত। বরের মুখখানা মনে পড়তো তার। ভারি মিষ্টি ছিল মুখখানা। কালো রং। ভাসা ভাসা দুটো চোখ। টিকাল নাকটি। বাপের বাড়ির অনেকেই বলতো, যেন কেষ্ট ঠাকুরটি। মাথার চুলও ছিল কালো আর কোঁকড়া। কখনো কখনো আড়ালে আবডালে বরের চুলের গোছা মুঠি করে ধরেছে। অবশ্য খুব রেগে গেলে। বর সুবল বড়ই পিছে লাগতো তার। দু একবার তো জড়িয়ে নিয়ে গালে....ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্না, জল দিয়ে রগড়ে ধুয়েছে মুখ। আবার এক আধবার চড় চাপাটিও দিয়েছে। ডাংগুলি পুকুর জলে ফেলে দিয়েছিল। বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে মিশত। দিন রাত্রি ডাংগুলি খেলত। দুপুর গড়িয়ে ফিরে দুটি মুখে দিয়েই খেলতে ছুটতো। সময়ের হুঁশ থাকতো না। মরা হাজা ছেলে বলে কেউ কিছু বলতোও না। বাড়ির দুই জেঠাই ছিল বাঁজা। বংশে বাতি দিতে সে-ই। মায়ের পাঁচটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জন্মেছিল। বখাটে হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সকলের কাছে খেলার নেশা ছাড়া খুব ভাল ছেলে। বন্ধুদের কাছে শিখে এসে জুত পেলেই তাকে অসভ্য কথা বলতো। বলতো, বউ তোকে আমি ভালবাসি।'

সবই শেখান বুলি। বিধবা হয়ে ফেরার পর চিন্তা করে মনে হয়েছিল তার। কিছুদিন পরে আবার বিয়ের কথা হয়েছিল। গোঁ ধরেছিল পূর্ণ। বিয়ে করবে না। মরে গেলেও নয়। রাজাদের পাঁচ পুরুষের বাজনদার তাদের বংশ। ভোরের আকাশে নহবতখানা থেকে যখন সানাইয়ের সুর উঠত, কেষ্ট দাসের কথা মনে পড়িয়ে দিত পুরানো দিনের মানুষকে। কেষ্ট দাসের বংশধররা পাঁচ পুরুষ পাল রাজাদের নহবত খানায় বাজাচ্ছে। সুরের টান রাত্রি তিন প্রহরে ঠিক বাপ কাকাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বিছানা ছাড়াত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোন ঋতুতেই ব্যতিক্রম হয়নি। একটা দিনের জন্যও ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে তুলতে হয়নি বাপ কাকাদের।

তা বিয়ে করতে রাজি হয়নি পূর্ণ। পূর্ণবালা। পাত্রের অভাব হয়নি। ভাল পাত্র। স্বচ্ছল। পূর্ণর এক কথা, না। মা, কাকী, মামী বোঝাবার লোকের অভাব হয়নি। পূর্ণর এক কথা, না—না।

—'তাহলে কি করবি শুনি? জানতে চেয়েছে মা।

—'কি আবার।' ঝঙ্কার দিয়েছে সে। 'যেমন আছি, তেমনি থাকবো।'

—'সব মেয়েইতো ঘর সংসার চায়রে মেয়ে।' বুঝিয়েছে কাকী।

—'যে চায়-সে চায়, আমি চাই না।' বলেছে পূর্ণ। 'চাইলেই সব পাওয়া যায় না।'

—'সোমত্ত বয়েসটা বড় খারাপ রে। কে আগলাবে তোকে?'

—'নিজেই নিজেকে আগলাব আমি।' সপাটে জবাব দিয়েছে পূর্ণ।

—'পাগলামী ছাড়। বিয়ে তোকে করতেই হবে। বিয়ে না করে কি পাড়া ঢলাবি। ঘর ভাঙ্গবি পাঁচ জনের?'

—'ঘর ভাঙ্গতে যাব কোন দুঃখে শুনি? রুখে উঠেছে পূর্ণ।

—'দুঃখে নয়রে, সুখে। পুরুষ মানুষের মন না মতিভ্রম। ধুমসী হয়ে ঘরে পড়ে থাকবি, পুরুষগুলো মাগ ছেলে ছেড়ে তোর পেছনে ঘুর ঘুর করবে। তার চেয়ে বে কর।'

না, রাজি হয়নি পূর্ণ। কেউই তাকে রাজি করাতে পারেনি। মা কত কান্নাকাটি করেছে। বাপ ভাই বুঝিয়েছে। ভাই বউরা কত চেষ্টা করেছে বিয়ে না করার কারণ জানতে। এক কাকা আর কাকী তাকে বুঝেছিল। তারাই আগলে ছিল তাকে। এক ছেলে ছিল পূর্ণর পিঠোপিঠি। পূর্ণ যখন শ্বশুর বাড়ি, জলে ডুবে মরেছিল। তাই তার পর থেকে কাকী কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা কাচ্চাও আর হয়নি। বিধবা হয়ে ঘরে ফেরার পর কাকী তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল। শুধু একদিনই জানতে চেয়েছিল, 'পূণ্য সত্যি তোর বে করার ইচ্ছা নেই?'

—'না কাকী।' বলেছিল পূর্ণ। 'বিশ্বাস কর। এতটুকু ইচ্ছে নেই আমার বে-করার। বিশ্বাস করো।'

—'যদি কোন দিন ইচ্ছে হয়?' কাকী তাকে দেখেছিল একটু। বলেছিল, হ্যাঁরে পূণ্য?'

কি বলবে ভেবে পায়নি সে। ফ্যাল ফ্যাল করে কাকীর মুখের দিকে চেয়েছিল।

কাকী তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'শোন, এখন তোর বয়েস কম। সংসারের ভাল মন্দ বোঝার মত জ্ঞান বুদ্ধি তোর হয়নি। বড় হবি, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখবি। তখন যদি তোর মনে হয় বিয়ে করলেই ভাল হয়, আমাকে বলবি। কোন লজ্জা করবি না। কিরে বলবি তো?'

শুনে হতভম্বের মত অনেকক্ষণ বসেছিল সে। ঘাড় নেড়েছিল।

যুবতী বয়সে কিছু উৎপাত তাকে সহ্য করতে হয়েছে। শুধু নিজের গাঁয়ের নয়, ভিন গাঁয়েরও দু-চারজন মানুষের কারণে অকারণে তাদের বাড়ি আসা যাওয়া শুরু হয়েছিল। রাজবাড়ির নহবতে বাজনদার বাপ-ভাই-কাকারা। রাজারাই জমি দিয়েছেন। চাষ বাস করে। বাজানো শুধু সকাল সন্ধ্যে। বিয়ের বাজনার বরাত নিয়ে আসত তারা। কথা আর ফুরাতে চাইতো না। কেউ কেউ বাপকে বলেও ফেলত, 'বেটীটাকে দেখতে শুনতে তো মন্দ হয়। বে-থার ব্যবস্থা কর গোকুল।'

বাবা চুপ করে থাকতো।

আর বিয়ে করার ইচ্ছে যে তার জাগেনি তা নয়। জাগত বইকি। বিশেষ করে মাসের ওই কটা দিনের পর তার যে কি হত....। খুব কষ্ট। তবু বিয়েতে রাজি হয়নি। আর একদিন কেমন করে যেন যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। কাকাই যোগাযোগটা করেছিল। মহীপাল কন্যা রোহিণীর খাস দাসী নির্বাচিত হয়েছিল পূর্ণ।

রোহিণী তাকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন। সেও দেখেছিল তাঁকে। দেখার মত আহামরি কিছু খুঁজে পায়নি। রাজকন্যা শুনে বুকটা যে একটু কাঁপেনি তা নয়। ভয় ভয়ও করেছিল। দেখবার পর ভয়টাকে আর খুঁজে পায়নি। বেশভূষা সাধারণ। সাজগোজের বালাই ছিল না। দেখবার মধ্যে চোখ দুটো। অমন বড়, টানা আর ফালা চোখ এর আগে সে দেখেনি। মুখের দিকে হাঁ করে চেয়েছিল।

—'তোমার নাম পূর্ণ?' নীরবতা ভঙ্গ করে রোহিণীই প্রথম কথা বলেছিলেন।

ঘাড় নেড়েছিল পূর্ণ।'

—'আমি রোহিণী।'

—'রাজকুমারী।' আস্তে বলেছিল সে।

—'ছিলাম। বিয়ের পর আর রাজকুমারী নই আমি।'

—'শুনেছি।'

—'স্বামীর সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি।' রোহিণী বলেছিলেন, 'শুনেছি তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ। বর মরে গেছে।'

—জানি। তোমাদের তো আবার বিয়ে হয়। আর তুমিতো খুবই ছোট যখন তখন বিধবা হয়েছো?

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি বিয়ে করলে না কেন?

কি বলবে ভেবে পায়নি সে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

—'কি হল, কথা বল। আমি চুপ করে থাকা একেবারে পছন্দ করি না। আমার কথা বুঝতে পেরেছো?

—'জানি না।' অনেকটা ভয়ে ভয়েই কথাটা উচ্চারণ করেছিল সে। রাজকন্যা রোহিণীর অসম্ভব রাগের কথা সে শুনেছে।

—'জান না! কেন? বিয়ে করে সংসার করতে পারতেতো? তোমার কি একবারও ইচ্ছা হয়নি?'

শুনে রোহিণীর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে বলেছিল, 'ইচ্ছে যে করেনি তা নয়। মিথ্যে বলব না। আবার ইচ্ছেও করেনি।'

—'কেন?' বেশ গম্ভীর কণ্ঠস্বর রোহিণীর।

—'কি জানি।'

রোহিণী গম্ভীর হয়েছিলেন। চিন্তা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'শোন, আমার একজন

সর্বক্ষণের সঙ্গিনী দরকার। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তুমি আমার কাছে থাকবে?'

—'আপনারতো দাসীর দরকার?' বলেছিল সে।

—'দাসী!' রোহিণীর ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটেছিল। 'পরিচারিকা দাসীই। তবে রাজবাড়িতে দাস দাসীর কোন অভাব নেই। আমার একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন। সব সময় কাছে থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি থাকতে রাজি হও, প্রয়োজন বা ইচ্ছা হলেও দু-একদিনের জন্য বাড়ি যেতে পারবে বৈকি। আমি বাধা দেব না। বা যদি তোমার ইচ্ছে হয়, জানি আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট তুমি। তোমাদের সমাজে যেমন বিধবার বিবাহ হয়, বেশি বয়সের মেয়েদেরও। তোমার বিবাহের ইচ্ছা হতে পারে। তবে.....'

পূর্ণ রোহিণীর দিকে চেয়েছিল।

গম্ভীরভাবে রোহিণী বলেছিলেন, 'দেখ প্রাসাদে দাস-দাসীর অভাব নেই। অনেক দাসীই.....শুধু যুবতী দাসীরা নয়, অনেক প্রৌঢ়াও অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। আর শুধু এ সম্পর্ক দাস দাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান হবার আগে থেকেই দেখছি। আমার কথা বুঝতে পারছো? আমি কিন্তু সহ্য করবো না।

মাথা নেড়েছিল সে।

রোহিণী বলেছিলেন, 'দেখ পূর্ণ নরনারীর মধ্যে দুর্বলতা জাগাই স্বাভাবিক। জৈবিক ক্ষুধা নিন্দনীয় একথা আমি বলবো না। তবে ব্যাভিচার মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব তোমার জীবনে কখনো হয়, আমাকে জানিয়ে বিদায় নেবে। মনে থাকবে আমার কথা?

—'থাকবে।'

—'তাহলে তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

চুপ করেছিল সে।

শুরু হয়েছিল পূর্ণর কর্মজীবন। প্রলোভনের হাতছানি দেখা যে দেয়নি তা নয়। সতর্ক হয়েছে। দু চারবার রোহিণীকে জানাতেও বাধ্য হয়েছে। ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রোহিণী। কেটে গেল জীবনটা। বুড়ি হয়ে গেল। রোহিণীর জীবনে শান্তি কখনো দেখেনি। এখন বাত ব্যাধিতে ধরেছে। ভালকরে চলাফেরাও করতে পারেন না। ভরসা পূর্ণ।' দাঁত পড়ে গেছে, চুল পাকা শোননুড়ি। শরীর এখনও ঠিক আছে তার।

সেই কথাই বসে বসে বলছিল বদনকে। শশীমুখীর বোনপো। কিছুদিন ধরেই নানান ব্যাধিতে ভুগছিল বুড়ি। এখন আর সেদিন নেই। রাজ্যপাট সবই চলে গেছে। দিব্য হয়েছে রাজা। কৈবর্ত্তের পুত। অন্তঃপুরে হাত পড়েনি। তবে আগের মত না চললেও চলছে। রোহিণীকে বলে শশীমুখী বোনের কাছে চলে গিয়েছিল। বড় সৎ মেয়ে ছিল শশীমুখী। তিনকূলে কেউ ছিল না। বিধবা হয়ে তার দেখতা এসেছিল। ঠাকরুণের পা ধরে কান্নাকাটি করেছিল। বিধবা এক বোন আছে। তারই চলে না। যাবে কি তার কাছে।

দিন পাল্টাবার পর চলে গেল সেই বোনের কাছেই। ঠাকরুণ অবশ্য যাবার সময় শুধু হাতে বিদায় দেয়নি। মধ্যে মধ্যে আসতেও বলেছে।

দিব্য রাজা হয়ে ঠাকরুণের কাছে এসেছিল। ঠাকরুণ তখন শয্যাশায়ী। পূর্ণ শেখান কথা গিয়ে বলেছিল, 'ঠাকরুণ বললেন, তাঁর পক্ষে দেখা করা সম্ভব নয়।'

দিব্য বলেছিল, 'দেখা যে করতেই হবে আমাকে।'

—'তিনি পারবেন না দেখা করতে।'

—'তাহলে আমাকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়।' দিব্য বলেছিল, 'তুমি জেনে এসো তাঁর কাছে।'

—'তাতো হবে না।' দিব্যকে দেখেছিল পূর্ণ।

—'তিনি অসুস্থা। আমি গিয়ে একবার শুধু দেখা করবো তাঁর সঙ্গে।'

—'তিনি নিষেধ করেছেন। পূর্ণ বলেছিল, 'আমাকে বলে দিয়েছেন ঠাকরুণ। দেখা হবে না। চলে যান আপনি।'

চলে গিয়েছিল দিব্য। জোর করতে পারতো। করেনি। সুস্থ হয়ে ওঠার পর রোহিণীর সঙ্গে দেখা করেছিল দিব্য। জানিয়েছিল পাল রাজবংশের অন্তঃপুরীকারা যেমন আছেন থাকবেন। অন্তঃপুর সে অধিকার করবে না।

কঠিন মুখে বসেছিলেন রোহিণী। দিব্যর মুখের দিকে তাকাননি পর্যন্ত।

একসময় দিব্য জানতে চেয়েছিল, 'আপনি কিছু বলবেন?'

রোহিণী কথা বলেছিলেন, 'আমার কিছু বলার নেই।'

—'আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ দায়-দায়িত্বের ভার আমি নিলাম।' বলেছিল দিব্য।

—'ভরনপোষণের?' মৃদু কণ্ঠস্বর রোহিণীর।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দিব্য বলেছিল, 'সর্ব বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

—'কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই।'

—'তাহলে.....' দিব্য বলেছিল, 'তাহলে আপনাদের চলবে কেমন করে?'

—'না চলে, চলবে না। আর.....'

দিব্য তাঁরদিকে চেয়েছিল।

ধীর, শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে রোহিণী বলেছিলেন, গোপালের বংশের পুর নারীরা দস্যু অন্নে প্রতিপালিতা হওয়ার চেয়ে তাদের মৃত্যু শ্রেয়। আপনি বরেন্দ্রর রাজা হয়েছেন ভাল, আপনার কর্তব্য কর্ম প্রজাদের প্রতিপালন করুন। আমরা আমাদের মত থাকতে চাই। যদি আপনি তা না চান অন্তঃপুরের অধিকার নিতে পারেন। তবে বল প্রয়োগের কোন রকম চেষ্টা করবেন না।'

—'আমিতো আপনাকে বলেছি.....'

বাধা দিয়েছিলেন রোহিণী, 'আমি আমার কথা জানালাম। আপনি আসতে পারেন।'

বিদায় নিয়ে মাথা নিচু করে স্থান ত্যাগ করেছিল দিব্য। তারপর রাজ্যের পুরাতন কজন মন্ত্রীকে রোহিণীর কাছে পাঠিয়েছিল। তিনি কারো সঙ্গেই রূঢ় ব্যবহার করেননি।, কিন্তু দিব্যর সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছেন।

পূর্ণ জিজ্ঞাসা করেছে, 'ঠাকরুণ চলবে কেমন করে?'

—'চলে যাবে।' বলেছেন তিনি। 'চিন্তা করিস নি।'

শশীমুখী চলে গিয়েছিল। অন্তঃপুরের বেশ কিছু দাসী চলে গিয়েছিল একে একে। বাধা দেননি রোহিণী। যেন ভার লাঘব হয়েছিল। সকলেই রাজা দিব্যর অন্তঃপুরে কর্মগ্রহণ করেছিল। না সকলে নয়, কজন চলেও গেছে।

শশীমুখী ফিরে এল। বলল, 'ঠাকরুণ আবার এলাম গো।'

—'শরীর কেমন?' জানতে চেয়েছিলেন রোহিণী।

—'একটু ভাল আছি। বোন যত্ন আত্তি করেছে। সেই জন্যেই আসতে পারলুম গো।'

—'ভাল। তা এলি কেন? আমি তো তোকে বলে দিয়েছিলাম। বোনের কাছে থাকলে সেবা পেতিস।'

—'আসতে হল ঠাকরুণ। বোনপোটার জন্যেই আসতে হল। না এসে পারলুমনি।'

—'বোনপো! তোর বোনের ছেলে? তারজন্যে এখানে এলি কেন? তোর বোন-পোর হয়েছেটা কি?'

—'বোনের আবার ছেলে কোথায়, ছেলের মত, ন্যালাক্ষ্যাপা। বয়েস হলে কি হয়, বোধবুদ্ধি নেই। কদিন ধরে ঠায় ধরেছে, মাসী আমায় রাজবাড়িতে নিয়ে চল। সেখানে আমি থাকবো। একদণ্ড তিষ্ঠতে দেয় না। শেষে নিয়ে এলুম।'

—'এখানে থাকতে চায়? কেন?' বিব্রত বোধ করেছিলেন রোহিণী।

—'সেই বায়নাইতো ধরেছিল। বাইরে বসিয়ে এসেছি। নিয়ে আসবো?'

চিন্তিত হয়েছিলেন রোহিণী। বলেছিলেন, 'সে এখানে কি করবে?' এখনতো.....'

—'একবার দেখুন না ঠাকরুণ। বোনও বলছিল, ও নাকি অনেক দিন থেকেই আসতে চায়। আমি রাজবাড়িতে কাজ করি একথা বোনের মুখে শোনা ইস্তক বোনকে নাকি জ্বালিয়ে মারতো।

রোহিণী দেখতে চাইলে বোনপোকে নিয়ে এসেছিল শশীমুখী। রোগা রোগা, বেঁটে খাট গড়ন। কোন ছিরিছাঁদ নেই। দেখলেই কেমন মনে হয়। ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রোহিণীর পা জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না। যতক্ষণ না রোহিণী কথা দিল, ততক্ষণ পা ছাড়ল না। কথা দিতেই একগাল হাসি। আনন্দ দেখে কে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?'

শশীমুখী বলল, 'ঠাকরুণ ওর নাম বদন।'

রোহিণী বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু বদন এটা মেয়ে মহল। এখানে তুমি ঢুকবে না। তুমি বার মহলে থাকবে।'

—'ঠিক্ আছে মা। আমি ভেতরে এসবুনি।'

—'মনে থাকবে তো?'

—'ঠিক থাকবে। বল এবার, কি কাজ করবো?'

—'কি কাজ জান তুমি?' জানতে চেয়েছিলেন রোহিণী।

—'তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। চাষ করতে পারি, লাঠি ধরতেও।'

চমকেছিলেন রোহিণী। হেসেছিল বদন। পরদিন থেকেই কাজে লেগে পড়েছিল। ছয় সাতজন দাসী আর পাচক চাকর মিলিয়ে ছয় সাতজন। বাকি সকলে নতুন রাজাব কাছে চলে গেছে। যাদের কাজ নেই তাদের নিয়েই ঝাড়পোছ শুরু করেছিল। দুদিনেই সব কিছু ঝক্‌ঝকে তকতকে হয়ে উঠেছিল। কাজের লোক, আবার ক্ষ্যাপামীও আছে। পূর্ণর সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই সম্পর্ক ভাল। মাসী ডাকে। একটাই বায়না করেছিল। বলেছিল, 'মাসী তুমি তো দুকুরবেলা ঘুমাও না। না, ঘুমিয়ো না। বুড়ো মানুষের একেতো ঘুম কম, দুকুরে ঘুমুলে রেতে ঘুম হবে না। পেটে বায়ু বাড়বে। তার চে দুকুরে পুকুর ধারে চলে আসবে। আমায় গল্প শোনাবে। গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে।'

রাজি হয়েছিল পূর্ণ। রোজ দুপুরে চলে আসে। গল্প শোনায় বদনকে।

ঘাটের রোয়াকে বসে আছে পূর্ণ। নিচে উবু হয়ে বসে গল্প শুনছে বদন। নিজের কথা বলেছে। আজ বলছিল মহারাজ বিগ্রহপালের কথা। রানি যৌবনশ্রীর বিয়ের গল্প। বিয়ে হয় হয়, ঠিক এমন সময় শান্তি এসে হাজির হল। গাল পোড়া শান্তি। যমের অরুচি। সব সময় তিরিক্ষে মেজাজ। তবে মনটা ভাল। এখন আধবুড়ি। মনের দুঃখে মেয়েটার মুখটা খারাপ হয়েছে। বোঝে পূর্ণ।

—'দিদি চল।' শান্তি বলল, 'নাও, ওঠো তাড়াতাড়ি।

—'কি হল?' হাই তুলল পূর্ণ। 'তোর সবতাতেই তাড়া। কি হল বলবিতো। তা নয়—দিদি চল! কোথায় যাব লা?'

—ঠাকরুণ ডাকছেন। রানিমা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সে বড় ভীষণ কাণ্ড। তুমি না গেলে সামলাবে কে শুনি?'

পূর্ণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'খুব চিন্তের ব্যাপার। চল দেখি গিয়ে। যা তুই এগো।'

বদন ডাকল, 'মাসী।'

—'ছোট রানিকে নিয়ে খুবই মুস্কিল। ছেলে যতদিন বন্দী ছিল ততো দিন যা হোক কিছু মুখে দিচ্ছিল। কুমার কোথায় যে চলে গেল, আর যাবার পর থেকেই.....' কথা শেষ না করেই এগিয়ে গেল পূর্ণ।

বদন ডাকল, 'মাসী।'

দাঁড়াল পূর্ণ।

বদন জিজ্ঞাসা করল, 'ছোট কুমার কোথায় গেছে মাসী?'

পূর্ণ বলল, 'কোথায় গেছে কি করে বলি। সঠিক ব্যাপারটা কেউই কিছু বলতে পারছে না। শুধু ছোট কুমার নয়, মেজকুমারেরও কোন হদিশ নেই। তবে.....' একটু চুপ করে রইল পূর্ণ। ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ছোট রানির আশঙ্কা......তারপর থেকেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে।'

—'কি আশঙ্কা মাসী?'

পূর্ণ তার কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেল। বদন বসে রইল। এখন তার কোন কাজ নেই। বিশাল পুকুরটার দিকে চেয়ে রইল সে।

গভীর রাত্রি। শয্যায় আচ্ছন্নের মত শুয়েছিলেন রামপাল জননী। দুপুরে আজ কি যেন হয়েছিল। পুত্রের জন্য চিন্তা করে করে আহার নিদ্রা দুই-ই চলে গেছে তাঁর। যতদিন সে বন্দীশালায় ছিল যাহোক কিছু আহার করতেন। যুদ্ধ এল।। পট পরিবর্তন হল বরেন্দ্রর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে এক দস্যু। মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন আর হত্যা ছিল যার কাজ। দিব্যর ভয়ে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাতো। আগে, মহারাজ বিগ্রহপালের সময় কখনো কখনো তার নাম শোনা যেত। তাকে শাসন করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সফল হননি। দিব্যকে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তার চেহারার বর্ণনা এক-এক সময় এক এক রকম শোনা যেত। প্রত্যক্ষদর্শীরা কখনো তাকে বৃদ্ধ বলে বর্ণনা করত, কখনো যুবক। কখনো বেঁটে, কখনো দশাসই পুরুষ। পরস্পর বিরোধী উক্তি। দিব্য হয়ে উঠেছিল সমগ্র বরেন্দ্রর ত্রাস।

শয্যায় উঠে বসলেন যৌবনশ্রী। পিপাসায় কণ্ঠনালী শুষ্ক হয়ে গেছে। কক্ষদ্বারের বাইরেই পরিচারিকা সাগর শুয়ে আছে। হয়তো নিদ্রিতা। একবার তার নাম ধরে ডাকলেই উঠে আসবে। পরীক্ষা করে দেখেছেন ইতিপূর্বে।

ডাকলেন না। দুপুরে আজ কি যেন হয়েছিল তাঁর। বসেছিলেন। সে সময় পুত্রের কথা চিন্তা করেননি। হঠাৎ সর্ব শরীরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। রাশি রাশি অন্ধকার গ্রাস করেছিল তাঁকে। সাগরের নাম ধরে ডাকতেও গিয়েছিলেন। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

সন্ধ্যার আগে চেতনা লাভ করেছিলেন।

পালঙ্কের পাশেই জল থাকে। জল খেলেন যৌবনশ্রী। স্বস্তিবোধ করলেন। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকিয়ে গিয়েছিল। শরীর অনেক ক্ষীণ, দুর্বল হয়ে গেছে। অনেকদিন একরকম অনাহারেই আছেন বলা চলে। খাদ্যবস্তু দেখলেই বমন উদ্রেক হয়। সাগর বহুবার বৈদ্যের কথা বলেছে। কিন্তু তিনি জানেন, এ তাঁর কোন ব্যধী নয়, মহারাজের মৃত্যুর পর মনকে এই বলে শান্ত করেছিলেন, স্বামী চলে গেলেও পুত্র আছে। এখন কিছুই নেই তাঁর। তা ভিন্ন স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনদিনই নিবীড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তার বেশি কিছু নয়।

পুত্র কারাগাবে বন্দী থাকাকালীন জীবন ধারণের জন্য আহার গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। রোহিণী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন। এখনও তিনি বোঝান, কিন্তু মন মানে না।

সন্ধ্যার আগে চেতনা লাভ করেছিলেন। সাগর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কক্ষে অন্তঃপুরের বর্ষিয়সী কয়েকজন মহিলা ছিলেন। চেতনা লাভ করার পর নানান কথা বলেছিলেন তাঁরা। সেই সময় রোহিণী এসেছিলেন। তাঁকে দেখে বর্ষিয়সীর দল বিদায় নিয়েছিলেন।

রোহিণী সাগরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'চেতনা লাভের পর বৈদ্য আহারের কথা কিছু বলেছেন?'

—উষ্ণ দুধ মধুসহযোগে পান করাতে বলে দিয়েছিলেন তিনি।' উত্তর দিয়েছিল সাগর।

—'করেছ?'

—'খুবই অল্প পরিমাণ দুধ পান করেছেন।'

—'ভাল। এখন বেশি খাওযান উচিৎ হবে না।' তাঁর দিকে ফিরেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বল, এখন কেমন বোধ করছো?'

—'ভাল। সাগর ওঁকে বসার আসন দে।'

—'প্রয়োজন নেই।' বলেছিলেন তিনি, 'নিশ্চিন্ত হলাম। শোন, অনাহারে থাকা কিন্তু তোমার উচিৎ হচ্ছে না।'

—'আমি.....' কিছু বলতে গিয়েছিলেন তিনি।

বাধা দিয়েছিলেন, 'জানি। স্বামী শোকের চেয়েও পুত্রশোক আরো মর্মান্তিক। কিন্তু এখন এসব কথা আলোচনা করার সময় নয়। একটা কথাই বলছি, তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। আর.....'

রোহিণীর মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

—'তোমার পুত্র নিরুদ্দেশ, মৃত নয়। বন্দীশালা থেকে সে....' কথাটা শেষ করলেন না তিনি। ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন, 'কুমার শূরপাল আর রামপালের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা আমি করছি। আমি চললাম।'

যেমন এসেছিলেন, চলে গিয়েছিল তেমনি। কিছুটা রহস্যময়ী নারী। খুবই কঠোর, আবার যথেষ্ট কোমলতার পরিচয়ও পেয়েছেন।

রাত্রে খুবই সামান্য আহার করেছিলেন। আহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংবাদ রোহিণীর কাছে ঠিকই পৌঁছে যাবে। কি করে সব সংবাদ তিনি জানতে পারেন বোঝা যায় না।

সাগর তাঁর কাছে থাকার প্রস্তাব করেছিল, তিনি সম্মত হননি। বলেছিলেন, 'আমি ঠিক আছি সাগর।'

মাথাটা সামান্য ঝিম ঝিম করছে। বুকের মধ্যেটা শূন্য মনে হয়। মনে হয়.....'

শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি। আবছা আলোয় ভরে আছে চারিধার। গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সর্ব শরীর শিহরিত হল তাঁর। মনে হল একটা ছায়া। ...না, নেই। চিন্তা করলেন। ভুল দেখলেন কি?

মনের মধ্যে শঙ্কা জাগল। কি করে সম্ভব? দ্বিতলের গবাক্ষের কাছে কোন মানুষের পক্ষে পৌঁছানোতো সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই তার দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছিল।

তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। পুত্রের কথা মনে পড়ল। সেকি....

—'মহারানি।' মৃদু কণ্ঠস্বর। কেউ যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলল।

ঠিক শুনেছেন কি? চিন্তা করলেন। শুনতে ভুল হয়নিতো! হতে পারে। এমন মধ্যে মধ্যে হয় তাঁর। কুমারের কণ্ঠস্বরও শুনতে পান।

—'মহারানি।' আবার সেই আহ্বান।

—'কে? সচকিত হলেন। এবার তিনি ভুল শোনেননি।

উত্তেজিত হবেন না। ভয় নেই।' ফিস্ ফিস্ করে বলল কেউ।

তিনি শয্যায় উঠে বসতে গেলেন।

—উঠবেন না।' মৃদু কণ্ঠস্বর। 'আমি আপনাকে একটা কথা জানাবার জন্য এসেছি।'

শুনলেন তিনি। গবাক্ষের দিকে চাইতে পারলেন না। বুকের মধ্যেটা থরথর করে কাঁপছে।

—'কুমার রামপালের জন্য খুবই উতলা হয়েছেন আপনি?'

কি বলবেন! বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠল তাঁর। কথা বলতে গেলেন, পারলেন না।

—'তাঁর সম্পর্কে কি মনে হয় আপনার?'

কিছুই বলতে পারলেন না। কি বলবেন। কণ্ঠ স্তব্ধ। বুকের মধ্যে কাঁপুনি অনুভব করলেন।

—'তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। কুমার শূরপালও।'

—'হ্যাঁ।' কষ্টে কথাটি উচ্চারণ করলেন তিনি।'

—বরেন্দ্র বিদ্রোহের পর দুজন কুমারের একজনকেও পাওয়া যায়নি। দিব্য তাঁদের সন্ধান জানার জন্য আপনার কাছেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লোক পাঠিয়েছিল।'

—'আমার কাছে?' চিন্তা করলেন তিনি। 'কই, নাতো।'

—'এসেছিল মহারানি। এক নারী পরপর কদিন এসেছিল আপনার কাছে। আপনার পরিচিতা এক নারী। সমবেদনা জানাবার জন্যই এসেছিল সে। কৌশলে জানার চেষ্টা করেছিল কুমারের কোন সংবাদ আপনি জানেন কি-না। কারণ যুদ্ধের পর থেকে দুই কুমারকেই পাওয়া যায়নি। তাঁরা কোথায় গেলেন?'

চিন্তা করলেন তিনি। বরেন্দ্রে পালবংশের শাসনের অবসান হয়েছে। রাজা হয়েছে দিব্য। পালবংশের মন্ত্রী অমাত্যদের অনেককেই দিব্য তার রাজসভায় নিয়োগ করেছে। মন্ত্রী অমাত্যদের পত্নী আত্মীয়রা আগে অন্তঃপুরে আসতেন। বিপর্যয়ের পর অনেকে

এসেছিলেন। কথা বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কে চরের কাজে নিযুক্তা ছিলেন কেমন করে বুঝবেন!

—'মহারানি।'

গবাক্ষের দিকে চাইলেন তিনি। একটু সাহস সঞ্চার হয়েছে তাঁর। বললেন, 'পুত্রের কোন সংবাদই আমি জানি না।'

—'জানি। শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

—'এর ফলে শরীরের পতন হবে মহারানি।'

—'আমি.....' কিছু বলতে গেলেন তিনি।

—'অন্ন গ্রহণ বন্ধ করবেন না। দুশ্চিন্তা মুক্ত হোন। আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

—'আমি—আমি......' বন্যার জলধারার মত অশ্রু ঝরতে লাগল দু'চোখ থেকে।

—'শান্ত হোন। আমার কথা শুনুন।'

—'সে-কি.....'

—'আছেন। তিনি জীবিত আছেন মহারানি।'

—'কোথায় আছে?' কষ্টে জানতে চাইলেন তিনি।

কণ্ঠস্বর একটু নীরব রইল। বলল, 'এখন, এই মুহূর্তে তিনি কোথায়, কেমনভাবে আছেন, বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের কোন অনিষ্ট হয়নি।'

—'তাঁদের.....'

—'কুমার শূরপালের কথা বলছি আমি।'

—'তুমি.....'

কণ্ঠস্বর অদৃশ্য। শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। কোথায় গেল? কেমন করে গেল? বুঝতে পারলেন না। গবাক্ষের কাছে গেলেন। নীচে দেখলেন। কিছুই নেই। শয্যায় এসে শুলেন। বড় ক্লান্ত লাগছে। ঘুমাতে হবে।

ঘুমিয়ে ছিলেন? না, ঘুম নামেনি চোখের পাতায়। সমস্ত রাত্রি জেগে রইলেন। একটি প্রশ্ন, কে, কে এসেছিল?

রাত্রি প্রভাত হল। সাগর এসে অবাক। বলল, 'একি, তুমি বসে? ঘুমাও নি?

সাগরকে দেখলেন। বললেন, 'একটা কাজ তোকে করতে হবে সাগর। গোপনে। একবার নিচে যেতে হবে তোকে।'

—'নিচে যাব!' অবাক চোখে সাগর চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

—'হ্যাঁ।' গবাক্ষটা দেখালেন। বললেন সব।

নিচে চলে গেল সাগর। বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে সাগর ফিরল। তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন যৌবনশ্রী।

বলল সাগর। গবাক্ষের নিচে আগাছার জঙ্গল। বনতুলসীর ঝোপ কেমন এলোমেলো। শুনলেন শান্তভাবে। বললেন, 'আচ্ছা, যা তুই, নিজের কাজ কর গিয়ে।'

কেউ এসেছিল। দীর্ঘদেহী? না, নিশ্চয়ই রূপায়ে এসেছিল সে। কে? কে আসতে পারে? না, কিছুই স্থির করতে পারলেন না।

সতের

চম্পা নগরীর দূরত্ব অনেক কমে এসেছে। আর মাত্র কয়েক দিনের পথ। বর্ষা আসন্ন। আকাশে জলজ মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। রোদ আছে, উত্তাপ অনেক কম।

গঙ্গার ধারে একটি পান্থশালার প্রবেশ দ্বারের পাশে রাতের আহার তৈরি করতে ব্যস্ত তখন ভানুপ্রিয়া। কদিন হল তার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। ভৃগু রান্নার আয়োজন করতে নিষেধ করেছিল। ভানুপ্রিয়া শোনেনি। দিনের বেলা পাকের কোন ব্যবস্থা হয় না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হয়। শুকনো খাবার খেয়ে দিন কাটে। যাত্রা বিরতির পর রান্নার আয়োজন হয়। তারা তিনজন ছাড়াও সকট চালক দুজন আহার করে।

অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেক আগে যাত্রা বিরতি ঘটেছে। কারণ এই পান্থশালাটি থেকে অন্যটির দূরত্ব অনেক। পান্থশালাটি আয়তনেও ছোট। তার ওপর পূর্ণ। পান্থশালার পরিচালক বলেছিলেন, 'সমস্ত কক্ষই পূর্ণ। দুটি পরিবার বাইরের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে। যদি দ্বিধা না করেন আপনারাও থাকতে পারেন।'

ভানুপ্রিয়াকে এসে জানিয়েছিল ভৃগু।

ভানুপ্রিয়া বলেছিল, 'বাইরে থাকাটা কি ঠিক হবে?'

ভৃগু গিয়ে পরিচালকের কাছ থেকে পরের পান্থশালার সন্ধান নিয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন, 'দুরত্ব অনেক, রাত্রি হয়ে যাবে। আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে রাত্রিবাস করতে পারেন। কোন অসুবিধা হবে না।'

ভানুপ্রিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে পান্থশালায় থাকাই ঠিক করেছিল। পান্থশালার পরিচালক থাকার জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন। মেয়েদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, ব্যবস্থা আছে। সমস্যা দেখা দিয়েছিল আহার্য প্রস্তুতের। রন্ধনশালাটি খুবই ছোট। সেখানে রাতের আহার প্রস্তুত হচ্ছিল। ভিতরেই রান্না করা যেত, ভানুপ্রিয়া বাইরে রান্না করা মনস্থ করেছিল। রান্নার সমস্ত আয়োজন করে দিয়ে ভৃগু জানতে চেয়েছিল, 'এখন আমার কোন প্রয়োজন আছে?'

ভানুপ্রিয়া বলেছিল, 'না, কেন?'

—'আমি তাহলে একটু ঘুরে দেখি।'

—'যাও, তবে ফিরতে দেরি কোর না।'

একটু দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে গেল ভৃগু। কাঞ্চন পান্থশালার উঠানে একটা পেয়ারা

গাছ থেকে, পেয়ারা পাড়ছে৷ এর মধ্যেই সে পান্থশালার পরিচালক প্রৌঢ় মানুষটিকে দাদু ডাকতে শুরু করেছে।

খুবই কাছে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে ধারে পথ চলে গেছে। ভৃগু এপথে ইতিপূর্বে বার দুই এসেছিল। এসেছিল বণিকদের সঙ্গে। জলপথে একবার মুদগগিরি (মুঙ্গের) পর্যন্ত গিয়েছিল। এক সময় সমগ্র মগধ শাসন করতেন বরেন্দ্রর পালরাজারা। এখনও মগধে পাল শাসন আছে, তবে রাজ্যের সীমা অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। একসময় আর্যাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মপাল ও দেবপাল। কিন্তু শুধুমাত্র মগধকে তাঁরা নিজেদের অধিকারে রেখে দিয়েছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত রাজাদের রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিনিময়ে সেই সমস্ত রাজারা কর দিতেন, কখনো কখনো বরেন্দ্রর রাজসভায় উপস্থিত হতেন, যুদ্ধ যাত্রায় সৈন্য সাহায্য করতেন পাল রাজাদের।

শুনেছে ভৃগু। আত্মপরিচয় গোপন করে এক সময় অনেকের সঙ্গেই মিশেছে। দেখা এবং জানার আগ্রহ তার মনে সেই ছোট বেলা থেকে। অন্ধকার জগতে তার জন্ম। পিতৃ পরিচয় প্রহসন। গর্ভধারিনী ছিল। সে যখন বলাক মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই সে নিজের খুশি মত চলেছে। একটা আশ্রয় তার ছিল। ধাইমা। অন্ধকার জগৎটারই একজন। মায়ের মৃত্যুর পর ধাইমাই তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারপর সে হয়ে উঠেছিল দুস্কৃতকারি। সদ্য তরুণ তখন। শাসন করেছে অন্ধকার জগৎটাকে। বেশিদিন নয়, মাত্র কয়েকটা বছর। কিশোরী ভানুপ্রিয়াকে দেখে তার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। পথ পবিবর্তন করল। স্বপ্ন দেখল ভৃগু। ভানুপ্রিয়া তাকে স্বপ্ন দেখায়নি, সে নিজেই স্বপ্ন দেখেছিল, আকাশকুসুম কল্পনা করেছিল। সব শেষ হয়ে গেল। ভানুর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হল না তার পক্ষে। আরো অনেকেই হাতছানি দিয়েছিল, উপেক্ষা করেছে। বার বার ছুটে গেছে ভানুর কাছে।

কাঞ্চনকে দেখিয়ে একদিন প্রশ্ন করেছিল, —'ভানু, এটাও নিশ্চয়ই আমারই মত একজন?'

ভানুপ্রিয়া নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। উত্তর দেয়নি।

—'কিরে, চুপ করে রইলি যে বড়?' জিজ্ঞাসা করেছিল।

স্তব্ধ পাষাণের মত দাঁড়িয়েছিল ভানু। একসময় বলেছিল, 'শোন।'

ভানুর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছিল সে। আবিরের মত রক্তবর্ণ তার মুখ মণ্ডল।

—'শোন ভৃগু, তুমি আর এখানে এসো না।' ধীর, শান্ত কণ্ঠে বলেছিল ভানুপ্রিয়া।

—'আসব না!' অবাক হয়েছিল তার কথা শুনে।

—'না।' কঠিন শুনিয়েছিল ভানুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বর।

—'আমি তো......' কিছু বলতে গিয়েছিল সে।

ভানুপ্রিয়া দাঁড়ায়নি আর।

অনেকক্ষণ সেদিন সেখানে দাঁড়িয়েছিল ভৃগু। এক সময় সংবিত ফিরে পেতে চলে এসেছিল। তারপর কি যেন হয়েছিল তার। বরেন্দ্র ত্যাগ করেছিল। পথে এক বণিক দলের সঙ্গে প্রথম চম্পায় এসেছিল। দীর্ঘদিনের পথযাত্রা। সেই প্রথম দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে আহার সংগ্রহ। অল্পদিনের মধ্যেই বণিকদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল সে। বাইরের জগৎটাকে জানার সুযোগ হয়েছিল। বাল্যে তার মধ্যে দেখা আর জানার আগ্রহ ছিল, পরবর্তী কয়েক বছরে নানান ঘাত প্রতিঘাতে হারিয়ে গিয়েছিল তা। বণিক দলের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। প্রতিদিনের অপরাহ্নে যাত্রা বিরতির পর নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন তাঁরা। ধর্ম সম্পর্কেও। দূরে বসে শুনত সে। তাঁদের আদেশ পালন করতো।

সে সময় বুদ্ধ আর বৌদ্ধ ধর্মের কথা যেমন শুনেছে, হিন্দু ধর্মের কথাও। পাল রাজারা বৌদ্ধ। রাজা-প্রজার সম্পর্ক পিতা-পুত্রের কিন্তু নিজেদের ধর্ম গ্রহণে প্রজাদের বাধ্য করেননি কোন পালরাজাই। ধর্ম গ্রহণে রাজাজ্ঞা কোন দিনই উচ্চারিত হয়নি বরেন্দ্রে। হিন্দু-বৌদ্ধ-প্রজারা মিলে-মিশে বসবাস করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনদিনই কলহ বিবাদ দেখা দেয়নি।

গোপাল প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল ও পৌত্র দেবপাল। মহারাজ ধর্মপাল মগধে একটি বিহার নির্মাণ করেন, তা হল 'বিক্রম-শীল-বিহার'। নালন্দার মত 'বিক্রমশীল-বিহার'ও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গঙ্গার ধারে পর্বতের ওপরে এই বিহার দেখেছিল সে। জীর্ণ হয়ে গেছে। প্রধান মন্দিরকে ঘিরে একশত সাতটি ছোট মন্দির ছিল। শুনেছে বিক্রমশীল-বিহার ছিল উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। বাইরে থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়াশোনা করতে আসতেন। এখানকার বৌদ্ধ আচার্য্যিরাও তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন।

বরেন্দ্রর সোমপুরায় (রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে) ধর্মপাল আর একটি বিহার নির্মাণ করেন। এতবড় বৌদ্ধ বিহার ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। তাছাড়া মহারাজ ধর্মপাল ওদন্তপুরেও (বিহার) একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান।

নিজে বৌদ্ধ ছিলেন ধর্মপাল, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না তাঁর। নারায়ণের মন্দির নির্মাণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন তিনি। শাস্ত্রানুশাসন মেনে চলতেন, প্রতি ধর্মের মানুষ যাতে স্বধর্ম পালন করে, তার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ গর্গ।

ধর্মপালের পর পুত্র দেবপাল পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন তিনি। মন্ত্রী ছিলেন গর্গের পুত্র দর্ভপানি এবং পপৌত্র কেদার মিশ্র। দেবপাল প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবেশী দুই রাজ্য আসাম ও উড়িষ্যা তিনি অধিকার করেন। আসামের রাজা বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে সামন্ত রাজার ন্যায় রাজ্য শাসন করতেন। উড়িষ্যার ভঞ্জ রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজ্য-

রাজধানী ত্যাগ করে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে গঞ্জাম জেলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিমালয় থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত মহারাজ দেবপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

পি গার মতই বৌদ্ধ ছিলেন দেবপাল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহারাজ দেবপালের কাছে দূত প্রেরণ করে শৈলেন্দ্ররাজ মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। বরেন্দ্র রাজ সে প্রার্থনা পূরণ করেন।

ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে দুটি রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতিহার, অন্যটি পাল সাম্রাজ্য। মহারাজ দেবপালের যুদ্ধ যাত্রাকালে পঞ্চাশ হাজার রণহস্তী এবং সৈন্যদের বস্ত্র ধৌত করার জন্য দশ পনের হাজাব অনুচর সঙ্গে থাকত।

আর আজ?

কেমন যেন দুঃখবোধ হল ভৃগুর। কে সে? কি তার পরিচয়? নিজের পরিচয় কখনই দিতে পারেনি। এড়িয়ে গেছে, পালিয়ে এসেছে। সবচেয়ে মুস্কিল বাধায় তাঁর চেহারা, আর মুখখানা, ভাঙ্গাচোরা মুখ, আর পাঁচজনের মত নয়।

তার প্রথম চম্পা যাত্রা। চম্পাযাত্রী বণিক দলের সঙ্গে হঠাৎ-ই তার যোগাযোগ। বণিকরা শুধু বরেন্দ্রর ছিলেন না, একদল ছিলেন রাঙ্গামাটির (কর্ণসুবর্ণ)। কয়েকজন ছিলেন পাণ্ডু নগরের। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়েছিল সে। তখন কাঞ্চনের জন্ম হয়েছে। ভানুপ্রিয়াকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল আবার তার পূর্ব জীবনে ফিরে যায়। অসংযত জীবন যাপনে। কিন্তু আর তা সম্ভব হয়নি। আগের সেই মনটা, নিষ্ঠুরতা খুঁজে পায়নি। তাছাড়া বুঝতে পেরেছিল, হারালে আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। অন্যের আজ্ঞাবাহী হয়ে কাটাতে হবে। সেটা সম্ভব নয়।

রাজমহলের পথে বিরাট বণিক দলটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। একাকী পথ চলছিল সে। পাণণ্ডু নগরের বণিক সুগন্ধর সঙ্গে তার পরিচয়।

দিনের যাত্রা বিরতির পর বণিক সুগন্ধ অশ্বারোহণে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। ভৃগু পরেও দেখেছে, দিনের যাত্রা বিরতির পর অন্যান্য বণিকরা যখন পথশ্রমের ক্লান্তিতে বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন সুগন্ধ অশ্বারোহণে কিছুদূর ঘুরে আসেন। সেদিন তাঁকে যাবার সময় দেখেছিল সে। এক যুবা অশ্বারোহী প্রায় তার সামনে দিয়েই এগিয়ে গিয়েছিলেন। সে তখন আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিল। একটা বিশাল আমগাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল সে। আহার শেষ করে সেদিনের মত বৃক্ষ শাখাতেই রাত্রি যাপন করবে।

আহার করছে, যুবা পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখেছিল সেও। তিনি প্রথম কথা বলেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, 'তুমি দেখছি একা?'

উত্তর দেয় নি সে।

—'তোমাদের সঙ্গী সাথীরা সব কোথায়? জানতে চেয়েছিলেন যুবা পুরুষ।

—'ছিল।' গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিল সে।

—'এখন তারা কোথায়? দেখছি না। কোথায় গেল?'

সে আকাশের দিকে নির্দেশ করেছিল।

—'তোমার নাম কি?' জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

কথা বলেনি। কথা বলতে ভাল লাগেনি তার।

—'কি হল, 'নাম বলবে না?'

—'কোন প্রয়োজন দেখছি না।' আস্তে বলেছিল।

অবাক হয়েছিলেন যুবা পুরুষ। বলেছিলেন, 'আমি সুগন্ধ।'

—'আমোদিত হচ্ছি।'

—'অর্থাৎ?' অবাক হয়েছিলেন তিনি।

—'আপনার সৌগন্ধে।' নির্বিকারভাবে বলেছিল সে।

হেসে উঠেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমার সন্দেহ দেখছি অমূলক।'

—'লুন্ঠনকারি বা তস্কর ভেবেছিলেন?'

—'দেখছি বেশ বুদ্ধিমান তুমি।'

—'মানুষকে দেখে বুদ্ধিহীন ভাবা আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ত নয়।'

—'দেখছি কথাও বেশ সুন্দর বল।'

—'তাবলে বিদ্বান ভাবার কোন কারণ নেই।'

আবার হেসেছিলেন সুগন্ধ। বলেছিলেন, 'শোন, তুমি যেই হও, নাম প্রকাশ না-ই কর, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে, আমরা একদল বণিক রক্ষীপরিবৃত হয়ে বাণিজ্যে চলেছি। আমার প্রস্তাব, তুমি আমাদের সঙ্গী হয়ে চল।'

—'আপনাদের বলতে?' জানতে চেয়েছিল।

সুগন্ধ বলেছিলেন, মনে কর, আমার সঙ্গী হলে?'

—'আমি আপনার সঙ্গী হলে কি লাভ আপনার? আর, তাছাড়া আমি আপনাদের সঙ্গী হতে যাবইবা কেন? আমি চলেছি আমার পথে, আপনারা আপনাদের।'

—'দেখ, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে জানতে চাইছি, কোথায় যাবে তুমি?'

—'জানি না।'

—'সেকি! পথে বেরিয়েছো, কোথায় যাবে জান না?'

—'পথ চলছি, যেখানে হোক পৌছাব।'

—'আশ্চর্য। তুমি তাহলে ভবঘুরে?'

—'বলতে পারেন।

—'আরে চল-চল, আমি তো তোমার মতই একজনকে দীর্ঘদিন খুঁজছিলাম। প্রভু ঠিক সময়ে তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।'

—'প্রভু, কে আপনার প্রভু?'

—জগতের কি-না জানি না, আমার প্রভু বুদ্ধ। আমি একজন বৌদ্ধ।'

চিন্তা করেছিল ভৃগু। কিছু অর্থ সে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। আরো কিছু অর্থ তার ধাইমার কাছে গচ্ছিত আছে। তবে সঙ্গের অর্থ যদি প্রতিদিন খচর করে তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হবে। বণিক সুগন্ধের আহ্বান যদি উপেক্ষা না করে মন্দ কি! তবে রবাহুতের অন্নগ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। জন্ম পরিচয়হীন হলেও আত্মমর্যাদা বোধ তার মধ্যে বার বার জেগে ওঠে। তার যন্ত্রণার কারণ। বলেছিল, 'আমি আপনার সঙ্গী হলে আমার আহার তো আপনিই যোগাবেন?'

—'তাতো বটেই।' সুগন্ধ বলেছিলেন, 'তোমাকে অভুক্ত রেখে আহার গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? তুমি কি বল?'

—'সেইখানেই সমস্যা।'

—'কিসের সমস্যা?' অবাক হয়েছিলেন সুগন্ধ।

—'আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবে......হ্যাঁ, একটা কাজ আপনি করতে পারেন। আমাকে যে কোন কাজ দিতে পারেন।'

—'কাজ? কি কাজ তুমি করবে?'

—যে কোন কাজ। আপনার পরিচারকের কাজও আমাকে দিতে পারেন।'

—'আমার পরিচারক আছে। ঠিক আছে, বিনাশ্রমে যখন আহার গ্রহণে তুমি সম্মত নও, তোমাকে যে কোন কর্মে নিযুক্ত করা যাবে। এবার কি তোমার নাম বলতে আপত্তি আছে?'

—'আমি ভৃগু। তবে তার বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কুলশীল....

—'ব্যাস-ব্যাস।' হেসেছিলেন সুগন্ধ। 'আর কিছু চাই না। তোমার পরিচয়, তুমি ভৃগু। আমি পাণ্ডুনগরের বণিক সুগন্ধ, পিতৃ আজ্ঞায় বাণিজ্য করতে চলেছি। তুমি বাউণ্ডুলে ভৃগু আজ্ঞাবাহী নও।' কথাটা শেষ করেই অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়েছিলেন তিনি।

বণিক দলের সঙ্গী হয়ে চম্পায় পৌছেছিল সে। একটা নতুন জগতে সেই প্রথম প্রবেশ করেছিল। পরিচিত হয়েছিল অনেকের সঙ্গে। দ্বিধা দূর করে সহজ হয়ে উঠতে খুব বেশি দেরি হয়নি। সব কাজেই এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে পছন্দ হয়েছিল অনেকেরই।

সুগন্ধ বলেছিলেন, 'ভৃগু, তুমি তো দেখছি করিতকর্মা পুরুষ।'

চুপ করে থেকেছে। একদিন জানতে চেয়েছে, 'শুধু একটা কথাই আমার বোধগম্য হয়নি, আপনি পথ থেকে আমাকে কেন তুলে নিয়ে এলেন?'

হাসি মুখে সুগন্ধ বলেছিলেন, 'কারণ একাধিক। পথে একবার নয়, বেশ কয়েকবারই আমি লক্ষ্য করেছি। পণ্য সামগ্রী নিয়ে বাণিজ্যে চলেছি। যদিও রক্ষীরা সঙ্গে আছে। কিন্তু তাকি যথেষ্ট?'

—'দস্যু ভেবেছিলেন আমাকে?'

—'তোমার মুখ দেখলে তাকি মনে হয় না?'

—হয়। তারপর?'

—'পরে কৌতুহল জেগেছে। মনে হয়েছে তুমি একাকী।'

—তাই দয়া পরবশ হয়ে....।

বাধা দিয়েছেন সুগন্ধ। বলেছেন, 'ঠিক তা নয়। বাল্যে দেশ ভ্রমণের খুবই ইচ্ছা ছিল। সঙ্গীরও অভাব হয়নি। বার দুই সঙ্গীদের সঙ্গে গৃহত্যাগও করেছিলাম। ধরা পড়ে গৃহে ফিরতে হয়েছে। কৈশোরে ভিক্ষু হওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল। হল না। ষোড়শ বর্ষেই পিতা বিবাহ দিয়ে দিলেন। তারপর বাণিজ্য।'

—'ভালই তো।' মুচকি হেসেছিল সে।

—'একে তুমি ভাল বলছো ভৃগু?'

—'খারাপ তো কিছু দেখছি না।'

হতাশ হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'মানুষের বাহ্যিকরূপ দেখে তার ভেতরটা কি বোঝা যায়? কি তার মর্মজ্বালা?'

যায় না। সম্ভব নয়। সে নিজে। কি চেয়েছিল। আবার একথাও চিন্তা করেছে ভানুপ্রিয়াকে লাভ করলেই কি তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত? ভালবাসা! কেন ভালবেসেছিল ভানুকে। ভানুর সৌন্দর্য্য-শরীর তাকে আকৃষ্ট করেছিল, কামনা জাগিয়েছিল। আজ, এখনও.....কষ্টে নিজেকে সংযত করে। বড় কষ্ট তার। কিছুই পেল না। একটা নারী শরীরের জন্য দগ্ধ হল শুধু। তবে....

গঙ্গার দিকে তাকাল। অসংখ্য বাণিজ্য তরী ভেসে চলেছে। সকালে একদল শ্রমণকে দ্রুত পথ চলতে দেখেছে। নিশ্চয়ই বিক্রমশীল বিহারের উদ্দেশ্যে তাঁদের যাত্রা। বর্ষা আসন্ন। বর্ষার চারমাস শ্রমণরা কোথাও না কোথাও আশ্রয় নেন। এই রীতি।

বুদ্ধের কথা সুগন্ধের কাছে শুনেছিল সে। বর্ষার চারমাস তিনিও পরিব্রাজক জীবনের অবসান ঘটাতেন। বুদ্ধের জীবনের কথাও তাঁর কাছে শুনেছে। বণিকদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কথাও। আরো অসংখ্য হিন্দু দেব-দেবীর কথা।

নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধের জন্ম (আনুঃ খ্রীঃ পূর্ব ৫৬৬ অব্দে)। শিশুকাল থেকেই সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। উনত্রিশ বছর বয়সে পুত্র লাভ। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে পর পর চারটি দৃশ্য তাঁর অন্তরে গভীর বেদনার উদ্রেক করে। জরা, ব্যধি, মৃত্যু ও গেরুয়া পরিহিত ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী। পুত্রের জন্মের পর সংসার জীবনে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে গৃহত্যাগ করেন। অবশেষে বুদ্ধ গয়ার কাছে উরুবিল্ব গ্রামে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। পরম জ্ঞান লাভ করে বারানসীর কাছে সারনাথের মৃগদাব অরণ্যে আসেন ও ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁর শিষ্যরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—উপাসক ও ভিক্ষু। যাঁরা শিষ্যত্ব

গ্রহণ করে সংসারধর্ম পালন করতেন তাঁরা উপাসক ও যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন তাঁরা ভিক্ষু। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্মপ্রচারের পর আশি বছর বয়সে গোরখপুর জেলার কুশি নগরে তাঁর দেহান্ত হয়।

বুদ্ধের মহানুভবতা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সহজ, সরল মর্মস্পর্শী উপদেশ বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্যের অন্যতম কারণ। বৌদ্ধ ধর্মে কোন গোপন মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও উপনিষদের মত দুর্বোধ্য দর্শনতত্ত্ব নেই। এই কারণে বুদ্ধের উপদেশ ও নির্দেশ সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়েছিল। তিনি মধ্য পথের কথা বলেছেন। এই পথ হল এক নৈতিক বিধান মাত্র, যা গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই অনুসরণ করা সহজ ছিল। তাছাড়া বুদ্ধের সময় সমাজের কঠোর জাতিভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের ক্ষোভ বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আর শিষ্যদের কাছে তাঁর শেষ বাণী ছিল, "সব বস্তুর মধ্যেই ক্ষয় নিহিত রয়েছে। সুতরাং অধ্যবসায় সহকারে নিজেদের মুক্তির চেষ্টা কর।"

তাঁর কথা মিলে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল পতনের কাল। বলেছিলেন সুগন্ধ। বড় খোলা মনের মানুষ ছিলেন। বলেছিলেন, 'ভৃগু, তাঁর সত্যের অবলুপ্তি ঘটবে না। তিনি সত্য দ্রষ্টা। আশ্রয়। আনন্দ। শান্তি।

—'একি! তুমি এখানে? আর আমি চতুর্দিক খুঁজছি।'

কাঞ্চনের দিকে চাইল ভৃগু। তাকে দেখল। ভানুপ্রিয়ার সন্তান। তারও....

—'কি হল ভৃগু, কথা বলছো না কেন?'

ভৃগু হাসল।

—'না-না ভৃগু, হাসি নয়, এই এক বড় দোষ তোমার, অপরাধ আড়াল করার জন্য হাস।'

—'কি অপরাধ করলাম কাঞ্চনমালা?' সকৌতুকে কাঞ্চনের মুখের দিকে তাকাল ভৃগু।

—'অপরাধ করনি?' কাঞ্চনের কণ্ঠে অভিমানের ছোঁয়া।

—'জ্ঞানতঃ আমি.....'

—'থাক।' বাধা দিল কাঞ্চন। 'তোমার জ্ঞান নামক বস্তুটি আছে নাকি?'

—'নেই?' অবাক হল সে।

—'আমার তো তা-ই মনে হয়। এই যে তুমি গঙ্গার ধারে এসে বসে আছো, আমাকে জানিয়ে আসা তোমার উচিৎ ছিল কি-না?'

—'জানিয়ে আসা উচিৎ ছিল স্বীকার করছি, কিন্তু তুমি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলে।'

—'কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি?' অবাক হল কাঞ্চন। 'কি বলছো তুমি?'

—'ছিলে। চিন্তা করে দেখ।'

চিন্তা করল কাঞ্চন। মনে পড়ল তার। বলল, 'ওহো, তাই বল। আমিতো পান্থশালার উঠানে পেয়ারা পাড়ছিলাম।'

—'সেটা কি কাজ নয়?'

—'কাজ? না, ওটা কোন কাজ নয়।'

—'এই যে আমি এখানে এসে বসে আছি, এটাকে কাজ মনে কর তুমি?'

—'করি বৈকি। দেখেছি তো। মধ্যে মধ্যে খুবই চিন্তা কর তুমি। আচ্ছা ভৃগু, আমায় বলবে, এত কি চিন্তা কর তুমি?'

—'আমি তো চিন্তা করি না, চিন্তা আসে। তোমাকেও দেখি।'

—'আমাকে?' যেন চমকে উঠল কাঞ্চন। পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমার মন খারাপ হয়ে যায় তাই।'

—'কেন?'

—'এভাবে পথ চলা, ভাল লাগে? এক দেশ থেকে অন্য দেশ, কেন?'

ভৃগু চুপ করে রইল। সব না হলেও ভানুপ্রিয়া তাকে কিছু কথা বলেছে। কিসের আশঙ্কায় সে চলে যেতে চায়। শুধুমাত্র বরেন্দ্রর অশান্তি নয়, আরো এক কারণ আছে। এক তরুণ কাঞ্চনের সন্ধানে আসা যাওয়া শুরু করেছে। তরুনকে তার এতটুকু ভাল লাগেনি। আর চেহারার বর্ণনা দিয়ে যার সন্ধানে তাকে পাঠিয়েছিল? সেকি স্বর্গতঃ মহারাজ বিগ্রহপালের পুত্র? কেন? রাজকুমারের সন্ধান জানার জন্য উতলা হয়েছিল কেন ভানুপ্রিয়া। উদ্দেশ্য কি?

—'ভৃগু।' ডাকল কাঞ্চন।

সে তার ডাক যেন শুনতে পেল না।

—'কি ভাবছো ভৃগু?'

—'ভাবছি।' একটু চিন্তা করল সে। হাসল। মৃদু কন্ঠে বলল, 'আমি তোমার কথাই চিন্তা করছি কাঞ্চন।'

—'আমার কথা?' বিস্মিত হল কাঞ্চন। 'আমার কথা ভাবছো তুমি?'

—'হ্যাঁ। খুবই কষ্ট হচ্ছে তোমার। এই পথশ্রম.....'

—'না-না, সেজন্য নয়।' কাঞ্চন বলল, 'আমার ভালই লাগছে। বিশ্বাস কর। তবে....'

—'তবে কি, কাঞ্চন?'

—'কেন সব ছেড়ে চলে আসা? বরেন্দ্রর আর সব মানুষরাতো এমনভাবে সব ছেড়ে আসেনি? তুমি কিছু জান?'

—'আমি কি জানব?' অসহায় দেখাল ভৃগুকে।

—'তা বটে।' কাঞ্চন মানুষটাকে দেখল। মানুষটার জন্য মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয় তার। মা কোন সময়েই ভাল ব্যবহার করে না। সব সময় একটা দূর-ছাই ভাব। শুধু ভৃগুর সঙ্গেই। যেন মায়ের কাছে কত অপরাধী মানুষটা। সে চিন্তা করেছে। মা তো একটু ভাল ব্যবহার করতে পারে মানুষটার সঙ্গে। পারে না কি? কিন্তু খারাপ ব্যবহারটা বা করে কেন? কারণ কি? চিন্তা করেছে কাঞ্চন। শুধু চিন্তা।

—'কি ভাবছো?' জানতে চাইল ভৃগু।

—'তোমার কথা।' ম্লান হল কাঞ্চনের মুখমণ্ডল। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম ভৃগু।'

—'আমার কথা!' অবাক হল ভৃগু। 'আমার কথা ভাববার মত তো কিছু নেই।

—'নেই বলছো?' স্পষ্ট চোখে ওরদিকে চাইল কাঞ্চন।

—'সত্যই নেই।' মাথা নাড়ল ভৃগু। 'বিশ্বাস কর। নেই।'

গম্ভীর হল কাঞ্চন। তাকে দেখল। বলল, 'দেখ ভৃগু, আমি বহুবার তোমাকে প্রশ্ন করেছি। অনেক সময় তুমি উত্তর যে দাওনি তা নয়, দিয়েছো। আবার অনেক সময় এড়িয়ে গেছ বা চুপ করে থেকেছো, কেন?

শুনে হাসল ভৃগু। বলল, 'উত্তর দেবার মত প্রশ্ন গুলোর উত্তরতো দিয়েছি আমি। কি, দিইনি?' গম্ভীর হল। বলল, 'সব প্রশ্নের উত্তর হয় না।'

—'আমি যে সব প্রশ্ন তোমায় করেছি তা কি উত্তর দেবার মত নয়?'

—'তা কেন?' হাসল। বলল, 'ব্যাপার হচ্ছে.....'

—'তাহলে চুপ করে থাক কেন?' একটু চুপ করে রইল সে। 'ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখছি। অবশ্য দূর থেকে। কখনো কখনো তুমি এসেছ, মা অবশ্য কখনই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। তোমাকে দেখলেই মা রেগে যেত। কেন?

নিঃশব্দে হাসল ভৃগু। বলল, 'ওঃ এই কথা! রাগের মত কাজ করলে মানুষ তো রেগে যাবেই।'

—'কি এমন কাজ তুমি করেছিলে, যার জন্যে.....'

বাধা দিল ভৃগু। বলল, 'তেমন কিছু নয়। আসলে আমার তো কোন কিছুর-ই ঠিক নেই। কি বলে, বিশেষ করে কথার ঠিক নেই। অনেক মিথ্যে কথা বলি তো। আমি খুব মিথ্যেবাদি।'

—'আমাকে যা বলেছো.....'

—'না-না, তোমাকে নয়, সকলকে মিথ্যে কথা বলা যায় না।'

—'সত্যি বলছো?'

—'সত্যি।'

একটু চিন্তা করল কাঞ্চন। আস্তে বলল, 'তুমি আমার কে ভৃগু?'

কাঞ্চনের প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়ল।

কাঞ্চন বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

—'কি মনে হয় না তোমার?'

—'তোমাকে পর বলে মনে হয় না। মনে হয়....কি জানি, তোমার জন্যে বড় কষ্ট হয় আমার। কেন হয়, বুঝতে পারি না। ভৃগু, তুমি জান?'

—'আমি?' কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর। অপলক দৃষ্টিতে সদ্য কিশোরী মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—'ভৃগু।' একসময় ডাকল কাঞ্চন।

—'উঃ।' যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল সে।

—'মাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে কি-না। মা বলেছিল, না। হয়তো তোমার সঙ্গে সত্য সত্যই আমার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু তোমাকে আমার আপনজন বলেই মনে হয়। তোমার জন্য বেদনা বোধ করি। হ্যাঁ, ভৃগু, তোমার জন্য বড় কষ্ট হয় আমার।'

—'কেন?'

—'কি জানি। মনে হয় বড় অসহায় তুমি। আচ্ছা ভৃগু, জীবনে তুমি বোধহয় বন্ধু পাওনি। তুমি-আমি, আমরা দুজনতো বন্ধু হতে পারি ভৃগু?'

—'বন্ধু?'

—'হ্যাঁ, নয় কেন?'

হাসল ভৃগু। তার ভাঙ্গাচোরা মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাঞ্চন তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

আকাশের আলো ম্লান হচ্ছে। গঙ্গার ওপারটা হয়ে উঠেছে ধূসর। আজ সারাদিনই প্রায় রোদের মুখ দেখা যায়নি। কখনো কখনো কালো মেঘের দল ভেসে গেছে। মনে হয়েছে এই বুঝি বর্ষণ শুরু হল।

নীরবতা ভঙ্গ করে একসময় তার নাম ধরে ডাকল ভৃগু।

কাঞ্চন বলল, 'বল।'

—'তুমি এবার যাও কাঞ্চন, তোমার মা নিশ্চয়ই তোমার জন্য চিন্তা করছে।'

—'তুমি?'

—'আমি আর একটু বসে থাকবো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠল সে। চলে গেল। ভৃগু তাকে দেখল। জীবনে এমন ভাল লাগার দিন এই প্রথম। বুকের মধ্যে শিহরণ জাগলো। কি যেন হচ্ছে তার। বার বার উচ্চারণ করল কথাটা, বন্ধু!

দূরে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করল সে। একটা অস্পষ্ট ধূসরতা প্রকৃতিকে গ্রাস করছে। সন্ধ্যা আসন্ন। রাত্রি ঘনাবে। আগামী দিনের....

চমকে উঠল সে। একদল বৌদ্ধ ভিক্ষুককে দ্রুত পথ চলতে দেখেছিল। বরেন্দ্রর সংবাদ জেনেছে পথে। পালবংশের রাজত্বের অবসান ঘটেছে সেখানে। কিন্তু উজ্জ্বল কান্তি দীর্ঘকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুটি.....সেকি ভুল দেখেছিল! ওই মূর্তি তার পরিচিত!

আঠারো

আহারের পর কিছুক্ষণ বসেছিল রামপাল। মন্দিরটি মহাকালের। সয়ম্ভু লিঙ্গ। কিশোরী বলেনি। সঙ্গের আট নয় বছরের বালকটি বলেছিল। কিশোরীর ভাই। মন্দির সংলগ্ন ছোট কুঠরিতে তাকে রেখে কিশোরী বলেছিল, 'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আপনার আহার নিয়ে আসছি।'

চলে গিয়েছিল কিশোরী। মন্দিরের মধ্য দিয়ে কুঠরির দ্বার। ছোট, তবে খুব ছোট নয়। দু-তিনজন মানুষ বসবাস করতে পারে। সে চিন্তা করেছিল। সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে পথ চলছে। চারিদিকে পাহাড়-জঙ্গল। কখনো কখনো গ্রামের দেখা মিলেছে। চিন্তা করেছে, গ্রামে আশ্রয় নেওয়াটাকি তাদের ভুল হয়েছিল? হয়তো। কিন্তু আশ্রয় না নিয়েও কোন উপায় ছিল না।

এক সময় বাইরে কিশোরীর কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। কাকে যেন ডাকছে সে, 'হর্ষ-হর্ষ.......।'

একটু চুপ চাপ।

আবার কিশোরী ডেকেছিল, 'হর্ষ, তুমি কোথায় গেলে?'

কেউ সাড়া দেয়নি।

—'শোন, প্রতিদিন আমি তোমার খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব না।' কিশোরী বলেছিল, 'তুমি যেখানেই থাক বেরিয়ে এসো বলছি।'

একটি হাস্যোজ্জ্বল বালকের মুখ উঁকি দিয়েছিল।

—'তুমি?'

—'চুপ।' ইসারায় বালক তাকে কথা বলতে নিষেধ করেছিল।

কিশোরী এসেছিল। ইসারা করেছিল বালককে। হর্ষ বাইরে চলে গিয়েছিল। কিশোরী তার হাতের পাত্র নামিয়ে রেখে বলেছিল, 'আপনি আহার করে নিন.। হর্ষ রইল। চিন্তা করবেন না।

—'হর্ষ কে?'

—'আমার ভাই। শুনুন, এখানেই বিশ্রাম করুন। যদি কোন প্রয়োজন হয় হর্ষকে বলবেন।'

চলে যাচ্ছিল কিশোরী।

—'শুনুন।' ডেকেছিল সে।

—'বলুন।'

—'আমি যদি বিপদের কারণ হই?'

—'বিপদ।' ক্ষণিকের জন্য চিন্তিত দেখিয়েছিল কিশোরীকে। বলেছিল, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়াই কর্তব্য।'

—'আমার পরিচয়.....।'

—'বিপন্নের পরিচয়ের কোন প্রয়োজন হয় না।'

—'আজ রাত্রেই আমি চলে যেতে চাই।'

—'দিনের মধ্যভাগ এখানো উত্তীর্ণ হয়নি।'

কথার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা নেই। চলে গিয়েছিল কিশোরী।

—'কি হল, তুমি খাচ্ছ না কেন? খেয়ে নাও। তোর পাহারায় দিদি আমাকে রেখে গেছে। চিন্তা কোর না।' বলেছিল বালক।

চমকে উঠেছিল। দিদির উপযুক্ত ভাই। বলেছিল, 'তুমি হর্ষ?'

—'দাদু বলে হর্ষচরিত।' হেসেছিল বালক।

—'দাদু কে?' জানতে চেয়েছিল সে।

—'আছে। গতকাল বাইরে গেছে। আজই ফেরার কথা। দেখতে পাবে'

—'আর হর্ষচরিত?'

—'হর্ষচরিত—তুমি জান না?'

—'না।'

—'সেকি! তুমি হর্ষবর্দ্ধনের নাম জান না? কান্যকুব্জ রাজ হর্ষবর্ধন। বোন রাজশ্রীকে উদ্ধারের জন্য মহারাজ শশাঙ্কের সঙ্গে যার ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল।'

—শুনেছি বটে।'

—'আমিও শুনেছি। দাদুর কাছে।'

—'তুমি হর্ষচরিত হলে কি করে?'

—'তা ঠিক বলতে পারব না। দাদু বলে। কেন বলে তাও জানি না। শোন, তুমি একটু একা থাক। আমি আসছি।'

চলে গিয়েছিল বালক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে ছিল।

—'কোথায় গিয়েছিলে?'

—'ছুটে চারদিকটা একবার দেখে এলাম।'

—'কি দেখতে গিয়েছিলে?'

—'অচেনা মানুষ। এ গ্রামের সকলকেই আমি চিনি। শত্রুর ভয়ে তুমি এখানে আশ্রয় নিয়েছো। দিদি বলেছে।'

—'কি বলেছে তোমাকে তোমার দিদি?'

—'তুমি বিপন্ন। দস্যুর দল তোমাকে খুঁজে ফিরছে। আচ্ছা, দস্যুরা তোমায় খুঁজছে কেন?'

কি বলবে চিন্তা করে উঠতে পারেনি সে।

বিজ্ঞের মত হর্ষ বলেছিল, 'ঠিক আছে, বিব্রত বোধ করার কারণ নেই। বুঝতে পারছি সত্য গোপন রাখতে চাও তুমি'

বালকের তিক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিল। কিশোরীর নাম জেনেছিল, কান্তা।

বালক এক সময় বলেছিল, 'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, সত্য বলবে। কার নামটা শ্রুতিমধুর, আমার, না, দিদির?'

—'তুমি হর্ষ, আর.....'

—'দিদির নাম জান না? বুঝেছি, বলেনি। দিদির নাম কান্তা। আমাদের পিতা রেখেছিলেন। তিন বছর আগে তিনি গত হয়েছেন। আর মা গত হয়েছেন আমার জন্মের পরেই। পিতাই লালন পালন করেছেন আমাকে। এখন বল, কার নামটি শ্রুতিমধুর?'

সমস্যায় পড়েছিল সে। বলেছিল, 'তোমার দাদু কি বলেন?'

—'দাদুর একটু পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে। অবশ্য তার জন্য আমিও কিছুটা দায়ী। পাঠাভ্যাসে খুবই অমনযোগী। সেই জন্যই.....'

—'হর্ষ শব্দটি কিন্তু শ্রতিমধুর।'

—'অন্যে তাই বলে। দাদু স্বীকার করতে চায় না। আর দাদু হল আমাদের প্রপিতামহের বাল্যবন্ধু। অকৃতদার। রাত্রে এই মন্দিরেই থাকে।'

—'সন্ন্যাসী উনি?'

—'না-না, দাড়ি অবশ্য আছে। তবে জটা নেই। গেরুয়া পরে না। না না, কৌপিনটি গেরুয়া দাদুর। আর ঘন ঘন তাম্রকূট সেবন করে। বংশ পরম্পরায় মহাকালের সেবাইত দাদুরা। এবার কি যে হবে?'

—'কি হবে?'

—'বলছি দাদুর দেহান্তের পর কে পূজা করবে মহাকালের?'

—'কেন, তুমি করবে।'

—'আমি কি করে করবো? আমারতো উপবীত হবে না। উপবীত হয় ব্রাহ্মণ সন্তানের। আমরা ক্ষত্রিয়।'

—'ক্ষত্রিয় তোমরা?'

—'হ্যাঁ। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। শুনেছি শশাঙ্ক পুত্র মানবের বংশধর আমরা। আমাদের এক পূর্ব পুরুষ গৃহবিবাদে জর্জরিত অবস্থায় প্রাণরক্ষা করার জন্য কর্ণসুবর্ণ থেকে এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দাদুদের পূর্ব পুরুষের কাছে।'

—'এসব কথা তুমি কোথায় শুনলে?'

—'মন ভাল থাকলে দাদুই বলে। বৃদ্ধ খুবই আবেগপ্রবণ।' নীরবে কিছু শোনার চেষ্টা করেছিল বালক। বলেছিল, 'শোন, আমি চললাম। আমার খেলার সঙ্গীরা আসছে।'

চলে গিয়েছিল হর্ষ। সামান্যক্ষণ পরেই কলকণ্ঠের শব্দ ভেসে এসেছিল। বসে বসে অস্থির হয়েছিল সে। যদি হর্ষের খেলার সঙ্গীরা কেউ এসে পড়ে। কিন্তু কেউ-ই মন্দিরের কাছে আসেনি।

বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সচকিত হয়েছিল অশ্ব ক্ষুরধ্বনির শব্দে।

—'এই শোন, তোমরা এদিকে এসো।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

তার বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠেছিল।

—'তোমরা এখানে কতক্ষণ আছো?'

—'বহুক্ষণ, কেন?' হর্ষের প্রশ্ন।

—'এদিকে কেউ এসেছে দেখেছো?'

—'কে আসবে?

—'এক তরুন।'

—'অশ্বারোহী?'

—'না-না, পদব্রজেই সে এসেছে।'

—'না, এদিকে কোন তরুনকে আসতে দেখিনি। এই তোরা দেখেছিস?'

—'না-না।' সমস্বরে বলেছিল বালকের দল।

—'কিন্তু আমরা সংবাদ পেয়েছি সে এদিকেই এসেছে।'

—'আসতে পারে, তবে আমরা কোন তরুনকে দেখিনি। তোমরা গ্রামে খুঁজে দেখতে পার।'

অশ্বারোহীর দল চলে গিয়েছিল। বালকরা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। শেষ হয়েছিল খেলা। সামান্য পরেই আবার অশ্বের শব্দ শোনা গিয়েছিল। প্রশ্ন, 'এই তুমি ওখানে কি করছো?'

—'বসে আছি।'

—'তোমার খেলার সঙ্গীরা গেল কোথায়?

—'সকলে বাড়ি চলে গেল।'

—'তুমি যাওনি কেন?'

—'আমি মন্দির পাহারা দিচ্ছি। দাদু স্থানান্তরে গেছে। এটা আমার কাজ।'

—'কাজ! ভাল। তোমার নাম কি?'

—'হর্ষ।'

—'এ মন্দির কি তোমাদের?'

—'না, আমাদের নয়। দাদু উমানাথ এ মন্দিরের সেবাইত।'

—'তুমি তাঁর নাতি?'

—'নাতির মতই।

—'বুঝলাম না।'

—'দাদু ব্রাহ্মণ, আমরা ক্ষত্রিয়।'

—'শোন, যা সংবাদ পাওয়া গেছে, তরুন এদিকে এসেছে। নিশ্চয়ই সে এখানে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।'

—'কোথায় আশ্রয় নিয়েছে, এই মন্দিরে?'

—'সে কথা বলছি না। নিতান্ত বালক তুমি, কথা বলছো বয়স্কদের মত।'

—'সকলেই তাই বলে। যদি সন্দেহ হয় মন্দিরের ভেতরটা দেখে নিতে পার। পাশেই একটা ছোট কক্ষ আছে। পলাতক তরুন ওখানে আশ্রয় নিতে পারে।'

—'মন্দিরের মধ্যে দিয়েই কি পাশের ঘরে যেতে হবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে থাক।'

—'থাকবে কেন? আমি তো যাই। আমার সঙ্গে এসো আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

সামান্য চুপচাপ। অশ্বারোহী চলে গিয়েছিল।

সামান্যক্ষণ পরে উঁকি দিয়েছিল হর্ষ। প্রশ্ন করেছিল, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে তো?

—'তুমি দুঃসাহসী।' বলেছিল সে।

—দুঃসাহস? দুঃসাহস হতে যাবে কেন?' হর্ষ তার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলেছে, 'এসব আমাকে দাদু শিখিয়েছে। দাদু বলে মিথ্যা কথা বলবে না, অপরকে হিংসা করবে না, লোভকে দমন করার চেষ্টা করবে আর নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবে, কখনো হতাশ হবে না।'

—'দাদু তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু অবলীলায় তুমি মিথ্যা কথা বলে গেলে।'

প্রথমে বুঝতে পারেনি বালক। পরক্ষণে বলেছিল, 'ওঃ তাই বল। আমি ভাবলাম...... দেখ, তুমি বিপদগ্রস্ত। আশ্রয় নিয়েছো আমাদের কাছে। তোমাকে রক্ষা করাইতো আমার প্রধান কর্তব্য। যাক, তুমি বিশ্রাম কর। আমি একটু ঘুরে দেখি।'

চলে গিয়েছিল হর্ষ। রামপাল নীরবে বসেছিল। হর্ষ বালক কিন্তু তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন।

অনেকক্ষণ পরে হর্ষর কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিল সে। বাইরে তখন দ্বিপ্রহর। কক্ষটির কোন গবাক্ষ নেই। অনেক ওপরে কটি ফোকর। সেখান দিয়ে আলো বাতাস আসছে।

হর্ষ এসে বলেছিল, 'একটা সংবাদ দেবার জন্য এলাম।'

সে বালকের মুখের দিকে চেয়েছিল।

—'তোমার সন্ধানে যারা এসেছে, তারা এই গ্রামেই রয়েছে।'

নীরব ছিল সে।

বালক বলেছিল, 'অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তারা, কিন্তু কেউ-ই তোমার সংবাদ দিতে পারেনি। ওরা চলেও গিয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আবার ফিরে এসেছে। দিদি আমাকে সেইজন্যই পাঠাল। তুমি ভুল করেও বাইরে বেরুবার চেষ্টা কোর না।

—'আচ্ছা।'

—'আর......' ইতস্তত করছিল হর্ষ।

—'বল।'

—'দ্বিপ্রহরে আজ হয়তো অভুক্ত থাকতে হবে। কারণ ওদের কয়েকজন ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের মধ্যে। কেউ যদি শুধুমাত্র ঘুরে বেড়ায় বা গ্রামের কোথাও অবস্থান করে, তাকে তো কিছু বলা যায় না। দিদি খুবই দুঃখিত।'

—'তোমার দিদিকে দুঃখিত হতে নিষেধ করো। আহার আমি তো করেছি।'

—'করেছো, কিন্তু তা খুবই সামান্য।'

—'তাতে আজকের মত আমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি শুধু আমাকে জানিও ওরা গেছে কি না।'

—'জানাব। ওদের দলপতির নাম বিপ্র। আমার সঙ্গে কথা বলেছিল সে। দেখতে খুবই শান্ত প্রকৃতির। তোমার সঙ্গে তার কিসের শত্রুতা?'

—'আমার সঙ্গে তার কোন শত্রুতা নেই।'

—'তাহলে তোমার সন্ধানে সে ফিরছে কেন? সঙ্গে অন্ততপক্ষে বিংশতি অনুচর।

—'আমি জানি না।'

বালক সামান্যক্ষণ নীরব রইল। একসময় প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

—'আমি?' চমকে উঠল সে।

—'তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছো? যাবে কোথায়?'

শুনে হেসে ফেলেছিল সে।

—'হাসছো তুমি?' বালকের কণ্ঠে বিস্ময়।

সে বলেছিল, 'যাব মগধে। আসছি কোথা থেকে, আর নাম, যাবার সময় জানিয়ে যাব।'

বালক আর কোন প্রশ্ন করেনি। চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে সময় পার হয়েছে। এককথায় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কারো কর স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল রামপালের। চোখ মেলে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল। পরণে সাধারণ পোষাক। স্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোয় কিছুটা আলোকিত।

—'আমি উমানাথ, এ মন্দিরের সেবাইত। আপনি?'

—'আমি রামপাল।'

বৃদ্ধ তার দিকে চাইলেন। 'নিবাস?'

—'বরেন্দ্র।'

—'পাল বংশের সঙ্গে......'

—'স্বর্গত মহারাজ বিগ্রহপালেব কনিষ্ঠ পুত্র আমি।'

—'মহারাজ মহীপাল বরেন্দ্র বিদ্রোহে নিহত হয়েছেন।'

—'শুনেছি।'

—'শুনেছেন। আপনি কি....'

—'আমি কারারুদ্ধ ছিলাম। আমার মধ্যম ভ্রাতাও।'

—'আশ্চর্য! মুক্তি পেলেন কেমন করে?'

হাসল রামপাল। বলল, 'আপনি বয়জ্যোষ্ঠ, সম্মানীয়, আমাকে আপনি সম্বোধন করবেন না।'

—'সম্মানীয়কে সম্মান জানান কর্তব্য। আপনি রাজকুমার।'

—'ছিলাম এক সময়।'

—'পরিচয় মুছে ফেলতে চাইছো?'

—'অনাবশ্যক পরিচয়ের কি কোন মূল্য আছে?'

হাসলেন উমানাথ। উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে তাঁর কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুমার তুমি মগধে যেতে চাও?'

—'সেই উদ্দেশ্যেই যাত্রা। জানি না....' চুপ করে গেল সে।

তিনি বললেন, 'শুনলাম তোমার একজন সঙ্গী ছিল। সে নাকি ধরা পড়েছে। যারা তোমার সন্ধানে পশ্চাৎ ধাবন করেছে, তারা কারা?'

—'শুনেছি দিব্য তাদের পাঠিয়েছে।'

—'বুঝলাম।' চিন্তিত হলেন উমানাথ। বললেন, 'তোমার অনুসন্ধানকারীরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে। তবে আমার মনে হয়....' চুপ করলেন তিনি।

সে তাঁর মুখের দিকে চাইল।

—'তারা যায়নি। আত্মগোপন করেছে মাত্র।' একটু নীরব থেকে তিনি বললেন, 'তুমি চিন্তা কোর না। আমাদের গ্রামটি খুবই ছোট। তুমি যে মহাকালের মন্দিরে আত্মগোপন করে আছ এ সংবাদ এখনও গ্রামবাসীরা জানে না। আমি চললাম। সকলকে তো'ম'. কথা বলতে হবে।'

—'জানিয়ে দেবেন!'

—'হ্যাঁ, তোমার মঙ্গলের জন্য।' উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ।

—'শুনুন।' মৃদু কণ্ঠে ডাকল সে।

—'বল।' তার দিকে চাইলেন তিনি।

—'আপনাদের বিপদগ্রস্ত করা আমার উচিৎ হবে না।'

—'কি করতে চাও তুমি?'

—'আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি।'

বৃদ্ধ তার দিকে চাইলেন। বললেন, 'মগধের পথ কি তোমার পরিচিত?'

—'না।'

—'তাহলে কেমন করে যাবে? পথের সন্ধান নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে হবে তোমাকে?'

—'হ্যাঁ।'

—তাহলে তো মগধে পৌঁছান কোনদিনই তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শোন, চিন্তা কোর না তুমি। রাত্রে মন্দিরেই থাকি আমি। আসবো।' চলে গেলেন তিনি।

বসে আছে সে। মন্দিরের প্রজ্জ্বলিত আলো এসে পড়ছে এখানে। উমানাথের কথা চিন্তা করল। মনে পড়ল ত্রৈলোক্যের কথা। কষ্ট হল তার। সে বুঝতে পারছে না মগধে পৌঁছান তার পক্ষে সম্ভব হবে কি না।

মনে পড়ল জননীর কথা। দস্যু দিব্য এখন বরেন্দ্রর রাজা। ভাগ্য! যে মাত্র কিছুদিন আগেও ছিল একজন দস্যু, আজ সে বরেন্দ্রবাসীর ভাগ্য বিধাতা। না দিব্যর ভাগ্যকে সে ঈর্ষা করতে পারল না। ভাগ্যতো গোপালকেও রাজপদে অভিসিক্ত করেছিল। পুরুষানুক্রমে অস্ত্র ব্যবসায়ী গোপাল হয়েছিলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মপাল, দেবপাল আর্যাবর্তে পালবংশের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। পালবংশের গৌরবের স্বর্ণযুগ। আবার দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল পিতৃব্যের সিংহাসনে বসেছিলেন। অপুত্রক ছিলেন না দেবপাল। তাঁর পুত্রের নাম রাজ্যপাল। তিনি পিতৃ সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, না তাঁর মৃত্যু হয়েছিল জানা যায় না। তবে দেবপালের মৃত্যুর পর থেকেই পাল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত। গৃহবিবাদের শুরু। হৃত গৌরব কিছুটা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন প্রথম মহীপাল। দ্বিতীয় মহীপাল পালরাজ্য ধ্বংস করলেন। গোপালের সিংহাসনে এখন একদা বরেন্দ্রর ত্রাস দস্যু দিব্য। মগধে এখনও পালরাজ্য টিকে আছে। যদিও আয়তনে তা ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। মধ্যম ভ্রাতা শূরপাল মগধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। সেও যাচ্ছে। কিভাবে তাদের বন্দী মুক্তি ঘটল, রহস্যাবৃত। নেপথ্যে কারা তা বোধহয় কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না!

আচ্ছা, চিন্তা করল সে। কি প্রয়োজন তার মগধে যাবার। সেতো জনারণ্যে মিশে যেতে পারে, অসংখ্য সাধারণ মানুষের একজন হয়ে উঠতে পারে। পারে না কি?

একদিন তো পেরেছিল। একজন বিশ্বাস করেছিল, সে একজন সাধারণ মানুষ। তার চোখের তারায় দেখেছিল এক আশ্চর্য্য দ্যুতি। কাঞ্চন!

অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ নিয়ে জননীকে জানিয়েছিল কাঞ্চনের কথা। তিনি নীরব দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অস্বস্তিবোধ করেছিল সে।

এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করেছিলেন জননী। একটি একটি করে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সেদিন সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। একসময় তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'তুমি কি কিছু স্থির করেছ?'

—'কি স্থির করবো?' অবাক হয়েছিল।

—'তুমি কি তাকে গ্রহণ করতে চাও?'

জননীর প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, 'আমি তো কিছুই চিন্তা করিনি।'

—'কেন করনি?'

—'আমি তোমার কাছে কোন কথাই গোপন করি না। সেই জন্যই বললাম। তা ভিন্ন....'

জননী তার মুখের দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন।

—'আমি আমার সত্য পরিচয় গোপন করেছি।' সে বলেছিল, 'সে জানে আমি খুবই সাধারণ ঘরের সন্তান, দীন দরিদ্রও বলতে পার।'

—'কেন তুমি তোমার সত্যকার পরিচয় গোপন করলে পুত্র?'

—'রাজকুমারের পরিচয়ে পরিচিত হতে আমার সঙ্কোচ জাগে। সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবন যাত্রায় আমি আকর্ষণবোধ করি, অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চাই।'

—'কেন?'

—'আমি স্বাধীনতার প্রয়াসী। রাজবেশে বন্দী বলে মনে হয় নিজেকে। মানুষের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে।'

জননী কথা বলেননি। নীরবে তাকে দেখেছিলেন। এক সময় তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, 'তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা সৃষ্টি করতে চাই না পুত্র। তবে কুলধর্ম রক্ষার দায়িত্বভারও অস্বীকার করতে যেও না।'

জননী অনেক কথাই বলতেন। তবে তার কোন কাজে কখনো বাধা সৃষ্টি করেননি।

আর কাঞ্চন। সদ্য কিশোরী মেয়েটি। আশ্চর্য এক পবিত্রতা ছিল ওর চোখে মুখে। দৃষ্টির গভীরতা মুগ্ধ করতো। বিশ্বাস, সরলতা ছিল প্রদীপের আলোর মতই। মনে হত....

—'শুনছেন?'

কণ্ঠস্বরে ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। সামনে দাঁড়িয়ে কান্তা। বিহুল দৃষ্টিতে কান্তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সঙ্কুচিত হল কান্তা। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আহার করে নিন। রাত্রি হচ্ছে।'

কান্তা কখন এসেছে, সামনে আহার্য সাজিয়ে দিয়েছে, সে কিছুই জানতে পারেনি। বলল, 'তুমি কখন এলে?' লজ্জিত হল। 'আমি বলছি, আপনি........'

—'আপনি গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন। জানতে পারেননি।' হাসল কান্তা বলল, আমাকে তুমিই বলুন।

—'তোমার দাদু.....' সঙ্কোচ হচ্ছে তার।

—'তিনি আসবেন। আপনাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন।'

—'আমার অনুসন্ধানকারীরা?'

—'তারা এ গ্রাম ত্যাগ করেছে।'

উমানাথের কাছে এ সংবাদ শুনেছে। বলল, —'আচ্ছা, তাদের সঙ্গে কি কোন বন্দী যুবক আছে? শীর্ণ চেহারা। তার.....'

—'আমি তাদের দেখিনি।' কান্তা বলল, 'তবে তারা সন্দেহ করছে আপনি আমাদের গ্রামেই আত্মগোপন করে আছেন।'

. কান্তাকে দেখল সে। সুশ্রী। মুখে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট।

—'কুমার।' কান্তা ডাকল।

সে তার মুখের দিকে তাকাল।

—'আপনি সমস্তদিন অভুক্ত আছেন। আহার করে নিন। বাইরে জল রাখা আছে। হাত মুখ ধুয়ে আসুন।'

বাইরে বেরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আহারে বসল সে। ত্রৈলোক্যের কথা মনে পড়ল। মহারাজ দিব্য কি পালবংশের রমণীদের নিষ্কৃতি দিয়েছে। রোহিণী আছেন। অতি বৃদ্ধা হলেও তিনি সিংহিনী। অন্তঃপুরিকাদের সম্ভ্রম বিপন্ন হতে তিনি দেবেন না। যদি......

—'কুমার, আপনি কিছুই আহার করছেন না।'

সচকিত হল সে। কান্তাকে দেখল। হঠাৎ হাসি ফুটল তার মুখে।

—'কি হল?' বিস্মিতা হল কান্তা।

—'একটা কথা মনে পড়ল।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রামপালের মুখের দিকে তাকাল কান্তা।

—'কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অবিশ্বাস্য।'

—'বুঝলাম না।' হতচকিত কান্তা।

—'বুঝলে না?' তার কথায় রহস্যের ছোঁয়া।

মাথা ঝাঁকাল কান্তা। কিছুটা বিমূঢ় সে।

—'আমার সত্য পরিচয় জেনেছো। আস্তে বলল রামপাল, পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের বংশধর আমি। নিরাশ্রয়, বিপন্ন। আর আমাকে আশ্রয় দিল, মহারাজ শশাঙ্কের বংশের এক কন্যা।' কথা শেষ-করে হাসল সে।

বিব্রত হল কান্তা। বলল, 'এ আপনি কি বলছেন?'

—এইতো সত্য?'

—'সত্য!' অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। একসময় মৃদুকণ্ঠে সে বলল, 'দেখুন আমার পিতা পিতামহেরা যে সত্য সত্যই মহারাজ শশাঙ্কের বংশধর ছিলেন এ দাবি আজ, এতদিন পরে, করি কেমন করে? করা উচিৎ কি? আপনি কি বলেন?'

—'আমি?' বিব্রতবোধ করল সে। কান্তাকে দেখল।

—'আর এ দাবি করে লাভ কিছু আছে?' কান্তা মাথা নিচু করে নিল।

—'নেই বলছো?' ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে।

—'আমার তাই মনে হয়। পিতাও বলতেন।'

—কি বলতেন তিনি?'

—'বলতেন.....' চুপ করে গেল কান্তা।

—'কি হল, বলবে না?'

—'তিনি বলতেন বংশপরিচয় আঁকড়ে থাকলে আত্মঅহমিকা বাড়ায়।

শুনল সে। কান্তাকে দেখল। কিশোরী কন্যা, ধীর শান্ত কিন্তু মর্যাদা সম্পন্না। শশাঙ্ক পুত্র মানবের বংশে জন্ম। শশাঙ্ক! বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁর বংশ বা বাল্য জীবন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। অনুমান শশাঙ্ক মহাসেন গুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। পরে তিনি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (৬০৬ অব্দের পূর্বে)। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও তিনি জয় করেন।

শশাঙ্কের পূর্বে কোন বাঙ্গালী রাজা তাঁর মত বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। প্রায় বত্রিশ বছর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু (৬৩৭ অব্দে)। তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। একাধিক রাজা গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেউ একমাস, কেউ মাত্র এক সপ্তাহ।

শশাঙ্ক পুত্র মানবদেব আট মাস পাঁচ দিন গৌড়ের সিংহাসনে বসে রাজত্ব করেছিলেন। সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন, না, গুপ্ত শত্রু দ্বারা নিহত হয়েছিলেন তিনি, সে সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না।

রামপাল কান্তাকে একটু চেয়ে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, 'মহাকালের প্রতিষ্ঠাতা কি তোমাদেরই কোন পূর্বপুরুষ না এ মন্দির এবং দেবতা আগে থেকেই ছিল? জান কিছু?'

সামান্যক্ষণ নীরব রইল কান্তা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুনেছি আমাদেরই এক পূর্ব পুরুষ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাদুর পূর্বপুরুষরাও তাঁদের সঙ্গে কর্ণসুবর্ন থেকে এখানে এসেছিলেন।'

—'এমনই অনুমান করেছিলাম আমি'। বলল রামপাল।' শুনেছি মহারাজ শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। এখন দেখছি তাঁর বংশধররাও। আর....'

কান্তা তার মুখের দিকে চাইল।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল রামপালের ওষ্ঠে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার কি জান? শুনেছি মহারাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধদের শত্রুজ্ঞান করতেন। অনেক অত্যাচারও নাকি বৌদ্ধদের ওপর করেছেন। অথচ শুধুমাত্র রাজধানী কর্ণ সুবর্ণে নয়, তাঁর রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল। এটা কেমন করে সম্ভব হল আমি বুঝতে পারি না।'

—বুঝতে না পারার মত কারণতো আমি কিছু দেখছি না।'

—'দেখছো না?' বিস্মিত হল সে।

—'আজ্ঞে না। মহারাজ শশাঙ্ক শৈব ছিলেন, শিবের ভজনা করতেন তিনি। তাই বলে প্রজারা বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে রাজার ধর্ম গ্রহণ করবেন, এমন হয় নাকি? আর বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত—হতেই পারে। হয়তো হয়েছিল। তবে ধর্ম নয়, মানুষ-ধর্মের মানুষ নয়, মানুষের ধর্ম।'

—বাঃ!'

—'কি হল?'

—'তুমি তো খুব সুন্দর কথা বল।'

—'কথা বলি। সুন্দর কি-না জানি না। দাদুর কাছে শুনিতো। উনি খুব সুন্দরভাবে বোঝান-শেখান।' কান্তা খুবই সহজভাবে কথাগুলো বলল। 'কিন্তু আপনি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করবেন, না খাবেন?'

—'খেতে ইচ্ছা করছে না আর।'

—'সেকি?! আপনিতো প্রায় কিছুই খাননি। সমস্ত দিন এক রকম অভুক্ত আছেন। খেয়ে নিন। অবশ্য রাজার ছেলে আপনি। এসব অখাদ্য খাওয়ার অভ্যাসতো নেই। আর আমাদের এখানে ভাল জিনিস একরকম পাওয়াই যায় না। পাহাড় আর বনজঙ্গলের দেশের মানুষ আমরা।'

কান্তা কথা বলছে। তার দিকে চেয়ে আছে রামপাল। প্রদীপের মৃদু আলোয় অস্পষ্ট তার মুখ। সুন্দরী নয়, ভাল লাগছে ওর বাচনভঙ্গি। মৃদু অথচ সুন্দর কণ্ঠস্বর। কান্তা চুপ করতে সে বলল, 'থামলে কেন?'

বিস্মিত হল কান্তা। তার দিকে চাইল।

রামপাল বলল, 'তোমার কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছিল। বুঝতে পারছি জ্ঞানের পরিধি তোমার কম নয়। তোমাদের দাদু অনেক কিছুই শিখিয়েছেন।'

লজ্জিতা হল কান্তা। নীরব রইল।

রামপাল বলল, 'তোমার জন্য রক্ষা পেয়েছি সত্য। চিন্তা, আমার জন্য বিপদে না পড় তোমরা।'

—'একথা বলছেন কেন?' মৃদু কণ্ঠে বলল কান্তা।

—'বলছি।' একটু চুপ করে রইল সে। বলল, 'আমার সন্ধানে যারা এসেছে, তারা যদি আবার ফিরে আসে। যদি....'

কান্তা তার মুখের দিকে চাইল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ও কথা এখন থাক। আপনি খেয়ে নিন।'

উনিশ

একটি বর্ষণ ক্লান্ত দিন। কদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। কখনো জোরে, কখনো আস্তে। সূর্য ওঠেনি। গতরাত্রে প্রবল বর্ষণ হয়েছে। মেঘের গর্জনে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল মানুষের। বাতাস হয়েছিল উদ্দাম।

তরঙ্গময়ী শয্যা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ঘুম নামেনি তার চোখের পাতায়। অনেকদিন হল নিদ্রা চলে গেছে তার চোখ থেকে। সেইদিন.....যেদিন, না, সেদিনের সেই পৈশাচিক দৃশ্যটার কথা মনে পড়লে আতঙ্কে শিউরে ওঠে সে। সম্পদ ছিল তার শরীর, আজ শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে গেছে। এই শরীরটা মহারাজকে তৃপ্ত করতো, এই শরীরটা.....

বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি অনুভব করল সে। আহার, নিদ্রা দুই-ই চলে গেছে। ভুল করেছিল, মহাপাপ। তার প্রায়শ্চিত্ত করছে। তাই কি? চিন্তা করল সে। কিন্তু এ জীবনতো সে চায়নি।

লোহিত। লোহিত তার জীবনের রাহু। সে তাকে নরকে নিয়ে এসেছিল। না, সে নিয়ে আসে নি, সে নিজেই এসেছিল। ভালবেসেছিল লোহিতকে। স্বপ্ন দেখেছিল। ভুল করেছিল।

একজন মানুষ। লোহিত নামের মানুষটা। যাকে সে পরে ঘৃণা করেছে। যার পুরুষত্ব সম্পর্কে কটূক্তি করতে বাধে নি। বহুবার, বহুভাবে তাকে প্রলোভিত করতে চেয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে বার বার। বুঝতে পেরেছে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে মানুষটা তবু সংযম হারায়নি। অপরাধিনী তার মা শেষ দিন প্রকাশ করেছিল সে। মায়ের পরপুরুষে আসক্তি তাকে নারী বিদ্বেষী করে তুলেছিল। বিদ্বেষী নয়—বর্জণ করেছিল। ভোগের স্পৃহাকে দমন করেছিল।

তাহলে মহারাজের জন্য কেন সে নারী সংগ্রহ করেছে? কেন? সদুত্তর দিতে পারেনি লোহিত। কেন সে চাটুকারিতা করে গেল—কিসের প্রত্যাশায়? সংসারে একা একজন। প্রয়োজন কতটুকু?

সেদিন অসহায় দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়েছিল সে। বলেছিল,'তরঙ্গ তোর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমি একজন হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম।'

—'একজন! কোন সে জন?'

ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল তার ওষ্ঠে। বলেছিল, 'যাদের কিছু নেই তারা বড় বেশি স্বপ্ন দেখে তরঙ্গ।'

—'তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে?'

—'কেন দেখব না। স্বপ্ন দেখেই তো বেঁচে ছিলাম রে। মহারাজ বিগ্রহপালের সন্তান, কুমার মহীপালের বন্ধু হয়ে উঠেছিল সামান্য এক কর্মচারীর সন্তান লোহিত। রাজকুমারের বন্ধু হয়ে ওঠার মত কোন যোগ্যতা ছিল লোহিতের? ছিল না। পোষা কুকুর দেখেছিস তরঙ্গ? মনিবকে খুশি করার জন্য কি কাণ্ডটাই না করে। আমি কুমার মহীপালের পোষা কুকুরে পরিণত হয়েছিলাম। তাঁর মনোরঞ্জনের কথা চিন্তা করা ছাড়া আর কিছু চিন্তা ছিল না আমার। শুধু আমার বলি কেন তরঙ্গ, এ সংসারে আমার মত কত শত—সহস্র জন আছে। কেউ স্বার্থে করে, কেউবা স্বপ্নের ঘোরে। আর.....'

একটু চুপ করেছিল লোহিত। ম্লান কণ্ঠে বলেছিল, বাল্যের স্মৃতি একটি দিনের জন্যও আমি ভুলিনি। অহরহ আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, দগ্ধ করেছে। আমার স্বৈরিণী মা। যে মাকে আমার পিতা অন্ধ আক্রোশে শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন। আমার মনেও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতো। আমি মনে করতাম.....না তরঙ্গ, সকলে নয়, সংসারে ব্যতিক্রম আছে রে। কুমার মহীপালের কাছে ধর্ষিতা অনেক নারী লজ্জায় ও অপমানে আত্মহত্যাও করেছে।'

—'তবু তোমার চেতনা হয়নি?'

—'চেতনা? কি জানি।' একটু স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। মুখ তুলেছিল। তাকে দেখেছিল। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'অনেক পরে।'

—'কি?'

—'তোকে দেখার পর।'

—'তুমি একটা পশু।'

—'তাই। পুরুষ পশু চায় নারীদেহ। তোর শরীর দেখে আমি মোহিত হয়েছিলাম।'

—'তুমি পশুরও অধম।'

—'হয়তো তাই।'

—'তুমি আমার সর্বনাশ করেছো।'

—'করেছি। অস্বীকার করি না। কিন্তু তুই আত্মহত্যা করসনি। আমাকে শুধু অভিশাপ দিয়েছিস। আর আমি তোর কোন অহীত করিনি। তুই আশ্রয় কামনা করেছিলি, আমি তোর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। তোর যৌবন ব্যর্থ হতে দিইনি। মন কাঁদলেও শরীর তৃপ্ত হয়েছে। প্রতিদানে নরকে পাঠাতে পারিস আমাকে।'

শুনে ঘৃণায় বুকের মধ্যেটা রি-রি করে উঠেছিল তার। সত্যই সে আত্মহত্যা করতে পারেনি। তাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন মহারাজ।

অবলম্বন করেছিল আর একজন। দিব্য! না, সেদিন আত্মপরিচয় সে দেয়নি।

রাজধানীতে প্রতিদিনই একটা না একটা অঘটন ঘটছে তখন। সৈনিক, রাজকর্মচারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে কারা। চারিদিকে অশান্তি। একজন এল। এক প্রৌঢ়। শয়নকক্ষে তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল সে। তখন সন্ধ্যা।

—কে আপনি?' ভয় পেয়েছিল সে।

—'পরিচয় দিলে চিনতে পারবে না। শান্ত হও।'

—'আপনি কি করে এখানে প্রবেশ করলেন?'

মৃদু এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল তাঁর ওষ্ঠে।

—'আপনি আমর কাছে এসেছেন কেন?'

—'প্রয়োজনে।'

—'প্রয়োজন! কি প্রয়োজন?'

—'শান্ত হও। আসন গ্রহণ করো। সব কথাই বলবো। তোমার সাহায্য চাই।'

—'আমার সাহায্য। আমি.......'

—বলব। 'একটু স্থির হও।'

আসন গ্রহণ করেনি তরঙ্গ। ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল বুকের মধ্যে। লোকটি একে একে সব কথা বলেছিল। বরেন্দ্রর সামন্ত রাজারা বিদ্রোহের আয়োজন করছে। যে কোন মূহুর্তে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারে রাজ্য। একটা যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। রাজ্যের মন্ত্রীরা চাইছেন বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে সন্ধি। তাঁরা যুদ্ধ চান না। মহারাজকে সম্মত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মহারাজ যেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত না হন।'

—'একি বলছেন আপনি?'

—'বলছি।'

—'সেটা কেমন করে সম্ভব?'

—'সম্ভব যাতে হয়, তার জন্যই তোমার কাছে আসা।'

—'আমি কি করতে পারি?'

—'তুমি অনেক কিছুই করতে পার। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে। আমাদের সাহায্য করতে হবে তোমাকে। বরেন্দ্রর প্রজাদের রক্ষার দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে।'

—'আমি......আমাকে.....দিশাহারা হয়েছিল তরঙ্গ। আগন্তুককে বারবার দেখেছিল। তিনিও দেখেছিলেন তাকে। বিভ্রান্ত হয়েছিল সে। তার বুকের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। মহারাজ মহীপালের রক্ষিতা তরঙ্গর যেন জন্মান্তর ঘটেছিল। আর সে সময় ভাগ্যও সহায় হয়েছিল তার। বিপর্যস্ত মহারাজ আশ্রয় খুঁজেছিলেন তার কাছে।

রাজ্যের অভিজাত বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের সন্ধি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন মহারাজ। ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল দিব্য। দস্যু দিব্য! যোগাযোগকারী লোহিত। তাওতো তরঙ্গের ব্যবস্থা মত। পরিকল্পনা তার নয়, সে শুধুমাত্র চালিত হয়েছিল। তার মনে সন্দেহ জেগেছিল। প্রশ্ন করেছিল, 'মহারাজকে নিয়ে কি করবেন?'

—'মহারাজকে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

—'হত্যা করবেন?'

—'হত্যা না করে কি কিছু করা যায় না?'

—'আমি জানতে চাইছি।' বলেছিল তরঙ্গ।

—'নিশ্চয়ই জানবে। মহারাজ তাঁর দুই ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে।'

—'অর্থাৎ তাঁকে বন্দী করে রাখবেন?'

—'তাই স্থির হয়েছে।'

বিশ্বাস করেছিল তরঙ্গ। রাজ্যের মঙ্গলকারী বিদ্রোহীদলের এই মানুষটাকে চিনতে পারেনি সে। দস্যু দিব্য সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা তার ছিল না। এখন চিন্তা করলে তার মনে হয়, এমন হয় নাকি! কোনদিন সম্ভব কি! যদি কেউ শোনে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। একজন সামান্য রক্ষিতা অনেক কিছুই ওলট পালট করে দিয়েছে। অত্যাচারী শাসকের শাসনের অবসান ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দূর-দূর।

আর লোহিত কে, যে লোহিত তার সর্বনাশ করেছিল, তাকেও দূর করে দিতে চেয়েছিল। মহারাজ সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই নিরুদ্দেশ হয়েছিল সে। রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে গিয়েছিল। তার সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

উদ্যানবাটিতে তার এই যে আশ্রয় লাভ, এতো তারই পরিকল্পনা। না, তার নয়, দিব্যর পরিকল্পনা। সে শুধু.....পুরুষের উদীপ্ত কামনার সুযোগ গ্রহণ করেছে। তার নারী শরীর, যে শরীরে মহারাজ খুঁজে পেয়েছিলেন.....গাটা গুলিয়ে উঠল তার। একটা মৃত শব কক্ষে আবদ্ধ হয়ে কটাদিন পড়েছিল, একটু একটু করে পচন ধরেছিল শব শরীরে—সেই শরীর....

দু'হাতে মুখ ঢাকল তরঙ্গ। সেদিনটা মূর্ত হয়ে উঠল মুহুর্তে। যুদ্ধে পরাজিত মহারাজ রাত্রির অন্ধকারে গোপনে উদ্যানবাটিতে এসেছিলেন। ছদ্মবেশী মহারাজকে চিনতে পারেনি সে।

—তরঙ্গ, আমাকে চিনতে পারলে না তুমি? 'যেন আর্তনাদ করে উঠেছিল মহারাজের কণ্ঠস্বর।

কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পেরেছিল। বলেছিল, 'আপনি!'

—'হ্যাঁ, তরঙ্গ। দিব্য আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার অনুচররা রাজ সৈন্যদের যুদ্ধ করতে বাধা দিয়েছে। বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে। আমি পরাজিত হয়েছি।

—'এখন কি করবেন?'

—'এখন আমার আর কিছুই করার নেই। আমি বরেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যাব। দু একটা দিন এখানে লুকিয়ে থাকতে চাই।'

—'যদি.....'

—'সে সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। নগর অধিকার করে বিদ্রোহীরা নিশ্চয়ই এখানে আসবে। জানি আমি। তবে আমার সন্ধান তারা পাবে না।'

—'পাবে না?'

—'না। তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। যদি না তুমি আমার সন্ধান তাদের জানিয়ে দাও।'

তরঙ্গ নীরব ছিল।

মহীপাল বলেছিলেন, 'বরেন্দ্র ত্যাগ করতে দুটি দিন সময় লাগবে আমার। আমার কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর আছে। রাজ্য ত্যাগের ব্যবস্থা তারাই করবে। তুমি কি করবে আমি জানি না।'

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' কথা দিয়েছিল সে।

উদ্যান বাটির গোপন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন মহারাজ। বিশ্বাসঘাতিনী সে হয়নি। দিব্য মহারাজের সন্ধানে এসেছিল। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে।

দুদিন পরে আবার দিব্য এল। তখন মধ্যাহ্নকাল। মহারাজকে আহার করিয়ে নিজে আহার করছে। সুবলা ছুটে এসে দিব্যর আগমন সংবাদ জানিয়েছিল।

তরঙ্গ আহার অসমাপ্ত রেখে উঠতে যাচ্ছে, দিব্য এসেছিল। হাসি হাসি মুখে তাকে দেখে বলেছিল, 'আহার করছো তরঙ্গময়ী?

তরঙ্গ কথা বলতে পারেনি।

—'ওনার আহার শেষ হয়ে গেছে? হাসি মুখেই প্রশ্ন করেছিল দিব্য।

—'কার?' তরঙ্গর কণ্ঠস্বর কেঁপে ছিল।

—'অতিথির?'

—'অতিথি! কে অতিথি?'

—বুঝতে পারছ না আমার কথা?' দিব্যর মুখে মৃদু হাসি। 'নারী ছলনাময়ী। জানতাম। কিন্তু তুমি কি তরঙ্গময়ী?'

তরঙ্গ উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—'ছিঃ, উঠে দাঁড়ালে কেন তরঙ্গ। আহার শেষ কর।'

তরঙ্গ নীরব। পাষাণ। বুকের মধ্যেটা থর থর করে কেঁপে ছিল তার। বুঝতে পেরেছিল সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। দিব্যর কয়েকজন অনুচর রাঘবকে নিয়ে এসেছিল। তার রক্তাক্ত কলেবর।

—'রাঘব, বলতো তোমার প্রভু মহারাজ মহীপাল উদ্যানবাটিতে তাঁর রক্ষিতার কাছেই আত্মগোপন করে আছে তো?'

রাঘব চোখ তুলে চায়নি। কথা বলেনি।

—'কি রাঘব, চুপ করে থেক না, কথা বল।' বড় মোলায়েম কণ্ঠস্বর দিব্যর।

—'আমি জানি না।'

—'সত্যই তুমি জান না রাঘব?'

—'জানি না।'

—'রাঘব।' চিৎকার করে উঠেছিল দিব্য। 'শোন রাঘব, আমার পরিচয় তুমি জান। আমি পারি না এমন কোন কাজ নেই। যদি তুমি সত্য কথা না বল আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব। তরঙ্গময়ী তুমি সত্য বলছো মহারাজ এখানে আশ্রয় নেয়নি?'

তরঙ্গময়ী চোখ তুলে দিব্যকে দেখেছিল।

কয়েক মূহূর্ত নীরবে গম্ভীরভাবে চিন্তা করেছিল সে। একসময়ে মৃদু হাসির সুক্ষ্মরেখা তার ওষ্ঠে খেলা করেছিল। মৃদু শান্ত কণ্ঠে একজন অনুচরের দিকে চেয়ে সে বলেছিল, 'শোন, তুমি মিথ্যাচারিণী নারীকে বিবস্ত্রা কর। বাঘব, তোমাকে আদেশ করছি, নগ্ন নারীকে কষাঘাতে জর্জরিত করবে তুমি।'

—'আমার পক্ষে আদেশ পালন করা সম্ভব নয়।'

—'অসম্ভবকে কেমন করে সম্ভব করতে হয় আমি জানি রাঘব। ঠিক আছে, তরঙ্গ তুমি শরীরের বস্ত্র উন্মোচন কর।'

—'না।' প্রতিবাদ করেছিল রাখব।

—'করবে না।'

রাঘব নীরব।

—'তাহলে বলে দাও তোমার প্রভু কোথায়?'

কয়েক মূহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তরঙ্গের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রাঘব। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিল, 'এখানে।'

শিউরে উঠল তরঙ্গ। থর থর করে কেঁপে উঠল তার সর্ব শরীর। বুকের মধ্যে কষ্ট অনুভব করল। শয্যায় উঠে বসে অনেকক্ষণ কাঁদল সে।

গভীর রাত্রি। তরঙ্গ ছাড়া আর বোধহয় কেউ জেগে নেই। কিন্তু সে তো ঘুমাতে চায়। পারে না। মহারাজের মৃত্যুর জন্য দায়ী সে। ভুল করেছিল। যদি না ভুল করতো।

কেমন যেন শব্দ হল। কেউ কি এসেছে? কে আসবে? কেউ আসে না। উদ্যানবাটিতে একরকম বন্দিনীর জীবন যাপন করছে। সুবলাও এখন বাইরে যেতে পারে না। দ্বাররক্ষীরা নিষেধ করেছে বাইরে যেতে।

আবার সেই শব্দ। এবার আরো স্পষ্ট। ভয় করলো তার! ভয়, না, আর ভয় নেই। ভয়তো মৃত্যু ভয়। সে ভয় তার কেটে গেছে।

ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন মহারাজ। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়েছিল তার চক্ষুদ্বয়।

দিব্য জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মহারাজ তুমি কি চাও?'

মহীপাল দিব্যকে দেখেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি দেবে?'

—'আমার অদেয় বোধহয় আর কিছু নেই।'

—'আছে দিব্য।'

—'আছে?'

—'আমি গোপালের বংশধর। রাজকুলে জন্ম আমার।'

—'গোপালও একজন সৈনিক ছিল।'

—'জানি। সৈনিক ছিলেন তিনি। অস্ত্র ব্যবসায়ী। সেটা ছিল তাঁর পেশা। তুমিতো লুণ্ঠনকারী, দস্যু। তুমি কি দেবে? দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।'

দিব্যর মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করেছিল।

—'কি হল, চুপ করে রইলে কেন?'

—'পাল বংশের সিংহাসনে আমিই বসবো।'

—'হয়তো বসবে। রাজা হয়ে রাজত্ব করবে। কিন্তু তোমার পূর্ব পরিচয় মুছে ফেলতে পারবে কি? পারবে না। পারা যায় না। যেমন পাল বংশের প্রথম মহীপাল হৃত গৌরবের সঙ্গে হারান রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন, স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' লৌকিক প্রবাদ এখনও মানুষের মুখে মুখে। আর আমি?'

সেই তাঁর শেষ কথা। দিব্য নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তাঁকে।

আবার সেই শব্দ। তরঙ্গময়ী মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে প্রশ্ন করল, 'কে?'

সামান্য পরে গবাক্ষের বাইরে দাঁড়াল এক ছায়ামূর্তি।

তরঙ্গ দেখল তাকে। ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল আকাশ। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট আগন্তুককে দেখতে পেল সে। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কে?'

ছায়ামূর্তি একটু নড়ল। সামান্য পরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল তার, —'তোমার খুব বিপদ।'

—'বিপদ?' থর থর করে কেঁপে উঠল তরঙ্গময়ী।

—'হ্যাঁ। খুবই বিপদ তোমার।'

ছায়া মূর্তির দিকে চাইল তরঙ্গময়ী। সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করল, কি বিপদ? কে বলল?'

—'আমি জেনেছি।' ছায়া মূর্তি বলল, 'আমার কথা অবিশ্বাস করো না।'

—'জেনেছো? কি জেনেছ তুমি? আমাকে মেরে ফেলা হবে এই তো?'

—'না।'

—'তাহলে?' একটু বিস্মিত হল তরঙ্গময়ী। বলল, 'মরা ছাড়া আর কি বিপদ হতে পারে?'

—'তুমি শুধুই মরার কথা ভেবেছো?'

—'আর কি ভাববো?'

—'আর কিছু কি ভাববার মত নেই তোমার?'

—'না।' কণ্ঠস্বর স্পষ্ট তরঙ্গময়ীর। বলল, 'শোন, মরতে এখন আর আমি ভয় পাই না।'

—'জানি।' একটু চুপ করে রইল ছায়ামূর্তি। বলল, 'তোমার সম্পর্কে আমি অন্য কথা জেনেছি।'

তরঙ্গময়ী গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'তুমি মহারাজের রক্ষিতা ছিলে। মনে কর....'

তরঙ্গময়ী নীরব।

—'এখন যদি কেউ আবার তোমাকে.....'

—'না-না।' আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল তরঙ্গময়ী। সর্বাঙ্গ থর থর কাঁপছে।

—'মহারাজের রক্ষিতা ছিলে। 'আবার.....'

—'দিব্য আমাকে.....'

বাধা দিল ছায়ামূর্তি। বলল, 'না, তেমন দুঃসাহস দিব্যর হবে না। দস্যু রাজা হয়েছে। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সচেষ্ট হয়েছে সে। তোমার দাবিদার হয়েছে অন্য একজন।'

তরঙ্গময়ী জানতে চায়নি তার পরিচয়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

—'তুমি কি করবে?' প্রশ্ন ভেসে এসেছিল।

—'কি?' সর্বাঙ্গ কেঁপেছিল তার।

—'নুতন এক অধ্যায়ের সূচনা হবে তোমার জীবনে।'

—'না-না।' আর্ত হাহাকার ধ্বনিত হয়েছিল তার কণ্ঠে।

—'কেন নয়?'

—'আমি পারব না। আমি.....' হঠাৎ তার দু'চোখে অশ্রুধারা নেমেছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল সে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করেছিল। শুধু বৃষ্টির শব্দ, বিদ্যুতের ঝলকানি। মনে হয়েছিল যে এসেছিল, সে বুঝি চলে গেছে। অনেকক্ষণ পরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, 'তাহলে কি করবে তুমি?'

উত্তর দেয়নি সে। চিন্তা শক্তি অবশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

—'অথচ তরঙ্গময়ী, মহারাজ মহীপালের মত আত্মসর্বস্ব মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলে। আজ নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে দিশাহারা। মহারাজকে তুমি যদি প্ররোচিত না করতে পালবংশের রাজত্বের অবসান ঘটতো কি-না আমি বলতে পারব না। তবে দিব্য হয়তো বসতে পারত না বরেন্দ্রর সিংহাসনে। আর তোমার দাবিদার কে জান? মহারাজের অনেক কুকর্মের সহায় রাঘব। মহারাজ দিব্য উপহার স্বরূপ তোমাকে তার হাতে তুলে দেবে।'

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল তরঙ্গময়ী। সে চিন্তা করতে পারল না। সর্ব শরীর তার ঘৃণায় রি-রি করে উঠল।

—খুব আশ্চর্য হয়ে গেলে, না?' বলল ছায়ামূর্তি।

তরঙ্গ নীরব।

—'কিন্তু অন্যায় তো তুমি কিছু কম করনি। কেন করেছিলে?'

একটু সময় নিল তরঙ্গ। বলল সব।

—এমন-ই অনুমান করেছিলাম। বহুরূপী দিব্য। বরেন্দ্রর প্রজাদের রক্ষাকর্তা রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। তার লক্ষ্য বংশমর্যাদা বৃদ্ধি। এ তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন-প্রস্তুতি-সফলতা।' সামান্যক্ষণ নীরব রইল আগন্তুক। কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তুমি কি সুস্থ জীবন কামনা কর না তরঙ্গময়ী?'

সাগ্রহে সে বলল, 'সুস্থ জীবন? আমি.... আমি....'

—'খুব সাধারণ জীবন মেনে নিতে পারবে? 'খুবই সাধারণ। চিন্তা কর। আমি পরে এসে জেনে যাব।'

—'না। যেও না।' বলল তরঙ্গময়ী, আমি পারবো।'

—'বেশ আমি তোমার জন্য চেষ্টা করবো।'

তরঙ্গময়ী ছায়ামূর্তিকে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে? কেন.....'

—'আমি? না, পরিচয় দেবার প্রয়োজন বোধ করছি না।' ছায়ামূর্তি বলল, 'কি হবে পরিচয় জেনে।'

—'তুমি আমার উপকার করতে এসেছ কেন?'

—'এই প্রথম বুদ্ধিমতীর মত প্রশ্ন করলে। শোন, তুমি মনে করছো তোমার উপকার করছি। না, যা করছি, তা আমার নিজের স্বার্থে।'

—'তোমার স্বার্থ?'

—'লোহিত যেমন নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখিয়ে তোমায় গৃহহারা করেছিল। ঠিক আমাকেও একজন.....না, থাক সে সব কথা। শোন, আমি তোমার জন্য চেষ্টা করবো।'

তারপর অনেকক্ষণ পার হল। বৃষ্টি পড়ছে-বাতাসের মাতামাতি। তরঙ্গময়ী উঠে ভয়ে ভয়ে গবাক্ষের কাছে এল। কেউ নেই। ছিল। চলে গেছে।

কথাটা শুনে রামপাল মাতা যৌবনশ্রীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন রোহিণী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তি অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে গেছে তাঁর। কখনো কখনো খুবই অস্পষ্টভাবে দেখেন। আবার অনেক সময় কিছুটা স্বাভাবিক। বৈদ্য ঔষধ লেপনের ব্যবস্থা পত্রের সঙ্গে ঔষধও দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে ছিলেন, চক্ষু-কর্ণ-স্মৃতি, বয়সকালে বিভ্রাট সৃষ্টি করবেই। সম্পূর্ণ আরোগ্যের কোন উপায় নাই।

যৌবনশ্রীর কথা শুনে তাঁর মুখের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন রোহিণী। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি বোধহয় ভুল শুনছেন।

যৌবনশ্রী আবার তরঙ্গের কথা বলেছিলেন।

রোহিণীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়েছিল। বলেছিলেন, 'রক্ষিতার সংবাদটি তোমার কাছে কে বহন করে নিয়ে এল?'

—'আমি জেনেছি।'

—'জানাটা তোমার উচিৎ হয়নি। না, সত্যই উচিৎ হয়নি।'

—'তার খুবই বিপদ।' যৌবনশ্রী বললেন, 'সত্যই বিপদ তার।'

—'কিন্তু তার বিপন্নতার সঙ্গে পালবংশের মর্যাদা জড়িত কি?

কয়েক মুহুর্ত নীরব থাকার পর মৃদু কণ্ঠে যৌবনশ্রী বলেছিলেন, 'আপনি কি মনে করেন?'

—'আমি.....' চিন্তা করেছিলেন রোহিণী। বলেছিলেন, 'এর মধ্যে মনে করার কিছু আছে কি?'

—'নেই?' 'সামান্য এক দাস স্বর্গতঃ মহারাজের.....'

—'থাম। সংবাদের সত্যতা কত দূর?' রোহিণী বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছি না এ সংবাদ তুমি কি ভাবে পেয়েছো।'

—'মিথ্যা নয়। আপনি বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

—'কিন্তু তুমি....

—'ক্ষমা করবেন। সংবাদ সূত্র প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আলোচনায় হয়তো ক্ষতি হবে না, কিন্তু যার কাছে জেনেছি তাকে আপনার কাছে উপস্থিত করলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে তার। কারণ....'

যৌবনশ্রীকে নিবৃত্ত করেছিলেন। অন্তঃপুরের অধিকার দিব্য নেয়নি সত্য, কিন্তু এখানকার সমস্ত সংবাদই তার কাছে নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে। রোহিণী বলেছিলেন, 'তোমার কথা শুনলাম। কি করা যায় আমি চিন্তা করে দেখি।'

দিন দুই পরে তরঙ্গময়ীর ব্যবস্থা করলেন রোহিণী। অবশ্যই দিব্যর সঙ্গে কথা বলে। বিস্মিত হয়েছিল দিব্য। কিছু বলার আগেই রোহিণী বলেছিলেন, 'স্বর্গতঃ মহারাজের আশ্রিতার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ বলেই মনে হয়েছে আমার। তার ভরনপোষণের দায়িত্ব আমিই নিলাম। সে আমার আশ্রিতা হয়ে থাকবে।

দিব্য কথা বলতে পারেনি। অস্বীকার করতে পারেনি রোহিণীর দাবি।

কুড়ি

বিক্রমশীল বিহারের দূরত্ব বেশি নেই। আর মাত্র কয়েক দিনের পথ। আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে। কদিন-ই কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের যা অবস্থা, ভারী বর্ষণ শীঘ্রই শুরু হবে। তখন পথ চলা কঠিন হয়ে উঠবে। এখন যে পথ চলায় বিঘ্ন ঘটছে না তা নয়, তবে ছেদ পড়েনি।

সন্ধ্যায় এক বণিকের গৃহে আশ্রয় লাভ করেছে ভিক্ষুরা। খুবই ছোট গ্রামটি। আয়তনে এবং জন সংখ্যায়। ছোট্ট গ্রামে চম্পার এক বড় বণিকের বাসগৃহ। অবসর যাপনের জন্য গ্রামে এসেছেন বণিক। পুত্ররা চম্পাতেই থাকে। তিনিও। কখনো কখনো তিনি চলে আসেন নিজ গ্রামে। কয়েকটি দিন কাটিয়ে যান।

সন্ধ্যা আসন্ন। ভিক্ষুরা আশ্রয় সন্ধান করছিল। বণিক পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গৃহে ফিরছিলেন। বণিকের কাছেই ভিক্ষু দলটির প্রধান ভিক্ষু ধারণ গ্রামে কোন অতিথিশালা আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন।

বণিক মীননাথ ভিক্ষুর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকার পর উত্তর দিয়েছিলেন, 'গ্রামে কোন অতিথিশালা হয়েছে কি-না এখনো জানা হয়নি আমার।'

বিস্মিত হয়েছিলেন ধারণ। বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়েছিল.....'

—'কি মনে হয়েছিল আপনার?'

—'আপনি এ গ্রামেরই অধিবাসী।'

—'অবশ্যই। এখানেই আমি জন্মেছি। আমার পূর্ব পুরুষের বাসভূমি।'

ধারণ কি বলবেন স্থির করতে পারেননি।

মীননাথ বলেছিলেন, 'চম্পায় আমার কর্মস্থল। সেখানেই অবস্থান করতে হয়। তবে জন্মভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনি। গত সন্ধ্যায় এসেছি। সমস্ত দিন গৃহস্থালীর কর্মে ব্যস্ত ছিলাম। এবার জন্মভূমিতে এসেছি প্রায় তিনটি ঋতু পার করে। ইতিমধ্যে গ্রামে কোন অতিথিশালা নির্মাণ হয়েছে বলে জানিনা। তেমন সম্ভাবনা আছে বলেও আমার মনে হয় না। ভিক্ষু, কোথা থেকে আগমন আপনাদের?'

—'সোমপুর থেকে।' মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন ধারণ।

—'অর্থাৎ বরেন্দ্র থেকে আসছেন আপনারা। নিশ্চয়ই বিক্রমশীল যাবেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বর্তমান বরেন্দ্রর অবস্থা কেমন?' জানতে চেয়েছিলেন মীননাথ।

ধারণ কি উত্তর দেবেন সহসা স্থির করতে পারলেন না। সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'সঠিক জানা নেই। পট পরিবর্তনের সংবাদ আমরা পথে পেয়েছি।'

মৃদু কণ্ঠে মীননাথ বললেন, 'আমি চম্পাতেই শুনেছি। বরেন্দ্রর রাজা এখন দিব্য। দিব্য সম্পর্কে কিছু জানেন?'

—'আজ্ঞে না।'

—'খুবই স্বাভাবিক। আপনারা সন্ন্যাসী। সমাজ সংসার রসাতলে গেলেও আপনাদের কি?'

—'আমরা তা মনে করি না।' শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললেন ধারণ। 'রাজ্যের রাজা, রাজকার্যের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও প্রজাদের সঙ্গে আছে। মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার অংশভাগি আমরাও।'

—'তাহলে রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ অস্বীকার করছেন কি কারণে?'

—'যা সত্য তাই বললাম।'

মীননাথ হাসলেন। বললেন,'আমি বণিক। রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। রাজ্যের দুর্বলতা, অস্থির শাসন আমাদের শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। চম্পার বণিক বরেন্দ্রে বাণিজ্য করতে যেতে সাহসী হয় না। এখন মগধের শাসন ক্ষমতাওতো দিব্যর হাতে?'

—'আমাদের জানা নেই।'

আবার হাসলেন মীননাথ। ভিক্ষু ধারণকে একবার দেখলেন। জানতে চাইলেন, 'আপনি কি সঙ্গী ভিক্ষুদের দলপতি?'

প্রশ্ন শুনে এই প্রথম হাসলেন ধারণ। বললেন, 'আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?'

—'আপনি বয়জ্যোষ্ঠ বলেই বোধ হচ্ছে আমার।'

—'আমারা পরস্পরের সহযাত্রী।'

—'অর্থাৎ?'

উত্তরে মৃদু হাসলেন ধারণ।

মীননাথ বললেন, 'আমি হিন্দু। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর থেকে বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই মোনোনিবেশ করার অবসর হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম, সঙ্ঘ সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি মাত্র। হীনযান, মহাযান আরো কিছু মতবাদ আছে আপনাদের মধ্যে। আপনাদের ধর্মে দেব দেবীর আশ্রয় লাভও ঘটেছে নাকি?'

ধারণ নীরব রইলেন।

মীননাথ বললেন, 'দেখুন ধর্ম সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার কথা শুনে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না-তো?'

—'না-না।' বিব্রতবোধ করলেন ধারণ।

—'তাহলে আপনি নীরব রয়েছেন কেন?'

—'ভিন্ন কারণে।' মৃদু কণ্ঠে ধারণ বললেন, প্রথম কারণ সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়। বর্ষণসিক্ত আকাশ। রাত্রিবাসের আচ্ছাদন প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ, আপনার যুক্তিযুক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পথ চলতে চলতে দেওয়া কি সম্ভব?'

—'অবশ্যই সম্ভব নয়।' প্রায় বৃদ্ধ মানুষটি এবার সশব্দে হাসলেন। বললেন, 'শরীর আগে। শরীরকে রক্ষা করতে পারলে তবেই ধর্ম চর্চা।'

ধারণ আবার নীরব।

মীননাথ বললেন, 'রাত্রি বাসের একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। তবে আহারাদির ব্যবস্থা কতটুকু করা·যাবে সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের।'

ধারণ মৃদু হাসলেন।

গ্রামের মধ্যস্থলে মীননাথের গৃহ। তিনি থাকা এবং আহারাদির ব্যবস্থা করলেন। ধারণের সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন। একসময় জানতে চাইলেন, 'আমি জন্ম সূত্রে বণিক। সৎভাবে বাণিজ্য করেছি। সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা করে এসেছি এতো দিন। ধর্মকে অস্বীকার করার প্রবণতা আমার মধ্যে কোন দিনই জাগেনি। নিজ ধর্মের প্রতি আমার যেমন পক্ষপাতিত্ব নেই, নেই পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। শেষ জীবনে নতুন করে আমার কিছু করার প্রয়োজন আছে?'

শান্ত কণ্ঠে ধারণ বললেন, 'আপনার কি মনে হয়?'

—আমার?' একটু নীরব রইলেন তিনি। এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ওষ্ঠে। দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, 'সেটাই স্থির করে উঠতে পারছি না ইদানীং। একজন ছিলেন, তিনি তিনটি ঋতু আগে চলে গেছেন। চিন্তা করি, এসেছি যখন, যেতে হবেই। তাহলে? স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে মনকে।'

—'সেই জন্যই ধর্মের আশ্রয় অনুসন্ধান?'

হেসে ফেললেন মীননাথ। বললেন, 'আবার চিন্তা করি ভোলা কি যায়?'

—'ভুলতে চান?

—'এখানেই দ্বন্দ্ব।' হাসলেন। বললেন, 'আপনি কি বলেন?'

—'ভুলবেন কেন?'

—'যথার্থ বলেছেন, কেন ভুলব? পরিচিত জনেরা ধর্মের আশ্রয় নিতে বলেন। তাহলে নাকি পরকালের কর্ম করা হবে। ইহকালে আমি সৎ থাকার চেষ্টা করে গেছি। পরকালে আমার চিন্তা কি? পত্নী বিয়োগ ঘটেছে আমার। দীর্ঘ বছরের সঙ্গিনী। শোক তো হবেই। অজস্র স্মৃতি মনে পড়ে। আমি ভুলে থাকতেও চাই না।'

—'সমাধান তো হয়েই গেছে আপনার?' বললেন ধারণ।

হাসলেন মীননাথ।

আহারাদির পর শয্যা গ্রহণ করল ভিক্ষুরা। পথশ্রমে ক্লান্ত সকলেই একে-একে নিদ্রিত হল। বণিক গৃহের তিনটি কক্ষে ভিক্ষুদের স্থান সঙ্কুলান হয়েছে। তৃতীয় কক্ষটিতে ধারণ ও আরো দুজন ভিক্ষু। মধ্যরাত্রে বৃষ্টি শুরু হল। শয্যায় উঠে বসলেন ধারণ। অন্য দুই ভিক্ষুও উঠে বসল শয্যায়। বিস্মিত ধারণ বললেন, 'এ কি! নিদ্রা যাননি আপনারা?'

একজন বলল, 'আপনি?'

—'গিয়েছিলাম।' ধারণ বললেন, 'বৃষ্টির শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে।'

অন্যজন বলল,'আমার পক্ষে আর রাত্রে নিদ্রামগ্ন হওয়া সম্ভব হয়নি।'

—'হেতু?'

সে একটু চুপ করে রইল। চিন্তিতভাবে বলল, 'আপনি যখন গৃহস্বামীর সঙ্গে

কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন, অন্য সকলে বিশ্রাম করছেন, আমি কিছুক্ষণের জন্য গৃহের বাইরে গিয়েছিলাম। সে সময়.....' চুপ করে গেল সে।

কক্ষে দীপাধারে দ্বীপ জ্বলছে। অনুজ্জ্বল আলোকে বক্তার দিকে চাইলেন ধারণ।

—'আমার ধারণাটা ভ্রান্ত হতেও পারে। কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহের অদূরে দেখেছিলাম আমি।'

—'গ্রামবাসী?'

—'অনুমান করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। তবে তাদের আচরণ সন্দেহ মুক্ত বলে মনে হয়নি আমার। আর সেই জন্য আপনারা নিদ্রিত হবার পর আমি বাইরে গিয়েছিলাম।'

—'কিছু দেখেছো?'

—'গৃহের সামনের পথ দিয়ে কয়েকজনকে চলে যেতে দেখেছি।'

শোনার পর কিছুক্ষণ নীরব রইলেন ধারণ।

প্রথম জন বললেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

সে কথা বলল না।

ধারণ বললেন, 'চিন্তার ব্যাপার।'

—'আমার জন্য?'

ধারণ নীরব। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বললেন তিনি, 'শুধুমাত্র আপনার জন্য নয় কুমার, চিন্তা পরিস্থিতির জন্য। জানি না শেষ পর্যন্ত কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে কি-না।'

শূরপাল গম্ভীর হলেন। ধারণকে একটু দেখলেন। সর্বত্যাগী বৌদ্ধভিক্ষু। বৃদ্ধ প্রায়। একদিন নিভৃতে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা আপনি একাজে ব্রতী হলেন কেন?

—'রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য।'

—'কিন্তু আমার দ্বারা কতটুকু কল্যাণ সাধন হবে? আমি তো.....'

ধারণ কথা বলেননি। বৃদ্ধ ভিক্ষুকে খুবই ভাল লেগেছে তার। সৌম্যদর্শন। খুবই সহজ, সরল, কর্তব্য পরায়ণ। যাঁরা সঙ্গে চলেছেন তাঁদের সকলেই ভিক্ষু নন। ধারণের প্রতি ব্যবহারেই বোঝা গিয়েছিল। পরীক্ষাও করেছেন।

শ্রীহর্ষ তাঁর খুবই বাধ্য। তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি। যুবা পুরুষ।

—'আচ্ছা শ্রীহর্ষ, তুমি কত দিন প্রাব্রজ্য গ্রহণ করেছো?' যাত্রাপথে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন তাকে।

শ্রীহর্ষ, থতমত খেয়েছিল। কোন উত্তর দেয়নি।

—কি হল শ্রীহর্ষ, নীরব কেন?'

—'আমাকে ক্ষমা করবেন কুমার।'

—'অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দেবে না?'

—'কিছু বিধি-নিষেধ আছে।'

—'কার, ধারণের?'

নিরুত্তর ছিল শ্রীহর্ষ।

সামান্যক্ষণ চিন্তা করেছিলেন তিনি। শ্রীহর্ষকে দেখেছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'শ্রীহর্ষ, তোমার প্রকৃত পরিচয় না জানলেও তুমি যে ভিক্ষু নও, এ সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

শ্রীহর্ষ গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলেছিল।

—'কার নির্দেশে তুমি ভিক্ষুদের অনুগামী হয়েছ শ্রীহর্ষ?'

—'বলা সম্ভব নয় কুমার।' হাসি মুখেই উত্তর দিয়েছিল শ্রীহর্ষ।

—'আমার পরিচয় কি করে জানলে?' জানতে চেয়েছিলেন শূরপাল।

—'আমাদের জানান হয়েছে।' মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল সে।

—'অথাৎ তুমি একা নও, বেশ কয়েকজনই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে আছো?'

—'আছি। আপনার জন্য।'

—'কিন্তু তোমাদের প্রকৃত পরিচয় কি? তোমরা কেন আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করছো?'

—'আমরা কর্তব্য পালন করছি।' মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল শ্রীহর্ষ।

এখানেই রহস্য। বন্দীশালা থেকে কারা তাঁকে মুক্ত করল? কেন করল? গভীর রহস্য। এ রহস্যের সমাধান কোন দিন হবে কি না জানেন না। মগধে চলেছেন। মগধের কিছু অংশ এখনও পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। না, সে সাম্রাজ্য আর নেই। পথেই সংবাদ পেয়েছেন বরেন্দ্রর অধিকার চলে গেছে। যুদ্ধে মৃত্যু ঘটেছে মহারাজ মহীপালের।

রাজা হওয়ার স্বপ্ন তিনি দেখেননি। মগধে চলেছেন আশ্রয় সন্ধানে। তিনি অন্যত্রও তো যেতে পারেন?

—'কুমার।'

আহ্বান শুনে চাইলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। লোহিত। ধারণের সম্মতিতে সেও ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। মহারাজ মহীপাল তাকে মগধে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরেন্দ্র ত্যাগ করেছিল সে। মগধে যাওয়ার মনোস্থির করেনি। যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটতো হয়তো সে.....

—'লোহিত, তুমি বরেন্দ্র ত্যাগ করলে কেন?' প্রশ্ন করেছিলেন তিনি।

—'কেন?' লোহিত তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মাথা নত করেছিল। সামান্যক্ষণ নীরব থেকে বলেছিল, 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কুমার।'

—'পাপের প্রায়শ্চিত্ত?' বিস্মিত হয়েছিলেন। 'কি এমন পাপ তুমি করেছো যে.....'

বাধা দিয়েছিল লোহিত। বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠেছিল তার ওষ্ঠে। বলেছিল, 'আমার পাপ কাজের শেষ নেই কুমার।'

—'লোহিত!'

—'বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

—'সত্যই পারছি না।'

—'জানি। আমাকে দেখলে কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারবে না আমার পক্ষে কোন অন্যায় পাপ কাজ করা সম্ভব। প্রথমে কুমার যুবরাজ-পরে মহারাজের বয়স্যের জীবন যাপন করেছি। তাঁর আজ্ঞাবাহী ভৃত্যে পরিণত হয়েছিলাম। সর্বক্ষণের কৃপাপ্রার্থী। অথচ....'

—'থাক লোহিত।'

—'শুনবেন না?'

—'কি হবে?'

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নত করেছিল সে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'কেন যে করেছিলাম, কিসের প্রত্যাশায়, তবে অনুগ্রহ লাভ করেছি।'

—'আর কিছু?

—'আর কিছু সেদিন চাইনি। মনে হয়নি।'

তিনি কথা বলেন নি। লোহিতও চুপ করেছিল।

—'কুমার।' আবার ডাকল লোহিত।

তিনি তার দিকে চাইলেন।

লোহিত বলল, 'কুমার, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে.....'

শূরপাল তাকে দেখলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চিন্তা কোর না তুমি। যা ঘটবার ঘটবে। শোন লোহিত, মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত প্রায়। শয্যা গ্রহণ করো।'

শূরপাল শয্যা গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাধ্বনি শোনা গেল তাঁর।

শয্যা গ্রহণ করল লোহিত, কিন্তু তার দুচোখে ঘুম নামল না। শুয়ে শুয়ে বর্ষণের শব্দ শুনতে লাগল সে।

ধারণের আহ্বানে নিদ্রা ভঙ্গ হল শূরপালের। রাত্রি প্রভাতা হচ্ছে। বন্ধ হয়েছে বর্ষণ। তিনি বললেন, 'কুমার, প্রস্তুত হয়ে নিন। আমাদের যাত্রা করতে হবে।'

লোহিতকে দেখতে পেলেন না শূরপাল।

ধারণ বললেন, 'তিনি আছেন। বাইরে গৃহস্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন।'

প্রস্তুত হয়ে নিলেন শূরপাল। পথশ্রমে ক্লান্ত তিনি। অনভ্যস্ত জীবন। সঙ্গতি রাখতে পারছেন না। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ তাঁর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। ইদানীং প্রায় দিনই নিদ্রাহীনভাবে অতিবাহিত হচ্ছে রাত্রি। রাত্রির শেষ যামে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন।

মীননাথ আরো একটি দিন তাঁর গৃহে থাকার জন্য বারবার বললেন। ধারণের একই উত্তর, 'বর্ষা এসে গেছে, এসময় আতিথ্য গ্রহণ সম্ভব নয়।'

সঙ্গে এলেন মীননাথ। গ্রামের প্রান্ত থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

দুদিকে শষ্যক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পথ। চারিদিকে সবুজের সমারোহ।

সারিবদ্ধভাবে ভিক্ষুদল পথ চলছেন। অগ্রভাগে ধারণ। শেষপ্রান্তে শূরপাল আর লোহিত। গাছের পাতায় পাতায় প্রভাতের প্রথম সূর্যের আলো। সুন্দর, শান্ত গ্রামটি। পাখিদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

লোহিত ডাকল, 'কুমার।'

—'বল।' সাড়া দিলেন শূরপাল।

—'গ্রামটি খুবই সুন্দর, না?' হাসল সে।

ভাল লাগছিল শূরপালেরও। বললেন, 'সুন্দর।'

—'গ্রামটা প্রদক্ষিণ করলাম। খুবই ছোট গ্রাম।'

—'কখন?' ওর মুখের দিকে চাইলেন শূরপাল।

—'আপনারা সকলেই তখন নিদ্রামগ্ন। হাসল লোহিত। 'ঘুরে দেখে এলাম চতুর্দিক। সুন্দর গ্রামটি।'

—'হাসছো কেন?' অবাক হলেন শূরপাল।

—'গত রাত্রির কথা মনে পড়ছে। দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছিল। সত্যই।'

—'তুমিতো প্রৌঢ়ত্বে পদার্পন করনি লোহিত। এর মধ্যেই দৃষ্টিভ্রম?'

—বুঝতে পারছি না। সেই জন্যই হাসি পাচ্ছে। এমনতো কখনো ঘটেনি আমার। কেন ঘটলো?'

—'তোমার চক্ষুর চিকিৎসার প্রয়োজন লোহিত। মগধে নিশ্চয়ই তোমার ব্যধীর বৈদ্য পাওয়া যাবে।'

—'অবশ্য। বেশ কয়েকবারই আমাকে মহারাজ.....' চুপ করে গেল সে।

—'কি হল লোহিত? চুপ করে গেলে কেন?'

—'কিছু নয় কুমার।' হাসল লোহিত। 'এমনই বলে ফেলেছি কথাটা।'

—'পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে?' ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শূরপাল।

লোহিত কথা বলল না। তাকে বিমর্ষ দেখাল।

—'জীবন খুবই আশ্চর্য্যের, তাই না লোহিত? এই আমার কথাই চিন্তা কর না। দিব্যি বন্দীশালায় ছিলাম, জানি না কেমনভাবে মুক্তি পেলাম। মগধে চলেছি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশে। আশ্চর্যের নয়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল লোহিত। ম্লান কণ্ঠস্বর।

—'আর তুমি ছিলে মহরাজ মহীপালের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। এখন তুমি.....' কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি। কারা যেন পথরোধ করল তাঁদের।

ধারণ বললেন, 'কে তোমরা? কি চাও?'

অবরোধকারীদের একজন এগিয়ে এল তাঁর সামনে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'কি চাই বুঝতে পারছেন না ভিক্ষু?'

ধারণ নিরুত্তরে তার মুখের দিকে তাকালেন।

সে বলল, 'শুনুন ভিক্ষু, আপনাদের মধ্যে আত্মগোপনকারীকে আমাদের হাতে তুলে দিন।'

—'কে আত্মগোপন করে আছে আমাদের মধ্যে?' ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আর তোমাদের পরিচয় কি? কি উদ্দেশ্যে আমাদের পথ রোধ করেছ? শোন্ আমাদের মধ্যে কোন দুস্কৃতি আত্মগোপন করে নেই।'

সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধারণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, 'আপনি ভিক্ষু ধারণ?'

—'আমার পরিচয় তোমার অজানা নয় দেখছি।'

—দ্বাদশ ঋতু আগে বিক্রমশীল বিহার থেকে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে গিয়েছিলেন দুজন সঙ্গীসহ। এখন বিক্রমশীল বিহারে ফিরে যাচ্ছেন।'

—'যাচ্ছি।' শান্ত কণ্ঠস্বর ধারণের। বললেন,'দেখছি সব সংবাদই জান তুমি!'

—'বিক্রমশীলের দুই সঙ্গী পাহাড়পুরেই আছেন।'

—'আছেন।'

—'যারা আপনার সঙ্গী হয়েছে সকলেই পাহাড়পুর বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষু?'

—'তাই।'

—'না, তা নয়।' চিৎকার করে উঠল সে। 'আপনাদের মধ্যে একজন পলাতক আছে।'

—-'পলাতক!' বিস্মিত হলেন ধারণ। বললেন, 'তুমি যা বলছো তা ঠিক নয়। কোন পলাতক আমাদের মধ্যে নেই। কে সে? কি তার পরিচয়? আর তোমরাই কে?'

—'আমরা মহারাজ দিব্যর সৈনিক। মহারাজ আমাদের সেই পলাতকের সন্ধানে পাঠিয়েছেন। সেই পলাতককে আমরা বরেন্দ্র নিয়ে যাব। বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, সেই পলাতক আপনাদের মধ্যেই আছেন।'

—'আশ্চর্য ব্যাপার, তোমরা জানলে অথচ আমি জানি না।' চিন্তিত হলেন তিনি। নিজের মনেই বললেন, 'এ কেমন করে সম্ভব?'

—'আপনার অনুগামীরা সকলেই কি আপনার বিশেষভাবে পরিচিত?'

ধারণ তার দিকে চাইলেন। বললেন, 'বিশেষভাবে নাহলেও সকলেই আমার পরিচিত বৈকি। আমরা একই সঙ্গে যাত্রা করেছি। আশ্চর্য ব্যাপার! তোমরা কার সন্ধান করছো?'

—'আমরা কুমার শূরপালকে চাই।'

—'কুমার শূরপাল। না, বরেন্দ্রে তাঁর নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের

মধ্যে তিনি আছেন বলেও আমার মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, যদি তোমাদের মনে হয় তিনি আমাদেব মধ্যে আছেন, তাহলে তাঁকে নিয়ে যাও। কুমারকে নিশ্চয়ই সনাক্ত করতে পারবে?'

দ্বিধাগ্রস্ত হল সে। বলল, 'আপনাদের সকলেরই মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বসন.....'

—'তুমি কি ভেবেছিলে কুমার রাজবেশ ধারণ করে আমাদের সঙ্গে পথ চলবেন?'

—'আপনি উপহাস করছেন?' কঠোর দৃষ্টিতে ধারণের দিকে তাকাল সে।

—'না বৎস, উপহাস মনে করছো কেন? তোমার ভ্রান্তি দূর করার জন্যই বলছি।'

—'না ভিক্ষু, আমার এতটুকু ভ্রান্তি নেই। যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা সত্য। বলুন, কে কুমার?'

—কুমার আমাদের সঙ্গে নেই বৎস। তুমি ভুল করছো।'

সে নীরবে ধারণকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

তিনি বললেন, 'তোমার পরিবর্তে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিতে কুমারের অনুসন্ধানে পাঠান উচিৎ ছিল মহারাজ দিব্যর। কথাটা শুনতে তোমার ভাল লাগছে না, কিন্তু সত্য!'

কঠিন দৃষ্টিতে সে ধারণের দিকে চেয়ে রইল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, পরিহাস করবেন না।'

সামান্য পরে তিনি বললেন, 'পরিহাস করছি না। যা সত্য বললাম।'

—'বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেও আপনি মিথ্যাচারী।' যেন গর্জে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

ধারণ স্মিত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কথা বললেন না।

সে সঙ্গীদের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিছু কথা বলল। ফিরে এসে বলল, চলুন আপনারা।'

—কোথায়?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তারদিকে চাইলেন তিনি।

—'বরেন্দ্র। আপনাদের নিয়ে যাব আমরা। আর না হলে.....'

—'সেটা কি করে সম্ভব? ধারণ বললেন, 'পলাতক কুমার যদি আমাদের মধ্যে থাকেন তাঁকে নিয়ে যাও।'

—'তাঁকে আমার হাতে তুলে দিন।'

হাসলেন ধারণ। বললেন, 'যাঁর সন্ধানে এসেছ তাকে চেন না। আমার কথাও বিশ্বাস করছো না।'

—'না করছি না। চলুন আমাদের সঙ্গে। যেতেই হবে।'

—'তাতো সম্ভব নয়।' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি।

—'সম্ভব নয়?' গর্জে উঠল সে।

—'না বৎস। অযথা বল প্রয়োগ করছো।'

মুহূর্তে তরবারি কোষমুক্ত করল সে। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'শোন ভিক্ষু, আমার আদেশ যদি পালন না কর, এই তরবারি অমূল বিদ্ধ করে দেব তোমার বুকে। তারপর

তোমার সঙ্গীরাও যদি আমার আদেশ পালনে অস্বীকার করে তাহলে তাদের অবস্থাও তোমার মতই হবে।'

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ ভিক্ষু। নীরবে সঙ্গীদের দেখলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কর্ম সম্পাদন কর বৎস।'

—'তুমি যাবে কি-না?'

ধারণ নীরব।

সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তরবারি ওঠাল। লোহিত চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও বীরপুরুষ।'

সে লোহিতকে দেখল।

গম্ভীরভাবে লোহিত বলল, 'তোমার মহারাজ, বরেন্দ্রর দস্যুটাকি তোমাকে বৌদ্ধশ্রমণ হত্যার আদেশ দিয়েছে?'

কঠোরভাবে সে বলল, 'মহারাজ সম্পর্কে সংযতভাবে কথা বল।'

—'যা সত্য তাই বললাম। ছিল পরস্বপহরণকারী দস্যু, বিদ্রোহের সুযোগে হয়ে গেল দেশপ্রেমিক। এখন রাজা। কুমার শূরপালকে নিয়ে সে কি করবে, কন্যা সম্প্রদান করে জামাতা করবে নাকি?'

—'ভিক্ষু।' চিৎকার করে উঠল সে।

—'রক্ত চক্ষু দেখিও না। পরিচয় দিলে দিব্যর সৈনিক বলে। মনে হচ্ছে তুমিও তার দলভুক্ত ছিলে।'

—'হ্যাঁ ছিলাম।' আবার চিৎকার করে উঠল সে।

—'সে তোমার আচরণ দেখেই বুঝতে পেরেছি।' বাঁকা হাসি হাসল লোহিত। বলল,'তা কুমারকে কি তোমার মহারাজের খুবই প্রয়োজন?'

চুপ করে রইল সে।

লোহিত ধারণের দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ভিক্ষু আপনারা যান।'

—'না যাবে না।' চিৎকার করে উঠল সে।

—'সে কি! তোমার মহারাজের আদেশ পলাতক কুমার শূরপালকে নিয়ে যাবার। সে কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়ে যেতে বলেছে?'

—'শূরপালকেই নিয়ে যেতে বলেছে।'

—'তাহলে? অযথা সন্ন্যাসীদের আটকে রাখার কারণতো দেখছি না।'

—'তুমি.....'

—'তুমি নয় আপনি। সম্মানীয়দের সম্মান দিতে হয়। সন্ন্যাসীদের যেতে বলছি আমি।'

—'তু—আপনি অনুমতি দেবার কে?'

—'আমি?' আবার হাসল লোহিত। বলল, 'এই বুদ্ধি নিয়ে রাজা দিব্যর সেনাপতি হয়েছো? ছিঃ ছিঃ।' বস্ত্রের মধ্য থেকে তরবারি বার করল সে। বলল, 'এঁরা সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। নিরস্ত্র। শুধু আমার কাছেই অস্ত্র আছে। এবার বুঝতে পারছো?'

ধারণকে দেখিয়ে সে বলল, 'উনি তাহলে.....' অযথা.....

—'না, উনি মিথ্যাচার করেননি। ওনার অজ্ঞাতসারেই আমি সঙ্গী হয়েছি। এখন বল, ওঁদের পথমুক্ত করবে কি-না?'

—'আপনি যে কুমার শূরপাল তার প্রমাণ কি?'

—'তোমার মত মুর্খ আমি জীবনে দেখিনি। তোমাদেব প্রভু দিব্যও তোমাদেরই স্বগোত্র। ছিল দস্যু, হয়েছে.....'

চিৎকার করে উঠল দিব্যর সেনাপতি, 'সাবধান কুমার, মহারাজ সম্পর্কে কটুবাক্য বললে পরিণাম আপনার ভাল হবে না।'

—'পরিণাম ভাল হবে না?' হাসল লোহিত। বলল, 'হ্যাঁ ভাই সেনাপতি তোমার নামটি কি?'

সে কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল।

লোহিত আবার হাসল। বলল, 'আমি যে কুমার শূরপাল তার প্রমাণ কি দিতে হবে?'

—'নিশ্চয়ই দিতে হবে। নাহলে সকলকেই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

গম্ভীর হল লোহিত। বলল, 'শোন মহাধিরাজ দিব্য সেনাপতি, তুমি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছ, তা দিয়ে কৃষিকার্য করা চলে, সৈন্যাপত্য কদাপি নয়। জানি, দিব্য স্বজাতীয়দের নিয়েই দস্যু বৃত্তি করত। তুমি তাদেরই একজন। তুমিই প্রমাণ করলে আমি শূরপাল। এখন অস্বীকার করছো কিভাবে?'

—'আমি প্রমাণ করেছি আপনি কুমার শূরপাল?' তার কণ্ঠে বিস্ময়।

—'করেছ বৎস।' লোহিতের ওষ্ঠে মৃদু হাসি। 'প্রভু নিন্দা সহ্য করতে না পেরে কুমার বলে সম্বোধন করেছ আমায়। তোমাকে দেখে বলবান বলে মনে হলেও তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি খুবই দুর্বল। তোমাকে মহারাজ দিব্য কি করে যে সেনাপতি করল বুঝতে পারছি না।'

আপমানে জর্জরিত সে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'শুনুন, আপনাদের সকলকেই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

—'খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত তোমার সেনাপতি।' বিজ্ঞের মত লোহিত বলল, 'তা মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যেতে চাও না শৃঙ্খলিত করে?'

সে লোহিত কে দেখল।

—'শোন, দস্যু বৃত্তি আর সৈন্যপত্যের মধ্যে অনেক তফাৎ। পরিণামের কথা চিন্তা করে দেখেছ কি?'

—'কিসের পরিণাম।?'

—'দেখ তোমার প্রভু আমাকে ধরার জন্য পাঠিয়েছে। আমাকে যদি তোমরা নিয়ে যাও সফল হতে পার। কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণদের তোমাদের পক্ষে বরেন্দ্রতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি?'

—'কেন হবে না?'

—'হবে না বৎস। তোমাকে দেখে আমার সন্তান তুল্য বোধ হচ্ছে।'

—'আপনার কোন সন্তানই নেই।'

—'না নেই।' হাসল লোহিত। 'যদি থাকতো তোমার মতই বয়ঃপ্রাপ্ত হত সে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তোমাদের হাতে ধরা পড়েছি। কিন্তু যেখানে তোমরা ধরেছো তা তোমার প্রভু দিব্যর অধিকারভুক্ত নয়। নির্বিঘ্নে সকলকে বরেন্দ্রতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি তোমাদের পক্ষে?'

—'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

—'বুঝতে পারছো না?'

নীরবে সে তার দিকে চেয়ে রইল।

—'দেখ চলার পথে আমরা বহুগ্রাম, নগর অতিক্রম করেছি। বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আমাদের। পথে সেইসব মানুষের সঙ্গে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ঘটবে। যদি সত্য প্রকাশ হয়?'

শুনে অস্থির হল সে।

লোহিত বলল, 'শ্রমণদের নিজপথে যেতে দাও। আমাকে নিয়ে চল। সেটাই হবে মঙ্গলের।'

এগিয়ে আসছিলেন শূরপাল।

লোহিত বলল, 'প্রবঞ্চনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।' বিপরীত দিকে ফিরে দ্রুত চলতে লাগল সে।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল দিব্যর সৈন্যরা, তারপর লোহিতকে অনুসরণ করল।

স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন শূরপাল। একি হল! এমনতো তিনি চাননি।

ধারণ কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁর। বুদ্ধ ভিক্ষুর দিকে চাইলেন। তিনি বললেন, 'কুমার, এই হয়তো প্রভুর ইচ্ছা।'

একুশ

প্রভাতের সূর্যালোকে গ্রাম্যপথে ধীর মন্থর গতিতে একটি গো-সকট এগিয়ে চলেছে। চালক খুবই সতর্কভাবে সকটটিকে চালিত করছে। সকটটির মাথায় আচ্ছাদন।

ভিতরে শয্যায় এক পুরুষ শায়িত। পায়ের কাছে এক নারী বসে আছে। অবগুণ্ঠনবতী। সকটের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দুই পুরুষ। নগ্ন গাত্র। ভৃত্য শ্রেণীর বলেই মনে হয়।

কদিন অঝোরধারায় বর্ষণ হয়ে গেছে। গতকাল অপরাহ্ন থেকে বর্ষন বন্ধ। নির্মেঘ আকাশ। সূর্য উঠেছে। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে ফিরে চলেছে নারী। সঙ্গে দুই গৃহভৃত্য। পিত্রালয়ে এসেছিল সে। স্বামীর সঙ্গে পক্ষকাল পূর্বে অসুস্থ পিতাকে দেখতে এসে স্বামীই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে ফিরে চলেছে। সংসারে পিতা একা। গৃহভৃত্যরা সঙ্গে চলেছে।

গ্রামের সীমানা পর্যন্ত প্রতিবেশীরা সঙ্গে এসেছিল। ফিরে গেছে সকলে। দক্ষ চালক সাবধানে সকটটি চালনা করছে।

কে যেন চালককে প্রশ্ন করল, 'কে যায়?'

চালক প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করল না।

—'কি ভাই আমার প্রশ্নটা শুনতে পাওনি বলে বোধ হচ্ছে?' প্রশ্নকারী পৌঢ় মানুষটি বলল চালককে।

চালক উত্তর দিল, 'শুনেছি আজ্ঞে।'

—'তাহলে উত্তর দিলে না যে?'

—'প্রয়োজনবোধ করিনি, তাই।'

—'জানতে চেয়ে কি কোন অপরাধ করেছি?'

—'আজ্ঞে তা নয়। তবে....' সাবধানে সকট চালাতে চালাতে চালক উত্তর দিল, 'দেখে অপরিচিত মানুষ বলেই বোধ হচ্ছে। কে যায় বললে কি চিনতে পারবে?'

—তা হয়তো পারব না। তবে অভ্যাসতো। তা যায় কে?'

—'জামাই যায়।'

—'জামাই? কার জামাই বাপু?'

—'পরাণ মণ্ডলের জামাই। বড় দিঘির পাড়ে ঘর।'

—'সেটা....'

. ছোকরা চালক বলল, 'জানি চিনতে পারবে না। তা মশাইয়ের নিবাস কোথা?'

—'নিবাস? কাছেই, কাছাকাছিই থাকি। দক্ষিণের গ্রামে।'

—'সাপুড়ে? কাদের ঘর?'

—'বললে চিনতে পারবে?'

—'কেন পারব না। গাড়ি চালিয়েই খাই। অল্পবিস্তর সব গাঁয়েই যেতে হয়। তা ভিন্ন সাপুড়ে আমার মাসীর বাড়ি। চরণ দলুইয়ের ঘর। আমার নিজের মেসো। নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছো?'

—'না, ইয়ে, সাপুড়ে, এক কুটুমবাড়ি এসেছি আমি।'

—'তা কুটুমের ঘর গাঁ কে নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছ? বলিহারী যাই। ছেলে ছোকরারা উল্টোপাল্টা বলে.....এই হেট হেট, ভোলা, সামলে চল, গাড়ি টানতে দস্যি বিত্তি করবি না, মার খাবি। রুগি মানুষ রয়েছে। সমঝে চল। আচ্ছা মশাই চললুম গো, কাল ফিরে সাপুড়ে যাবার ইচ্ছে রইল। দেখা হবে।'

প্রৌঢ় বেশ খানিকটা তফাতে। রামপাল হেসে উঠল।

গাড়ি চালাতে চালাতে পঞ্চানন্দ পিছন ফিরে জানতে চাইল, 'হাসেন কেন?'

—'তোমার বুদ্ধি দেখে। খুব জব্দ করেছো লোকটাকে।'

পঞ্চানন্দ গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার কিন্তু চিন্তা ধরে গেল। গাঁ পেরুতে না পেরুতেই খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে......' চুপ করে গেল সে।

রামপাল বলল, 'খুবই চিন্তায় পড়েছ দেখছি।'

—'চিন্তা নয়? খুবই চিন্তা। বাবাঠাকুরকে যে মুখ দেখাতে পারব না।'

ভৃত্যরূপী ভীম আর নন্দ সঙ্গে চলেছে। দুজনেই পঞ্চানন্দের সম্পর্কে ভাই হয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠ নন্দ। ভীম পঞ্চানন্দের সমবয়েসী। গ্রামের তিন অসম সাহসী যুবক। উমানাথের একান্ত বাধ্য। তিনি রামপাল আর কান্তাকে পীঠি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্বভার অর্পন করেছেন ওদের ওপর। কিছুটা সত্যও প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তারাও কিছু কিছু জেনেছে। কয়েকজন অপরিচিত মানুষের ঘোরাঘুরি শুরু হয়েছে গ্রামের আশেপাশে। তাদের পরিচয় ওদের কাছে প্রকাশ করেছেন উমানাথ। বরেন্দ্রর গুপ্তচর। কুমার রামপালের সন্ধানে তারা ঘুরছে। কুমারকে রক্ষা করতে হবে।

এখন কুমারের রক্ষার দায়িত্ব তাদের। কুমার গ্রামের জামাই। উমানাথ কান্তার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন।

কদিন আগে উমানাথ বলেছিলেন, 'কুমার, তোমার সন্ধানকারীরা এ গ্রামের আশে পাশেই ওৎ পেতে আছে। কখনো কখনো তাদের মধ্যে দু-চার জন স্থানান্তরে যাচ্ছে, আবার ফিরেও আসছে। সংখ্যায় নগন্য নয়।'

রামপাল নীরবে তাঁর দিকে চেয়েছিল।'

—'যাবার ভিন্ন পথ অবশ্য আছে। পার্বত্য পথ। তবে সে পথ খুবই দুর্গম। আমি অবশ্য পথ প্রদর্শক সঙ্গে দিতে পারি। কিন্তু.......'

বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়েছিল সে।

—'বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।' তিনি বলেছিলেন, 'এ সময় পার্বত্য পথে চলাচল তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সমতলের মানুষ।'

—'তাহলে কি করবো আমি?'

—সেই কথাই চিন্তা করছি। তোমার জন্য কি করা যায়। মহাকালের মন্দিরও আর নিরাপদ নয়। গ্রামের অনেকেই তোমার কথা জেনেছে। কৌতূহল বিপদ না ঘটায়।'

—'আমি নিজেও আর এখানে থাকতে চাই না। দু-একদিনের মধ্যেই এখান থেকে বিদায় হতে চাই।'

—'কিভাবে যাবে?'

—'দেখি।'

চিন্তা করছে রামপাল, কিন্তু কোন পথ দেখতে পায়নি। দিব্যর পাঠান ঘাতকের দল ওৎ পেতে আছে। ত্রৈলোক্য ধরা পড়েছে ওদের হাতে। সে কি সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। মনে হয় না। ত্রৈলোক্য কোন মতেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তার ওপর সে বিশ্বাস আছে। অতীতকে সে ভুলতে চায়।

ত্রৈলোক্য বন্দীশালায় একদিন বলেছিল, 'কুমার অতীতের পঙ্কিল জীবনটার কথা যখন আমার মনে পড়ে, চিন্তা করি কেন এই বেঁচে থাকা। কি হবে বেঁচে থেকে? জন্মেছি যখন, মৃত্যু তো একদিন হবেই। নাহয় দুদিন আগেই চলে গেলাম।'

—'তা যাওনি কেন?'

তার কথা ঠিক বুঝতে পারেনি সে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'কি বললেন?'

—'বলছি, সারসত্য যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ, তখন কিসের আশায় পড়ে আছো?'

শুনে হেসেছে ত্রৈলোক্য। বলেছে, 'সবটুকু উপলব্ধী করতে বড় বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল কুমার। সেই জন্যই যাই-যাই করেও যাওয়া হল না।'

—'এখনওতো যেতে পার।'

—'এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়। বাধার সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যদি বন্দীশালায় না আসতেন ঠিক চলে যেতাম।'

—'তাহলে তুমি বলছো আমি এসে তোমার যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছি।'

—'এক রকম তাই বলতে পারেন। দেখলাম রাজার দুলাল বন্দী হয়ে এলেন। অপরাধ? জানলাম মহারাজের ভাই হওয়ার অপরাধে বন্দীশালায় স্থান হয়েছে আপনার। কি আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো! কেউ নানান কুকর্ম করে বন্দীশালায় এসেছে। কেউ শুধুমাত্র রাজকুমার হয়ে জন্মানোর অপরাধে। কবি গঙ্গাধরের বংশধর তবু নানা কুকীর্তি করে তবেই দণ্ড ভোগ করতে এসেছে, আপনি কিন্তু অপরাধ তো কিছুই করেননি। সেই জন্যই মরতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মরা হল না।'

—'বাঃ সুন্দর। বেশ আত্মজ্ঞান লাভ করেছ দেখছি।'

—'তা জানি না।' হেসেছে ত্রৈলোক্য। 'এখন বেঁচে থাকতে বেশ-ভালই লাগছে। অতীত আর হৃদয়টাকে ক্ষত বিক্ষত করে না। মনের মধ্যে প্রফুল্লতা ফিরে এসেছে। তবে......'

—'আবার কি হল?'

—'কিছু হয়নি। একটু চিন্তা করে ত্রৈলোক্য বলছে, 'মরণ বাঁচন নিজের হাতে নয়, কি বলেন কুমার?'

—'তোমার উপলব্ধী.....'

—'আপনাকে দেখেই। আপনি আমার চৈতন্য জাগ্রত করেছেন।'

এই ত্রৈলোক্য। সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এ তার দৃঢ় বিশ্বাস।

উমানাথ বললেন, 'কুমার তুমি একা। যদি.......'

—'আমার এক সঙ্গী ছিল।' বলেছে রামপাল।

—'জানি।' আমি বলছি সঙ্গীর পরিবর্তে যদি তোমার সঙ্গে সঙ্গিনী অর্থাৎ তোমার স্ত্রী থাকতো তাহলে এখান থেকে যাওয়া অনেকটা সহজ হত।'

রামপাল বৃদ্ধ পূজারীর কথা এক বর্ণও বুঝতে পারেনি।

উমানাথ খুবই গম্ভীর। বলেছিলেন, 'গ্রামের মানুষ এই বৃদ্ধকে খুবই ভালবাসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরিকল্পনায় তারা নিশ্চয়ই অংশ নিত।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল সে।

তিনি বলেছিলেন। শুনেছিল সে। একসময় বলেছিল, 'শুনুন, যা হবার নয় তা চিন্তা করে কি লাভ বলুন। তার চেয়ে আপনি আপনার কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে পার্বত্য পথে পৌঁছে দিন। কারণ এখানে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়বে আপনাদের। আমার সন্ধানে যারা এসেছে তারা যে মূহুর্তে জানতে পারবে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন...... না, আমার জন্য আপনাদের ক্ষতি হ'ক আমি চাই না।'

—'তুমি আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারতে কুমার।'

—'তা কি করে সম্ভব?'

—'অসম্ভব হবে কেন কুমার। তুমিতো অকৃতদার? বিবাহিত হলেও.....' চুপ করেছিলেন তিনি।

বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়েছিল সে।

—'আমি তোমার বিবাহের আয়োজন করতে পারি। তোমার উপযুক্ত পাত্রীও তো আছে। অবশ্য তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি.......' আবার চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি।

—'আপনি.....' কিছু বলতে গিয়েছিল সে।

—আমি কান্তার কথা বলছি কুমার। মহারাজ শশাঙ্কের বংশধর কান্তা। আমি জানি কান্তা তোমার সহধর্মিনী হবার উপযুক্তা।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। একি বলছেন বৃদ্ধ। উনি কি উন্মাদ হয়ে গেছেন! উদ্যৎ ছুরিকা হাতে ঘাতকের দল ওৎ পেতে আছে, যে কোন মুহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর উনি..... নিশ্চয়ই সুস্থ নন।

উমানাথ বলেছিলেন, 'কুমার, আমার পরিকল্পনার কথা কান্তাকে বলেছি। তুমি মনস্থির কর।'

—'পরিণতির কথা চিন্তা করেছেন?'

—'অবশ্যই। যদি কোনভাবে সত্য প্রকাশ হয়? নিয়তিকে রোধ করা যায় না

কুমার। জানি। তুমি কিভাবে বন্দীশালা থেকে মুক্ত হলে? এখানেই বা এসে পৌঁছালে কেন?'

—'জানি না।' আস্তে বলেছিল সে, 'আমি কিছুই জানি না।'

—'বরেন্দ্রর রাজকুমার শত্রু ভয়ে পলাতকের জীবন যাপন করছে। তবে.....' কিছুক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। মুদিত আঁখি। এক সময় ওষ্ঠে মৃদু হাসির সুক্ষরেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, চিন্তা করে দেখ।'

চিন্তা করেছিল সে। সম্ভব নয়। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অন্যকে জড়ানো উচিৎ হবে না। দুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কান্তা মন্দিরে আহার্য নিয়ে আসতো, এসেছে হর্ষ। বলেছে, 'কুমার, দিদির শরীর ভাল নয়। কথাতো শোনে না। নতুন বর্ষা। জলে ভিজে জ্বর বাধিয়েছে।'

—'সেই জন্যই তুমি আমার.....'

—'না হলে কে আসবে বলুন। কাল সারাদিনতো মাথাই তুলতে পারেনি। আজ যা হোক করে উঠেছে। জ্বর অবশ্য নেই আর।'

—'আচ্ছা গতকাল কে পাক করলে?'

হর্ষ বলেছিল, 'সে দিদিই করেছিল। নিষেধতো কানে নেয় না। দাদুর ইচ্ছা ছিল আমরাই পাক করবো। দিদি শুনল না। আমাদের পাক করা অন্ন নাকি মুখে দেওয়া যাবে না।'

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে কান্তা তার আহার্য নিয়ে এসেছে। একটু শীর্ণা হয়ে গেছে যেন। প্রশ্ন করেছে, 'কেমন আছো?'

উত্তরে মৃদু হেসেছে কান্তা।

—'উনি কি গৃহে আছেন?' জানতে চেয়েছে সে।

—'দাদু?' না, স্থানান্তরে গেছেন। পাশের গ্রামে। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরবেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছে কান্তা।

—'আজ কি সাক্ষাৎ হবে ওনার সঙ্গে? ফেরার পর।'

—'দাদু তো রাত্রে এখানেই থাকেন?'

—'থাকেন। তবে মন্দিরে শয্যাগ্রহণ করতে ওনাকে দেখি না।'

—'খুব প্রয়োজন?'

—'হ্যাঁ। আমি স্থির করেছি সন্ধ্যার পরই এখান থেকে চলে যাব আজ।'

—'চলে যাবেন?'

—'হ্যাঁ। কারণ ওনার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চাই না আমার দুর্ভাগ্যময় জীবনের সঙ্গে অন্যের জীবন যুক্ত করতে। তাছাড়া তুমি কেন বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হলে?'

শান্ত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে মুহুর্ত কাল চেয়ে থেকে কান্তা জানতে চেয়েছিল, 'আপনাকে দাদু বলেছে আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছি?'

—'না, তা বলেননি। বলেছেন, তোমাকে তাঁর পরিকল্পনার কথা তিনি জানিয়েছেন।'

—'বলেছেন। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চান।'

—'তুমি কি.........'

বাধা দিয়েছে কান্তা। বলেছে, 'এমনটা হওয়া সম্ভব নাকি? আপনিই বলুন?'

—'আমি কি বলবো?'

—'বলবেন না?' কান্তা সহজ, সাবলীল। 'পলাতক আপনাকে ধরার জন্য বরেন্দ্রর রাজা তাঁর ছদ্মবেশী সৈন্যদের পাঠিয়েছেন। তারা এ গ্রামের আশে পাশেই আছে। বিবাহের পর আপনার সঙ্গে অনশ্চিতের পথে যাত্রা করতে হবে। কোন মেয়ে চায়? তারপর মনে করুন, কোন কারণে যদি ধরাই পড়ে যান, তখন কি হবে? আচ্ছা, রক্ষাই পেয়ে গেলেন। তখন?'

—'কি তখন?' বিস্মিত হয়েছিল রামপাল। বড় রহস্যময়ী কান্তা।

—'মনে হবে, নিশ্চয়ই মনে হবে, একটা শিক্ষা-দীক্ষাহীন গ্রাম্য মেয়েকে কেন গ্রহণ করতে গেলেন। চতুর বৃদ্ধ কেমন ছলনার মায়াজাল সৃষ্টি করে......'

—'না-না, তেমন চিন্তা আসা উচিৎ নয়। আসবে না।'

—'আসবে না?' কান্তা তার মুখের দিকে চেয়েছিল। 'না, কুমার, একথা আমি মেনে নিতে পারছি না। মনের পরিবর্তন হবে না একথা বলা যায় কি? যায়?'

সে কান্তার দিকে চেয়েছিল। তাকে দেখছিল।

কান্তা বলেছিল, 'আরো একটা সমস্যা আছে কুমার।'

—'কি? আবার কোন সমস্যা?'

—'আপনি ধর্মে বৌদ্ধ, আমি হিন্দু। মহারাজ শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। জনশ্রুতি বোধি বৃক্ষ ছেদন করার ফলে শেষ জীবনে তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জানি না এর মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে।' একটু নীরব থেকে কান্তা বলেছিল, 'যা মনোস্থির করেছেন তাই করুন। দাদু ফিরে এলে নিশ্চয়ই তাঁকে পাঠিয়ে দেব।' চলে যাচ্ছে কান্তা।

—'কান্তা।' ডেকেছিল সে।

—'বলুন।' না ফিরেই বলেছিল কান্তা।

—'তুমি যা বললে সব কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

কান্তা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল।

তার কণ্ঠস্বর যেন ককিয়ে উঠেছিল, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না কান্তা।'

—'না-না, ভুল বুঝব কেন। দাদুর প্রস্তাবে যদি সম্মত হতেন তাহলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকত। ভাবতাম.....'

—'কি ভাবতে?'

—'না থাক, শুনে কাজ নেই আপনার। আমি চললাম।'

চলে গিয়েছিল কান্তা। গমন পথ দেখা যায় না। কয়েকদিন ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে একরকম বন্দীজীবন যাপন করছে। শেষরাত্রে প্রাতঃকৃত সারতে হয়। সমস্ত দিন কাটে আশঙ্কায়। জানে প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন উমানাথ। হর্ষ তার সঙ্গীদের নিয়ে মন্দির চত্বরে দিনভর খেলা করে। রাত্রে উমানাথ আসেন। মন্দিরেই থাকতেন তিনি। তার জন্য তাঁকে বাইরে রাত্রি যাপন করতে হয়।

কান্তা চলে যাবার পর অনেকদিন পরে কাঞ্চনের কথা মনে পড়েছিল। জীবনের পট পরিবর্তন হয়েছে। হারিয়ে গেছে কাঞ্চনমালা। বুকের মধ্যে ব্যাথা অনুভব করেছিল।

গভীররাত্রে উমানাথ এসেছিলেন। সন্ধ্যার পর শুরু হয়েছে বর্ষণ। হর্ষ রাতের আহার দিয়ে গিয়েছিল। উমানাথ বলেছিলেন, 'শুনলাম তুমি আজই চলে যেতে চেয়েছিলে।'

—'যেতাম, আপনার জন্যই যাওয়া হল না।'

—'এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে কিভাবে যেতে কুমার?'

—'কিন্তু যেতে তো আমাকে হবেই।'

—'অবশ্যই। সেই ব্যবস্থা করার জন্যই আমি গিয়েছিলাম।'

—'কিছু ব্যবস্থা করলেন?'

প্রদীপের মৃদু আলোয় তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুক্ষণ চেয়েছিলেন বৃদ্ধ। একসময় মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কুমার, বৃদ্ধ হয়েছি, সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞও। তবে ....না কুমার, আমার ভুল হয়নি। কান্তা নির্দ্বিধায় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তাকে কি তুমি তোমার অনুপযুক্তা মনে কর?'

—'না-না, আমি.........'

—'বুঝেছি কুমার। কিন্তু ভবিতব্যকে তো খন্ডন করা যায় না।'

—'ভবিতব্য?'

—'হ্যাঁ কুমার, আগে, মাত্র কিছুদিন পূর্বে কান্তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। বিবাহ হয়নি। যার সঙ্গে বিবাহ হবার কথা, বিবাহের পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে। সে অসুস্থতা দূর হয়নি এখনও। হয়তো মঙ্গলময়ের ইচ্ছা ছিল না।'

—'কিন্তু........'

—'বুঝেছি কি বলতে চাও। জানি, মেনে নেওয়া যায় না।' কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসেছিলেন তিনি। এক সময় বলেছিলেন, কুমার, এই ভবিতব্য।'

—'কি বলছেন আপনি!'

—'বলছি কুমার। আমার কথা অবিশ্বাস করো না। হৃতরাজ্য আবার পুনরুদ্ধার করবে তুমি।'

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে ধ্যানমগ্ন বৃদ্ধের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, 'কুমার, সামনে বন্ধুর পথ। প্রতি পদক্ষেপে বাধা। বিশ্বাস হারিও না। মঙ্গলময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।'

দীর্ঘক্ষণ পরে ধ্যানভঙ্গ হল কুমারের। কান্তা চেয়ে আছে।

—'হর্ষকে নিয়ে এলে হত, না? বলল সে।

—'না।' মাথা নাড়ল কান্তা। মৃদু কণ্ঠে বলল,' কষ্ট হলেও অযত্ন হবে না তার। দাদু আছেন। তিনি বুক দিয়ে আগলে রাখবেন।'

—'তোমার কষ্ট হবে না?'

—'কষ্ট হবে। তবে.....'

—'তবে কি কান্তা?'

মৃদু হাসল কান্তা। বলল, 'দাদু বলেছেন, এরা আপনাকে মগধে পৌঁছে দিয়ে ফিরলেই ভাইকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন তিনি।'

—'আর পৌঁছাতে যদি না পারি?'

—'কেন ভাবছেন একথা?'

ওর দিকে চাইল কুমার। কান্তা সুন্দরী নয়, শ্রী আছে, একটা আলগা শ্রী। গৌরী নয়, চাপা গায়ের রঙ। পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসিনী কান্তা। শ্রীর সঙ্গে একটু রুক্ষতাও মিশে আছে তার সৌন্দর্যের সঙ্গে। কিন্তু এই কি তার বিবাহের সময়? পরিস্থিতি। তবু....কাঞ্চনকে জীবন সঙ্গিনী করার স্বপ্ন দেখেছিল। জননীও সম্মতি দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি সব কিছুই ওলট পালট করে দিল। আত্মরক্ষার জন্য বিবাহ করে নববধূকে নিয়ে পালাচ্ছে পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের বংশধর।

মনে মনে হাসি পেল তার। আবার নিজেকে ধিক্কার জানাতে ইচ্ছা করল। খুবই অন্যায় আর গর্হিত কাজ সে করেছে। এমন করা উচিৎ হয়নি। জীবনটা কি এমন অমূল্য তার? দিব্যর ঘাতকদের হাতে ধরা পড়ে যদি প্রাণ যেত, কি এমন ক্ষতি বৃদ্ধি হত? পাল সাম্রাজ্যের গৌরব রবি অনেকদিন আগেই অস্ত গেছে। প্রদীপের শেষ শিখাটুকু নিভে গেলেই বা। তাছাড়া ভ্রাতা শূরপাল তো আছেন।

তিনি কি আছেন? কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে মগধের পথে যাত্রা করেছিলেন তিনি। বলে গেছেন, তিনি তার জন্য অপেক্ষা করবেন।

মহীপাল আর শূরপাল একই গর্ভজাত। একজনের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ। অন্যজনের স্নেহ-ভ্রাতৃপ্রেম। আগেও চিন্তা করেছে। কেন এমন হয়। বলেছিলেন তিনি। সন্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী। বহুবার তিনি তাকে সতর্ক করেছেন।

আচ্ছা। চিন্তা করল সে। তিনি, শুধু তিনি কেন, রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা

তার এই মুক্তির সঙ্গে যুক্ত কি? মহারাজ মহীপালের অনুসৃত নীতি অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, অপসৃত হয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিবাদ না জানিয়েও প্রতিকারের পথ সন্ধান করেছিলেন অনেকেই। নিশ্চয়ই তাঁদের সক্রিয়তার জন্যই বন্দীজীবনে মুক্তি এসেছে। কিন্তু এ জীবন সে চায়নি। সে চেয়েছিল কলুষ রাজনীতি থেকে মুক্তি। বরেন্দ্রর প্রাসাদ, জীবন, তাকে একটি দিনের জন্যও আকর্ষণ করেনি। রাজকুমার হয়ে জন্মানোর যন্ত্রণা তাকে প্রতি নিয়ত দগ্ধ করেছে। সেই জন্যই সে প্রায় মুক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে বরেন্দ্রর পথে প্রান্তরে।

—'শুনছেন।' অনুচ্চ কণ্ঠে কান্তা ডাকল।

আহ্বান শুনে কান্তার দিকে চাইল সে। তাকে দেখতে লাগল।

—'কি চিন্তা করছেন?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল কান্তা।

—'চিন্তা।' কান্তাকে আবার দেখল। খুবই ম্লান মুখখানি। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'সত্যই চিন্তা করছিলাম কান্তা।' হাসল।

—'কি?' গভীর কণ্ঠস্বর তার।

—'নিজের এই জীবনটার কথা। এই কি জীবন? তুমি কি বল?'

—'নয় কেন?', শান্ত কণ্ঠস্বর তার। 'জীবন নয় বলছেন কেন? কি এমন খারাপ?'

—'কি বলছো তুমি?' বিস্মিত হল। কত সহজ। কি করে সম্ভব? বুঝতে পারল না। ওকে দেখতে লাগল।

—'জীবনের পথ কি মসৃন—জীবনটা? সব কিছুই তো মেনে নিতে হবে।' আস্তে কথাগুলো বলল কান্তা।

—'তুমি পারছো মেনে নিতে?' সাগ্রহে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—'আমার খারাপ লাগছে না, ভালও নয়। কিন্তু কিছু করারও নেই। চিন্তা শুধু আপনার জন্য।'

—'আমার জন্য চিন্তা? বিস্মিত হল। 'কেন, আমার জন্য চিন্তা কেন?'

—'হ্যাঁ। দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি তো সব কথাই বলেছিলেন। আর....'

তার দিকে চাইল সে। দেখতে লাগল। কেমন যেন অপরিচিতা মনে হচ্ছে নববধু কিশোরীকে। তার পত্নী। দুচোখে চাপা আতঙ্কের ছায়া। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুধু মাত্র তিনি বলেছিলেন বলেই তুমি......'

বাধা দিল কান্তা। বলল, 'হ্যাঁ।'

—'জানি। তাই মনে হয়। কর্তব্য পালনের জন্যই যেন.....

—'তাই তো।' হাসল কান্তা। বলল, 'দাদু বললেন......'

—'কি বলেছিলেন তিনি?'

—'বরেন্দ্রাধিপতিকে বরণ করতে।' একটু চুপ করে রইল কান্তা। বলল, 'আমার করকোষ্ঠি বিচার করে তিনি বলেছিলেন, আমার নাকি রাজরানি হওয়ার যোগ আছে।'

—'বরেন্দ্রাধিপতি, রাজরানী! তোমার দাদু কি করকোষ্ঠি বিচার করতে জানেন? একথা কবে বলেছিলেন তিনি তোমায়?'

লজ্জা পেল কান্তা। একটু আরক্ত-ও। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দাদু অনেক কিছুই জানেন।'

—'রাজরানি হবার কথা কবে বলেছিলেন উনি?'

—'তখন অবশ্য বরেন্দ্র বিদ্রোহ হয়নি। অনেক দিন আগে।'

একটু চিন্তা করল সে। কান্তাকে একবার দেখল। লঘু কণ্ঠে বলল, 'তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত রাজরানি হলে?'

চাপা কণ্ঠে কান্তা বলল, 'কথা বলবেন না।' রামপালের শরীরের আচ্ছাদন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠিক করে দিল সে।

—'কে যায় সওয়ারী? দুজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল সকটের কাছে।

পঞ্চানন্দ একবার তাদের দিকে চেয়ে পিক্ করে থুতু ফেলল। কথা বলল না।

—'কি ভাই কথা বলছো না কেন?' একজন প্রশ্ন করল পঞ্চানন্দকে।

—'কি বলবো?' অন্যদিকে চেয়ে কথা বলল পঞ্চানন্দ। 'বলার কি আছে?'

—'জানতে চাইছি, যায় কে?'

—'নাম বললে চিনবে? তাছাড়া জিজ্ঞাসা করবে কেন?'

—'না চেনার কি আছে? আর, জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দেবে। কেন জিজ্ঞাসা করছি আমাদের দেখে বুঝতে পারছো না?'

—'তা পারছি। পঞ্চানন্দ বলল, 'গগণ মণ্ডলের মধ্যম পুত্র।'

—'যাবে কোথা?'

—'নিজের ঘরে। শ্বশুর ঘরে গিয়ে অসুস্থ হয়েছিল, পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।'

—'সঙ্গে আপনজন....'

—'থাকলে যেত নিশ্চয়ই।'

—'তা হয়েছেটা কি?'

—'বৈদ্য জানে। আমার পৌঁছে দেওয়ার কথা। শ্বশুর ঘরের দুই ভৃত্যও চলেছে।'

—'আহারে। শ্বশুর ঘরে আহ্লাদ করতে এসে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। আছে কেমন?'

—'পৌঁছে দেবার মত অবস্থা।'

—'ভাল। খানাখন্দ দেখে সাবধানে যাও ভাই। খুবই দুঃখের ঘটনা। মা জননী সঙ্গে যাচ্ছে। আমার সঙ্গী একজন বৈদ্য। মা জননী যদি অনুমতি করে একবার দেখতে পারে।'

—'দেখে কি করবেন উনি?'

—'না-না, সেজন্য নয়। দূরের পথ তো। জোর নেই, যদি বল।'

—'আমি অনুমতি দেবার কে? ব্যাজার মুখে পঞ্চানন্দ বলল, 'যার স্বামী তিনি যদি বলেন.....'

কান্তা স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'কোন প্রয়োজন নেই। আমার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ। দুর্বল শরীর বলেই এভাবে ওঁকে নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

—'কিন্তু মা, আমার সঙ্গী বৈদ্য চারুকান্ত খুবই ভাল বৈদ্য। যথেষ্ট সুনাম ওঁর। তোমার স্বামীকে যদি একবার দেখেন আপত্তি কেন? আমার মনে হয় আপত্তি করা উচিৎ নয়।'

—'অযাচিতভাবে প্রস্তাব করলে আপত্তি নিশ্চয়ই করবো।' দৃঢ় কণ্ঠে কান্তা বলল, 'আপনারা চলেছেন কোথা?'

—'পিঠী যাব।'

—'বেশ। পিঠীতেই আমার শ্বশুরালয়। ওখানেই আমার স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। উপযুক্ত দক্ষিণাও উনি পাবেন। আর কি বলার আছে আপনার? পিঠীতে আমার শ্বশুর মহাশয় স্বনামধন্য। যদি মনে করেন চলুন আমাদের সঙ্গে।'

অশ্বারোহীদ্বয় আর বাক্যব্যয় না করে এগিয়ে গেল।

পঞ্চানন্দ বলল, 'এরা দেখছি জ্বালাবে।'

ভীম বলল, 'নির্জনতার সুযোগ নিচ্ছে। তবে সামনের প্রান্তর পার হলেই গ্রাম। লোকালয়ে উৎপাত করতে সাহসী হবে না।'

নন্দ বলল, 'আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। যদি বাড়াবাড়ি কারার চেষ্টা করতো উচিৎ শিক্ষা দিতাম।'

কান্তা বলল, 'প্রস্তুত থাক, কিন্তু কোনরকম অঘটন ঘটিও না নন্দ দাদা'

নন্দ বলল, 'সে কথা বাবা ঠাকুর বলে দিয়েছেন দিদি। সেই জন্যই তো হাত নিসপিস করলেও দাঁত চেপে ছিলাম।'

শুনে হাসল রামপাল। বেশ শব্দ করেই।

কান্তা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হল, হাসছেন কেন কুমার?'

—'হাসছি দিব্যর চরেরা কিছু একটা অনুমান করেছে দেখে। শুধু সাহসী হচ্ছে না অসুস্থ মানুষটি সত্যই অসুস্থ না সুস্থ দেখার। তবে রেহাই চট করে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন ভাগ্য।'

কান্তা তার মুখের দিকে তাকাল।

বলল, 'সঙ্গ ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। ঘুরে ফিরে আসবে আবার।'

কান্তা নীরব রইল।

—'খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছো, তাই না কান্তা?'

আয়ত দুই চোখের দৃষ্টি মেলে কুমারের মুখের দিকে চাইল কান্তা। বলল, 'আপনার দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?'

—'হচ্ছে না একথা বলব না। হচ্ছে। তবে যতটা নিজের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি তোমার জন্য। আমাকে রক্ষা করার জন্য তুমি না হয়....কিন্তু আমার সম্মত হওয়া

উচিৎ হয়নি। এখন খুবই অনুতাপ হচ্ছে। তোমাকে আমার অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে জড়িত করে খুবই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি।'

—'এখন কি করবেন?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কান্তা।

—'কি করবো?' ওর মুখের দিকে চাইল। বলল, 'স্থির করতে পারছি না। মনে হচ্ছে এবার ওরা.....'

—'চিন্তা করবেন না।' মৃদু শান্ত কণ্ঠে কান্তা বলল, 'অহেতুক চিন্তা করে কি করবেন?'

—'চিন্তা করতে নিষেধ করছো?'

—'করছি।' মৃদু কণ্ঠে কান্তা বলল, 'প্রান্তর প্রায় পার হয়ে এলাম। গ্রামের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে।'

—'তাতে কি?'

—'ওখানে আমাদের আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট করা আছে। শ্রেষ্ঠী দিবাকর নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

—'শ্রেষ্ঠী দিবাকর! কে তিনি?'

—'জানতাম না। দাদু বলে দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে তাঁর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করবো।'

—'তারপর?'

হাসল কান্তা। বলল, 'তারপর আমি জানি না কুমার।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল রামপাল। পত্নীকে দেখল। বলল, 'দেখছি খুবই সুষ্ঠ পরিকল্পনা তোমার দাদুর।'

কান্তা কথা বলল না।

গ্রাম সীমান্তে কয়েকজন ভৃত্যসহ যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন শ্রেষ্ঠী দিবাকর। মধ্য বয়সী পুরুষ। গ্রামের বেশ কিছু কৌতুহলি মানুষ তাঁকে ঘিরে ছিল। তাদের মধ্যে দুই অশ্বারোহীও। সকট দেখা মাত্র হৈ-হৈ করে উঠলেন দিবাকর, আস্তে আস্তে, দাঁড়াও ভাই চালক। আজ প্রত্যুষে সংবাদ পেয়েছি পিঠীর স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্বশুরালয়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েই শ্বশুরালয় থেকে পিঠী যাত্রা করেছেন। না-না, এ বড় অন্যায় হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘপথ পরিক্রমা সঙ্গত হবে না। ভাই চালক, তুমি সাবধানে সকট চালিয়ে আমার গৃহে চল। অভিজ্ঞ বৈদ্যরাজ মুকুট সেন পিতৃদেবকে দেখবার জন্য আজ অপরাহ্নেই আমার গৃহে আসছেন। তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্রেরও সুচিকিৎসা করতে পারবেন নিশ্চয়ই।

গ্রামবাসীদের কয়েকজন সমর্থন করল, 'তাই করুন দিবাকর।

দিবাকর বললেন, 'নিশ্চয় করবো। এ আমার কর্তব্য।'

পঞ্চানন্দ শ্রেষ্ঠী গৃহের দিকে সকট চালনা করল। অনুগামী হল গ্রামবাসীরা।

সকলে চলে যাবার পর দুই অশ্বারোহী পরস্পরের দিকে তাকাল।

একজন বলল, 'আমাদের সন্দেহ তাহলে সঠিক নয়।

চিন্তিতভাবে অন্যজন বলল, 'কুমার কিন্তু যায়নি।'

—'কোথায় আছে তাহলে?'

—আছে কোথাও। খুঁজে তাকে বার করতেই হবে। তবে এই বণিকের গৃহেও দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের।'

দুজনে আবার ফিরে চলল।

শ্রেষ্ঠী দিবাকর কান্তার পরিচিত। বললেন, 'শোন ভগ্নী, ঠাকুর এসে সব কথাই বলে গেছেন। চিন্তার কোন কারণ দেখছি না। আমরা কয়েকজন বণিক শীঘ্রই বাণিজ্য যাত্রা করবো। তোমরা আমাদের সঙ্গে যাবে। কুমার, কয়েকদিন গরীবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।

রামপাল বলল, 'আমিও তাই মনে প্রাণে চাইছিলাম।'

দিবাকর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

হাসল রামপাল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'অনেক দিন নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবকাশ মেলেনি। কয়েকদিন যদি আপনার গৃহে অবস্থান করতে হয় আমি দিবারাত্র নিদ্রা যাব।'

দিবাকর হেসে উঠলেন।

গৃহের নারীরা কান্তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল।

কুমারের সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন দিবাকর। উমানাথের কথাও বললেন। উমানাথকে সেই বাল্যকাল থেকে দেখছেন তিনি। সাঁওতাল পরগণার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষেরই মহাকালের মন্দিরে যাতায়াত আছে। চৈত্রমাসে মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েক দিনের জন্য মেলা বসে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেলা। সব সম্প্রদায়ের মানুষই যোগ দেয় সেই মেলায়। আদিবাসীরা শিবের উপাসক। তারা নিজেরাই অর্চনা করে। পিতামহের সঙ্গে দিবাকর মেলায় গেছেন। ঠাকুর উমানাথের সঙ্গে পিতামহের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। শুনেছ আগে নাকি তাঁরা দরিদ্র ছিলেন। উমানাথের পরামর্শে পিতামহ তাঁর তিন পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠান। গ্রাসাচ্ছদনের শষ্যক্ষেতটুকু সে সময় বিক্রয় পর্যন্ত করতে হয়েছিল। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়েছিল। দূর হয়েছিল দারিদ্র্য। উমানাথের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছিল।

দিবাকর বললেন, 'পিতা সংসারের কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর জন্যই সংসারের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। ঠাকুর খুবই স্নেহ করেন আমার পিতাকে। পিতা শয্যাশায়ী হওয়ার পর বেশ

কয়েকবার দেখতে এসেছেন। এবারও এসেছিলেন। বলে গেছেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। ভগ্নী কান্তার বিবাহের কথাও তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেন।'

—'কিন্তু.....'

দিবাকর কয়েক মুহূর্ত কুমারের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর বললেন, 'আপনার আশঙ্কার কথা বুঝতে পেরেছি। জানি আপনার সন্ধানে যারা এসেছে তারা কত সক্রিয়। আমার অনুচরেরা সব সংবাদই জানিয়ে যাচ্ছে।'

—'আপনার অনুচর!'

—আজ্ঞে হ্যাঁ কুমার। ঠাকুরের কাছে শোনার পর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে আমাকে। যেহেতু ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী আমি, সেই জন্যই মন্দিরের আশ্রয় থেকে আপনাকে নিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর আপনার সন্ধানে যারা এসেছে তাদের সংখ্যা কিছু কম নয়।'

—'তাদের সংখ্যা কত জানেন?'

—'সঠিক বলা সম্ভব নয়, কারণ দলবদ্ধভাবে তারা নেই। তবে ঠাকুরের গ্রামে যে আপনি আত্মগোপন করে আছেন এ সংবাদ তারা জেনেছিল।'

—'আচ্ছা.....'

দিবাকর তার মুখের দিকে চাইলেন।

—'আমার একজন......'

—'সঙ্গী ছিল। তিনি আপনার অনুসন্ধানকারীদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন।'

—'কোথায় আছে সে?'

—'সঠিক বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েকদিন আগে তাকে দেখা গিয়েছিল।'

শুনে গম্ভীর হল রামপাল। কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করার পর জানতে চাইল, 'আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। কবে আপনারা বাণিজ্য যাত্রা করবেন?'

দিবাকর হাসলেন। বললেন, 'আপনার যাত্রাকাল সম্পূর্ণভাবে আমার খুল্লতাতের ওপর নির্ভর করছে।'

—'তবে যে বললেন, একদল বণিক শিঘ্রই বাণিজ্য যাত্রা করবেন?'

—'অবশ্যই। আমি সেই ভাবেই চিন্তা করেছি। তবে খুল্লতাত আজ অথবা আগামীকাল বৈদ্যরাজ মুকুট সেনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আলয়ে আসছেন। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবো।'

—'বণিকরা কি এই গ্রাম থেকে বাণিজ্য যাত্রা করবেন?'

—'না, কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে আমরা কয়েকজন বণিক আছি। আদিবাসীদের প্রস্তুত করা দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করি আমরা। এছাড়া আছে উৎকৃষ্ট মধু। আমার দুই খুল্লতাতের একজন থাকেন রাজগৃহে, অন্যজন চম্পায়। আমি নিজে দুই স্থানেই থাকতাম। পিতা অসুস্থ হওয়ার পর এখানেই আমাকে বেশি সময় থাকতে হয়। খুল্লতাতদের কেউ এলে আমি যাই। আমার দুই খুল্লতাতই নিঃসন্তান।'

আহারাদির পর কথা বলছিল দুজনে। বাইরে অপরাহ্নের আলো। কদিন বর্ষণের পর নির্মেঘ আকাশ আজ। উজ্জ্বল প্রকৃতি। দিবাকর বিদায় নিলেন একসময়।

নীরবে বসে রইল সে। মধ্যমাকৃতি গৃহটির পশ্চাদ্‌ভাগ এটি। কক্ষটিতে দিনের আলো বেশ কম। নিরাপত্তার কারণেই তাকে এখানে আশ্রয় দিয়েছে। জানিয়েছেন দিবাকর।

একাকী বসে রইল সে। দিন শেষ হল। ভৃত্য এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কান্তাকে অন্তঃপুরবাসিনীরা নিয়ে গেছেন। দিবাকর মধ্যাহ্নে তার সঙ্গে আহার করেছিলেন। রাত্রে একাকী আহার করতে হল তাকে। ভৃত্যরা আহার্য্য নিয়ে এসেছিল। তাদের কাছেই শুনল দিবাকর গৃহে নেই।

শয়নের ব্যবস্থা করে দিল ভৃত্যরা। রাত্রি গভীর হচ্ছে। কুমার শয্যা গ্রহণ করল।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কাঞ্চনের কথা মনে পড়ল। জননীর। বিগত দিনগুলিকে। জীবনের সঙ্গে কান্তাকে যুক্ত করা তার উচিৎ হয়নি বোধহয়।

কথোপকথনের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হল। বর্ষিয়সীকে চিনতে পারল। দিবাকর পত্নী। কক্ষে প্রবেশ করল কান্তা। দ্বার রুদ্ধ করল, অর্গল দিল না। ধীর পদক্ষেপে শয্যার কাছে এগিয়ে এল সে। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'কুমার।'

সে সাড়া দিল না।

কান্তার মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'গৃহস্বামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। বৈদ্যরাজ এসেছেন। আপনি কি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না?'

কুমার নীরব।

—আপনি নিদ্রিত নন। নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমি পরিচিত।' একটু নীরব রইল সে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জানি, স্বীকার করতে অস্বস্তি হচ্ছে। বিশ্বাস করুন এ ভিন্ন অন্যপথ।....'

—'থামলে কেন কান্তা?'

—আপনি সু-পুরুষ। সুন্দরী পত্নী লাভ.......'

—'ঠিক কথা। তুমি যে সুন্দরী নও জানি। তবে.....'

—'কি?'

—'আমার পাশে বসো। শোন, তোমার আচরণ কিন্তু খুবই বিসদৃশ।'

—'কি বলছেন!'

—'বলছি। আমি হয়তো তোমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু তুমিও তো পারনি কান্তা।

—'পারিনি। একি বলছেন?' অস্ফুট স্বরে কান্তা বলল।

—'আমার অভিযোগ মিথ্যা নয় রাজকুমারী।'

—'রাজকুমারী? কাকে বলছেন?' অবাক হল কান্তা। 'আপনার কি বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে, না, পরিহাস করছেন?'

—পরিহাস নয় কান্তা। সম্রাট শশাঙ্কের রক্তধারা তোমার শরীরে বইছে। গোপাল আর....না, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি এখনও পারছি না। অবিশ্বাস্য। তাই না?'

কান্তা স্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

—'তুমি আমাকে স্বীকার করতে পারনি কান্তা। আমি জানি.....'

—'না-না.....' আর্তনাদ কর উঠল কান্তা।

—'তাই। এখনো সেই রাজকুমার। কিন্তু রাজ্য কোথায় কান্তা? ছিল-নেই। রাজকুমারের মিথ্যা পরিচয় বহন করে কি লাভ বল?'

পাশে বসে তার হাত ধরল কান্তা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এত হতাশা কেন?'

—'আমার যে কিছুই নেই কান্তা। সব শেষ হয়ে গেছে।'

—'সব শেষ তো হয় না। তুমি তো রয়েছো।'

—'আমি। আমি কি করবো? কি করতে পারি? সাধ্য কোথায়?'

—'জানি না।' মৃদু কণ্ঠস্বর তার, 'মনটুকু তো আছে।'

—'শুধু মনটুকু নিয়ে কি করবো আমি?'

—'আগামী দিনের স্বপ্ন দেখবে। স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করবে। মহারাজ দেব পাল তো পেরেছিলেন। তুমি কেন পারবে না।'

—'কান্তা!'

—'মিথ্যা চিন্তা কোর না।' কুমারের দুটি হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, 'আমি তো তোমার সঙ্গে আছি।

—'তুমি!' বিস্ময়ে চমকে উঠল কুমার। স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মন হল, যেন সেই মুখ, সেই.....দুহাতের মধ্যে কান্তার মুখটি নিয়ে দেখতে লাগল। দেখার যেন শেষ আর হয় না।

বাইশ

অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরের কাছে একটা পরিত্যক্ত গৃহ দীর্ঘদিন ধরে কালের ঝড় ঝঞ্ঝায় ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। গৃহটি খুবই ছোট। মাত্র দুটি প্রকোষ্ঠ। গঠন শৈলীও ভিন্ন ধরণের। বেশ উচ্চ ভূমির ওপর গৃহটি নির্মিত। অন্তঃপুরের দিকে পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়ালে ওটি যে গৃহ বোঝবার উপায় নেই। তিন দিকে খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে। কিন্তু ওটি দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র আয়তনের গৃহ। রক্ষীগৃহ। অন্তঃপুরকে রক্ষার জন্য কে নির্মাণ করেছিলেন, কতদিন পূর্বে, সে সংবাদ রোহিণীর

জানা নেই। বাল্যে তিনি একবার পরিত্যক্ত গৃহটি গিয়ে দেখেছিলেন। তখন ইচ্ছা মত অনেক কিছুই করতেন তিনি। কারো নিষেধ কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করতেন না।

রামপাল জননী যৌবনশ্রীর অনুরোধ এবং যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন নি। তরঙ্গময়ী নাম্নী প্রয়াত মহীপালের রক্ষিতাকে যতই ঘৃণা করুন, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। পূর্ণকে বলেছিলেন, 'পূণ্য, তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

পূর্ণ তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'গোপনে?'

বিরক্ত হয়েছিলেন রোহিণী। এখন সব সময়েই তিনি পূর্ণর ওপর বিরক্ত হন। বলেছিলেন, 'গোপনে না হলে তোকে বলার প্রয়োজন কি আমার।'

পূর্ণ বলেছিল, 'তা বটে।'

—কাজটা করতে পারবি কি-না? পাঁচ কান করবি না। বুঝলি।'

পূর্ণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে জানতে চেয়েছিল, 'আজ পর্যন্ত তোমার দেওয়া কোন্ কাজটা করতে পারিনি শুনি?'

—'কাজটা ভিন্ন ধরণের। শত্রুর দল চারিদিকে ওৎ পেতে আছে। বুঝতে পারলি আমার কথা?'

ব্যাজার মুখে পূর্ণ বলেছিল, 'কাজ-কাজ, ধরন-ধারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না। বল কি করতে হবে শুনি।'

একটু নীরব থেকে রোহিণী বলেছিলেন, 'তোকে একবার উদ্যান বাটিতে যেতে হবে।'

অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে পূণ্য বলেছিল, 'গেলাম।'

—'মহীপালের রক্ষিতা সেখানে থাকে জানিস তো?'

—'রাজ্য শুদ্ধ মানুষ জানে। আগে বয়স্য লোহিতের.....সব জানি। ও নিয়ে ভাবতে হবে না।'

—'আবার!' বিরক্ত হয়েছিলেন রোহিণী। বলেছিলেন, 'তোকে যা বলবো তুই শুধু তাই করবি।'

—'বল।' ব্যাজার হয়েছিল পূর্ণ।

—'তোকে সেখানে যেতে হবে। যা বলে দেব তাই করবি। তোকে তার মনোভাব জেনে আসতে হবে। সে কি চায়। যদি ইচ্ছা করে আশ্রিতা হতে পারে। তবে বক্ বক্ করবি না। যা বলে দেব শুধু সেইটুকু বলবি। পারবি?

শুনে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ রোহিণীর দিকে চেয়েছিল সে। ঠাকরুণের কি মতিভ্রম হয়েছে! মহারাজ যখন উদ্যানবাটীতে রক্ষিতাকে আশ্রয় দিলেন, সে সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছাবার পর বৃদ্ধা রোহিণী সিংহীনির মত ফুঁসে উঠেছিলেন সেদিন। আবার....কি বিচিত্র সংসারের গতি প্রকৃতি। পূর্ণ বলেছিল, 'কিছু বলাটা আমার উচিৎ হবে না।'

—'কি বলবি তুই? অবাক চোখে পূর্ণর দিকে চেয়েছিলেন তিনি।

—'দাসীর কিছু বলা শোভা পায় না। আর বলতে যাবইবা কেন। দাসী বইতো কিছু নয়।

—'বল, শুনি।' গম্ভীর গলায় বলেছিলেন রোহিণী।

—'এই যে.......না, থাক। বলে হবেই বা কি।'

বাধা দিয়েছিলেন রোহিণী, 'বুঝেছি।' মনটা কোন কারণে প্রসন্ন ছিল। বলেছিলেন, 'বংশের গৌরব জড়িত রে।'

হাঁ হয়ে গিয়েছিল পূর্ণ। উদ্যান বাটিতে যেতে হয়েছিল তাকে। দেখেছিল মহারাজের রক্ষিতাকে। সুন্দরী? কে বলে সুন্দরী। সৌন্দর্যের ছিঁটে ফোঁটা দেখতে পায়নি। মাজা গায়ের রং, কালোই বলা চলে। ম্লান -বিষন্ন মূর্তি। তবে.....হ্যাঁ, বৃদ্ধা পূর্ণর দৃষ্টি এড়ায়নি প্রকৃত সত্য- শরীর। দুই চোখ, ওষ্ঠদ্বয়, বক্ষদেশ—পূর্ণ যৌবনা নয়, অটুট যৌবনা। যৌবন যেন ফেটে পড়ছে শরীরে। পুরুষের কামাগ্নি প্রজ্বলিত করার ইন্ধন। এমন শরীর.....

—'বলুন।' কথা বলেছিল তরঙ্গ।

—'আমি পূর্ণ, ঠাকরুণ আমাকে পাঠিয়েছেন।' তরঙ্গকে দেখেছিল পূর্ণ। 'কিছু কথা বলতে এসেছি।'

—'আজ্ঞা করুন।'

—'আজ্ঞা? না, আমি ঠাকরুণের দাসী। সেই কোন কাল থেকে ঠাকরুণের দাসীবৃত্তি করছি।'

—'তাঁর আজ্ঞা।' ম্লান কণ্ঠে তরঙ্গময়ী বলেছিল, 'বলুন, কি বলেছেন তিনি।'

—'তুমি কি করতে চাও?' হ্যাঁ, জানতে চেয়েছেন ঠাকরুণ। আমায় জেনে যেতে বলেছেন।'

—'কি করব আমি! আমার তো কিছুই করার নেই।' হতাশ কণ্ঠস্বর তরঙ্গর। যেন কান্না জড়ানো।

—'কোথায় যাবে?' সতর্ক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল পূর্ণ।

—'যাব কোথায়?' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। 'কোথায় যাবার কথা বলছেন?'

—'তোমার.....।' কথাটা শেষ করেনি পূর্ণ।

—'ছিল না বলব না। ছিল। আছে কি নেই জানি না।' একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, যদি থাকে, যাব কেমন করে!'

—'তোমাকে কে নিয়ে এসেছিল?' হঠাৎ-ই প্রশ্ন করেছিল পূর্ণ।

—'কে নিয়ে এসেছিল? একটু নীরব ছিল তরঙ্গ। বলেছিল, 'না, আমায় কেউ আনেনি। এসেছিলাম আমি।'

—'সৃষ্টি ছাড়া কথা। বুঝলাম না। কেউ নিয়ে না এলে কি আসা যায়? কেউ আসতে পারে? পারে না।'

—'বুঝবেন না। বোঝাতে পারব না আপনাকে। আমার ভাগ্য আমায় নিয়ে এসেছিল। বিশ্বাস করুন।

—'এখন?'

—'জানি না।' বিষন্ন কণ্ঠস্বর। 'সত্যই জানি না, শেষ পর্যন্ত কি হবে।'

পূর্ণর কষ্ট হয়েছিল। নারীর জন্য নারীর কষ্ট। হয়। আবার দেখেছে নারীর কষ্টে নারীর আনন্দ। রাজবাড়ির দিনগুলোতে কত কিছুই দেখল। আরো কতকি দেখবে তার ঠিক কি। বলেছিল, 'শোন বাছা, যে জন্য তোমার কাছে আমার আসা। তোমার ব্যবস্থা ঠাকরুণ যদি করেন, তুমি কি তা মেনে নেবে?'

—'মেনে না নেওয়ার তো কিছু দেখছি না।' অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'সত্যই আমার ব্যবস্থা তিনি করবেন?'

—'তবে এখানকার মত রাজভোগ সেখানে হয়তো পাবে না। সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে হবে। চিন্তা করে দেখ।'

—'চিন্তা করার তো কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন। আমার ভাগ্য।'

—'ভাগ্য বলছো?' অবাক হয়েছে পূর্ণ। 'এখানে কত প্রাচুর্য্যের মধ্যে ছিলে। শুনেছি নতুন রাজাও নাকি.......'

—'না। প্রাচুর্য্যের জীবন-যাপন আমি করিনি।' হেসেছিল তরঙ্গময়ী। কেউ বিশ্বাস করবে না—তাই না?'

পূর্ণ কথা বলেনি। বুঝতেও পারেনি। রাজার রক্ষিতা দীন-হীনের জীবন যাপন করেছে এটা হয় নাকি? দেখেওছে, দেখেছে, বলতে শুনেছে। শোন আর দেখার মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই, যে দেখেছে, সে যদি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে না বলে। বলেছিল, 'শোন বাপু, আমি গিয়ে বলছি। তুমি তৈরী থেকো।'

গিয়েছিল মধ্যাহ্নে। বদন তখন ধারে কাছে ছিল না। সাঁঝবাতি জ্বলার পর দেখা। এক গাল হেসে শুধিয়েছিল, 'মাসী, ভরদুপুরে গুটি গুটি কোথায় যাচ্ছিলে গো?'

—'আমি যাচ্ছিলুম'? কোথায় দেখলি শুনি?' কথাটা ভাঙ্গতে চায়নি পূর্ণ।

বদন বলেছিল, 'ওই মনে হয়েছিল আর কি। দূর থেকে দেখা। মনে হল তুমিই যেন। ভুলও হতে পারে।'

—'তাই বল। সঠিক দেখিস নি?' নারে, যাব কোথা। ঠাকরুণের কাছেই ছিলুম।'

বদন চুপ করেছিল। কদিনের মধ্যেই সংস্কার হয়েছিল জীর্ণ কুটি। তরঙ্গময়ী তার দাসীকে নিয়ে এসে উঠেছিল সেখানে। তখন শেষ বর্ষা। এখন শরতের মধ্য ভাগ চলছে। সন্ধ্যায় একটু গা শির শির ভাব। ভোরের দিকেও। তবে এখনও কাঁথা গায়ে দেবার সময় আসেনি। দুপুরের চড়া রোদে বেশ কষ্ট হয়। তবে দিব্য একটু গুঁই গুঁই করেছিল নাকি। শোনা কথা। রোহিণীর দাপটে কথা বলতে পারেনি।

পুকুর ধারে বসে তার কাছে প্রায়দিনই গল্প শোনে বদন। পালবংশের কথা শুনতে

চায়। পূর্ণ ঠাকরুণকে সুধায়। পালবংশের কথা ঠাকরুণের কণ্ঠস্থ। মনমর্জি ভাল থাকলে বলেন। বদনকেও বেশ পছন্দ করেছেন। একটু লেলাখেপা হলে কি হয়, কাজের লোক।

নতুন রাজার সঙ্গে অন্তঃপুরের খুব একটা যোগাযোগ নেই। রোহিণী নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়েছেন। তবে রাজ্যটা চলছে। অনেক নাকি শান্ত হয়েছে। অভিজ্ঞ মন্ত্রীর দল হাল ধরেছেন।

বদনের কাছে একদিন কথাটা বলেছিল পূর্ণ। শুনে সে এমনভাবে তার দিকে চেয়েছিল, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে। বলেছিল, 'কি রে, অমন হাঁ করে আমার মুখের দিকে কি দেখছিস?'

—'তোমায় নয় মাসী।'

—'আমার মুখের দিকেই তো চেয়ে আছিস বাছা।' বলেছিল পূর্ণ।

—'তা আছি। ভাবছি, যা বললে তুমিই বললে কিনা।'

—'আমিই তো বললামরে।' পূর্ণ বলেছিল, 'যা শুনি তাই বলেছি তোকে। মানুষ বলাবলি করে তো।'

—'বলেছ ভাল করেছো। এই কথাই বলবে। কখনো বে-ফাঁস কিছু বলে ফেল না যেন।'

—'বে-ফাঁস বলতে যাব কেন? যা শুনছি, তোকে জানালাম। নতুন রাজা কি রাজ্যটা খারাপ চালাচ্ছে?'

—'তুমি কি রাজার দলে?'

—'দল, কিসের দল?' অবাক হয়েছিল পূর্ণ। 'এখানে দলাদলি আসছে কোথা থেকে শুনি? বাইরে বেরুতে হয়, যা শুনি তোকে বিশ্বাস করে বললাম।'

—'আমাকে বলেছ, বলেছ। অন্যকে কিছু বলতে যেও না। দিন কাল ভাল নয়। নতুন রাজার চর চারিদিকে থিক থিক করছে।'

—'চর তো আগেও ছিল।'

—'ছিল। থাকে। তবে এখন অনেক গুণ বেশি। আর কে চর, কেন নয়, বোঝার যো নেই।'

পূর্ণ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুই এত কথা জানলি কেমন করে? কে বলল তোকে?'

—'তোমার মতই আমিও জেনেছি মাসী।' দাঁত বার করে হেসেছিল বদন। 'ঘোমটা টেনে ঘরে বসে থাকি না।'

শুনে চুপ করেছিল পূর্ণ। চিন্তা যে করেনি তা নয়, চিন্তা করেছে। মহারাজ বিগ্রহ পালের সময় থেকেই রাজবংশের অবস্থা খুবই পড়তির দিকে। জ্ঞাতি শত্রুতায় জর্জরিত। শুনতে পায় জ্ঞাতিরা এখন নতুন রাজার আশ্রিত হয়েছে। দিব্যি আছে নাকি। আবার অনেক কিছুই চিন্তা করে না। কি হবে মিথ্যে চিন্তা করে। এখনতো তার মৃত্যুর বয়স। ধরাধাম থেকে চলে যাবার সময়। তবু......কেন যে আবার জড়িয়ে পড়ল। কোন

প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজনটাই বা কিসের। সে সময় আর নেই। কেউ পায়, জীবন ভোর কেউ বঞ্চিতই থেকে যায়। সে শেষোক্ত দলে। তাহলে?

বদনকে বলল, —'তোর হালচালও আমি সুবিধের বুঝছি না বাপু। কি যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটাবি!'

বদন বলল, —'একথা তোমার মনে হল কেন মাসী। আমার হালচাল কি দেখলে শুনি?'

—'কারণ আছে বাছা। শুনতে পাই রাতে নিজের কুঠুরিতে ঘুমাস না। মরতে যাস কোথায়?'

—'জানাটা মিথ্যে নয় তোমার। সত্যিই তাই। বিশ্বাস কর। ঘরের মধ্যে তিষ্ঠুতে পারি না।'

—'রাতে থাকিস কোথায়? করিস কি?'

—'থাকি যেখানে হ'ক। চোখে আমার ঘুম নেই। সেই ছোট বয়েসে মাথায় আঘাত লাগার পর থেকেই।'

—'বুঝলাম, কিন্তু ওই রক্ষিতার ওদিক পানে যাওয়া আসা কেন শুনি?'

—'যাই না বলব না, যাই। যাই তো সর্বত্র। সংবাদটা তোমাকে যে দিয়েছে মিথ্যে বলেনি। কেউ তাহলে আমায় নজর করে। কে দেখেছে মাসী? জান কিছু?

—'কেউ আবার কি, স্বয়ং ঠাকরুণ দেখেছে তোকে।' চিন্তা করে পূর্ণ বলেছে, 'চোখ কিছুটা ঝাপসা হলেও তোর চলনে ধরেছে রে।'

—'ঠাকরুণ?' অবাক হয়েছে বদন। বলেছে, 'বলকি মাসী। ছিঃ ছিঃ।'

—'হ্যাঁ। মনে করেছিস অথর্ব বৃদ্ধা বিছানায় পড়ে কোঁকায়? ভেবে থাকলে ভুল করবি। এক সময় দেখেছি রাতের অন্ধকারে চারিদিক ঘুরে বেড়াতে। আজও সে অভ্যেস যায়নি। চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি। বুঝলি। সাবধান হবি।'

বদন চুপ। মুখে রা নেই। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে পূর্ণর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

—'সাবধান বাছা। নিজের বিপদ ডেকে আনিস নি।' সহানুভূতির সুরে পূর্ণ বলেছে, 'আমি তোর ভাল চাই রে।'

শুনে হাসল বদন। বলল, বিপদ কেউ ডেকে আনে না মাসী, বিপদ আসে। বলছো যখন এবার থেকে নিশ্চয়ই সাবধান হবো। তবে রাতের বেলায় আমায় যেন নিশিতে ডাকে। সেই ছোটবেলা থেকে। তবে তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, এবার সাবধান হবো।'

—'হলে ভালই করবি। তোর জন্যে আমার চিন্তা হয়। কি যে বিপত্তি ঘটাবি!'

—'আমার জন্যে তুমি যে চিন্তা কর, শুনে বড় ভাল লাগল মাসী।' বদন পূর্ণকে দেখল। বলল, 'বিশ্বাস কর, আমার জন্যে সংসারে চিন্তা করার মত কেউ নেই। আর ঠাকরুণ যদি কোন কথা তোলেন তাঁকে জানিয়ে দিও আমায় সমঝে দিয়েছো তুমি। কেমন।'

পূর্ণ কথা বলল না। দুপুরের রোদ হেলছে। সন্ধ্যা এখন খুবই তাড়াতাড়ি হয়। দেখতে দেখতে সূয্যিঠাকুর পাটে বসেন। অন্ধকার নামে। অন্ধকার নামার আগেই অন্তঃপুরের প্রধান দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকরুণের ব্যবস্থা। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে ওঠে। দাসী পরিচারিকার সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে। অনেক কাজই নিজেদের করে নিতে হয়। মহারাজের তিন পত্নী আর তাঁদের বেশ কয়েকটি মেয়ে। রাজরানি ছিল সকলে। স্বামীর আদর সোহাগে হয়তো বঞ্চিত ছিল, কিন্তু অন্য কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এখন তাঁদের মুখের দিকে তাকান যায় না। দেখলে কষ্ট হয়। যদিও মেজ রানিকে পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক এসেছিল। ঠাকরুণ সম্মতি দিয়েছেন। হয়তো দু'চার দিনের মধ্যেই চলে যাবেন মেজরানি। আর দুজনের কি হবে জানে না। ঠাকরুণের দৈহিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। তিনি চলে গেলে কি হবে? দেখবে কে? এছাড়া আশ্রিতা আত্মীয়রাও আছেন। তাঁদেরইবা কি হবে!

পূর্ণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সন্ধ্যে হয়ে এল।'

বদন বলল, 'চলে যাচ্ছ মাসী?'

—'হ্যাঁরে, দিন পড়ে আসছে। আর বাইরে থাকা ঠিক হবে না।'

—'তোমার কি শরীরটা আজ ভাল নেই মাসী? দেখে মনে হচ্ছে?'

—'শরীর?' বদনের দিকে চাইল পূর্ণ। বলল, 'এ বয়েসে শরীর ভাল থাকে নারে। মনটাও ভাল নেই।'

—'কেন, কি হল মাসী?' উদ্‌গ্রীব হল বদন। 'আমায় বল, কি হয়েছে।

—'হয়নি কিছু। কি হবে সেই কথাই চিন্তা করলে মনটা খারাপ হয়ে যায় রে। কি ছিল, আর....'

চলে গেল পূর্ণ। বদন সেখানেই বসে রইল।

পরপর রাত্রি জাগরণে কাটছে যৌবনশ্রীর। দুরন্ত প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। কিন্তু কেউ এল না। বলে গিয়েছিল কুমারের সংবাদ পৌঁছে দেবে। কোথায়?

আজও শয্যায় শুয়েছিলেন যৌবনশ্রী। গভীর রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। অন্ধকার আকাশ। অগুনতি তারার মালা মিট-মিট করছে। অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুকের মধ্যেটা গুমরে উঠল।

দু চক্ষু জ্বালা করছিল যৌবনশ্রীর। তিনি আর পারছেন না। উদ্বেগে বড় কাতর। একটু আশার আলো দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন.....না, সে আলো নিভে গেছে। কুমারের কোন সংবাদ আর হয়তো পাবেন না।

একটু কি খুট্ করে আওয়াজ হল? না, ভুল শুনেছেন। তাই মনে হল তাঁর।

আবার একটু আওয়াজ। এবার আর ভুল হল না। শয্যায় উঠে বসলেন। উত্তেজনায় সর্ব শরীর থর-থর করে কাঁপছে।

—'শান্ত হোন মহারানি।' গবাক্ষের ওপার থেকে চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—'আমি.....আমি.....' কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর।

—'শুনুন, কুমারের নতুন সংবাদ এসেছে।' কণ্ঠস্বর বলল, 'গত রাত্রি শেষ প্রহরে সংবাদ পাওয়া গেছে।'

—সে ভাল আছে তো? কোথায় আছে? কেমন আছে?'

—'হ্যাঁ, ভাল আছেন। সস্ত্রীক মগধের পথে যাত্রা করেছেন। এই সংবাদ এসেছে।'

—'স্ত্রী!' যৌবনশ্রীর মনে হল তিনি বোধ হয় ভুল শুনলেন। বললেন, 'কার স্ত্রী? কুমার তো....'

—'যে সংবাদ এসেছে তাই জানাচ্ছি। সঙ্গে স্ত্রী আছে তাঁর।

—'না-না, তা কেমন করে হয়? তার তো বিবাহ হয়নি। না, এ সংবাদ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

—'হয়তো বিবাহ করেছেন তিনি।'

—'বিবাহ করেছেন।' কথাটা বিদ্রুপের মত শোনাল। গবাক্ষের দিকে চাইলেন তিনি। বললেন, 'বন্দী জীবন থেকে পলাতক কুমার বিবাহ করেছে? এই কি তার বিবাহ করার সময়? কি করে সম্ভব।

সামান্য নীরব থাকার পর কণ্ঠস্বর বলল, 'এই সংবাদ এসেছে। তিনি সস্ত্রীক....'

—'এ সংবাদের মধ্যে সত্যতা কতটুকু?' নিজেকে সংযত রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন যৌবনশ্রী। বললেন, 'অসম্ভব।'

—'উত্তেজিতা হবেন না মহারানি।' কণ্ঠস্বর সতর্ক করল, 'যে সংবাদ পেয়েছি, আপনাকে জানালাম।'

যৌবনশ্রী কিছুক্ষণ নিথরভাবে বসে রইলেন। কুমার বিবাহ করেছে এ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রাণের ভয়ে যে পালাচ্ছে তার বিবাহ করার অবসর কোথায়? এ সময় বিবাহ করা কি শোভা পায়? কেউ পারে।

কণ্ঠস্বর বলল, 'কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই না মহারানি? সত্যই বিশ্বাস করা যায় না।'

তিনি গবাক্ষের দিকে চাইলেন। কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। কথা বললেন না।

—'আমিও পারিনি। তবে.....'

তিনি নীরব রইলেন। কি বলবেন। মনে হচ্ছে সংবাদের মধ্যে এতটুকু সত্যতা নেই।

—'অবিশ্বাস্য অনেক কিছুই তো জীবনে ঘটে যায়। হয়তো তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। হয়তো নিরাপত্তার কারণেই কুমার.....' কণ্ঠস্বর নীরব হল।

বুঝলেন যৌবনশ্রী। এমনটা হতে পারে। অসম্ভব নয়। মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আর কোন সংবাদ?'

—'না। যদি জানা যায় আপনাকে জানান হবে। তবে আপনি অহেতুক আর রাত্রি জাগরণ করবেন না। হয়তো আমার পক্ষেও কুমারের সংবাদ জানানোর জন্য আসা সম্ভব হবে না। আর গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।।

—'তাহলে.....'

কোন কণ্ঠস্বর শোনা গেল না আর। রামপাল জননী স্থানুর মত শয্যায় বসে রইলেন।

রাত্রি শেষ প্রহরে আর এক নারী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। সিন্ধুবালা। ইদানীং শরীর কিছুটা সুস্থ তার। দুর্বলতা অনেকটা কেটেছে। রাজ বৈদ্যের চিকিৎসাধীন এখন। এতদ্দিন পরে রোগ নির্ণয় হয়েছে। কর্কট রোগাক্রান্ত হয়েছে সিন্ধুবালা। রাজবৈদ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন রোগ আরোগ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে যন্ত্রণার উপশম ঘটাবার চেষ্টা তিনি করবেন। তারপর ঈশ্বরের হাত।

সিন্ধুবালা আহার গ্রহণ করতে পারত না। এখন অল্প হলেও পারছে। অনেকখানি যন্ত্রণার উপশম ঘটেছে। সব সময় মৃত্যু কামনা করতো, এখন বাঁচার ইচ্ছা জাগছে মনে। সিন্ধুবালাতো বাঁচতেই চেয়েছিল। একটা মানুষকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিল। সেই বাঁচা তার হয়নি। মানুষটাকে কাছে পেতে চেয়েছিল, পায়নি। অথচ মানুষটার আচার ব্যবহারে কোন ক্রটি ছিল না। তার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিল। আবার দুস্তর ব্যবধানও। একটা অদৃশ্য প্রাচীর ছিল। সে প্রাচীর ভাঙ্গা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কোন দিন তার পক্ষে। একাত্ম হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

রাজকর্মচারী স্বামী। দিনের পর দিন বাইরে কাটে। রাত্রির প্রহর গুনেছে সিন্ধুবালা। দীর্ঘদিন পরে ঘরে ফিরে জানিয়েছে, এবার কিছুদিন থাকবে।

থাকেনি। দু'চার দিন পরেই চলে গেছে। আবার ফিরেছে। গেছে। এমনভাবে দিনের পর দিন কেটেছে। আজ সব কিছুই দিনের আলোর মতই পরিস্কার। স্বামী তার জরিপ বিভাগের রাজকর্মচারী। ছিল ভিন্ন একটা জীবন। ছিল উচ্চাশা। রাজকর্মচারী শুধু নয়, দস্যু দিব্য অধিকার করেছে পাল বংশের রাজ সিংহাসন। সিন্ধুবালা বরেন্দ্রর রানি।

ভাগ্য, হয়তো তাই; স্বামী যে ভাবেই হোক বরেন্দ্রর ক্ষমতা অধিকার করুক না কেন, ভাগ্য স্বামীকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করেছে। কিন্তু এমন ভাগ্য কোনদিনই কামনা করেনি সে। রাজ্যের প্রজারা নিশ্চয়ই তার স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করেনি। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে। নিশ্চয়ই দিচ্ছে।

চাপা কণ্ঠে কেউ যেন ডাকল, 'মা।'

চমকে উঠল সিন্ধুবালা। গবাক্ষের দিকে চাইল।

—'মাসী।' আবার ডাকল কেউ।

ধীরে শয্যা থেকে নামল সিন্ধুবালা। থরথর করে পা কাঁপছে। কষ্টে গবাক্ষের কাছে এগিয়ে গেল। বুকের মধ্যে তার ঝড়ের দোলা।

—'কেমন আছো তুমি?'

—'অনেকদিন পরে এলে?' সিন্ধুবালার গলা কাঁপছে।

—'এলাম। তবে তোমার খবর পাই। চিন্তা করো না।'

—'এখন একটু ভাল আছি আমি।' সহজ হবার চেষ্টা করল সিন্ধুবালা।

—'ভাল থাক। সুস্থ হয়ে ওঠো।'

—'সুস্থ কোন দিনই হবো না। এই কঠিন ব্যাধী কোন দিনই নিরাময় হয়না। বৈদ্য বলেছেন আমাকে।'

—'বৈদ্য বলেছেন?'

—'হ্যাঁ, তিনি বললেন এ ব্যাধী নিরাময় হয় না। হবেও না। তবে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে আমি যেন জীবন যাপনের চেষ্টা করি।'

—'আশ্চর্য তো!'

—'তাই। আমি বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, ব্যাধীর কথা আপনার জানা প্রয়োজন। তাতে মনোবল বৃদ্ধি পাবে। কিছুটা দুশ্চিন্তা মুক্ত হবেন। এটুকু জানবেন মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। যতক্ষণ আয়ু আছে ততোক্ষণ পৃথিবীতে আপনি থাকবেন। রোগমুক্তি নয়, আমি যন্ত্রণাটুকু উপশমের চেষ্টা করবো। আমার যন্ত্রণা উপশম হয়েছে।'

—'তুমি ভাল থাক মাসী।' মিথ্যে চিন্তা করো না।'

—'তুমি কেমন আছো?' জানতে চাইল সিন্ধুবালা। 'আছো কোথায়?'

—'ভাল আছি আমি। যখন যেখানে পারি থাকি। থাকার কোন ঠিক নেই আমার।'

—'না, তুমি ভাল নেই।' বলল সিন্ধুবালা। 'শোন মাধব, 'তুমি রাজধানী ত্যাগ করে চলে যাও।'

—'চলে যাব?'

—'হ্যাঁ, চলে যাবে। তোমার আগমন সংবাদ আমিই জানিয়েছিলাম। ভুল করেছিলাম। তোমাকে ধরার চেষ্টা চলছে। কেন, আমি তা জানি না। তবে রাজধানীতে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।'

—'জানি।' মৃদু শান্ত কণ্ঠস্বর। বলল, 'তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মাসী। এখন যেতে পারবো না।'

—'কেন মাধব?'

—'কেন?' কণ্ঠস্বর একটু নীরব রইল। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'আমায় ক্ষমা কর। বলতে পারলাম না।'

সিন্ধুবালা চুপ করে রইল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল তার। এক দুর্যোগের রাত্রে একটা ভীত বালককে নিয়ে এসেছিল। মাত্র কয়েক দণ্ডের জন্য। রাত্রির শেষ প্রহরে ঘুমন্ত বালককে ঘুম ভাঙ্গিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই প্রথম দিন বালককে দেখে মনে মায়া জেগেছিল তার। প্রশ্ন করেছিল, এ-কে? কোথা থেকে নিয়ে এলে একে?'

স্বামী উত্তর দেয়নি। যেন শুনতেই পায়নি তার কথা।

সিন্ধুবালা কিছু জানতে চায়নি আর। রাত্রি শেষ প্রহরে স্বামী বলেছিল, 'ওকে ডেকে দাও।'

সিন্ধুবালা বলেছিল, 'ও ঘুমাচ্ছে।'

—'জাগাও ওকে। আমাদের যেতে হবে। দেরি করা চলবে না।'

সিন্ধুবালা কথা বলেনি। স্বামী ওকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার এসেছে। কয়েক বছর পরে মাসী বলে ডেকেছে তাকে। কিশোর। মুখে হাসি। উজ্জ্বল দুই চোখ।

সিন্ধুবালার মনে হল, সেই প্রথম দিন ওকে আটকান তার উচিৎ ছিল। পারেনি। আজ আর সম্ভব নয়। মাধব আজ রাজার শত্রু। শত্রু! চমকে উঠল। স্বামীর শত্রু তারও তো শত্রু। কিন্তু......না, ওকে শত্রু বলে ভাবতে পারছে না কেন!

—'মাসী।' ডাকল মাধব। বলল, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো? সত্য বল।'

—'রাগ! না শোন, তুমি এভাবে আর আমার কাছে এসো না মাধব। হ্যাঁ, 'আমি তোমায় আসতে নিষেধ করছি। না, এসো না।'

—'মাসী।'

কষ্ট হল সিন্ধুবালার। স্বামী বলেছে, মাধব তার শত্রু। মাধব তার অনেক ক্ষতি করেছে। অবিশ্বাস করেনি। তবু বলল, শোন, সাবধানে থেক। আমার জন্য চিন্তা করো না। আর হ্যাঁ, আমি চাই না তুমি আর এসো। তোমার ক্ষতি হবে। চলে যাও।'

চলে গেল মাধব। সিন্ধুবালা শয্যায় এসে বসল। বসে রইল স্থিরভাবে। স্বামীর সঙ্গে মাধবের বিচ্ছেদের সঠিক কারণ সে আগে জানত না। জেনেছে অনেক পরে। কিন্তু..... আর কিছু করার নেই। সে কিছুই করতে পারবে না।

দ্বিপ্রহরে মহারাজ দিব্য অন্তঃপুরে আহার করতে আসে। কোন কোন দিন প্রধান সেনাপতি, ভাই রুদোকও তার সঙ্গে থাকে। আহার করতে করতে দু'ভাই আলোচনা করে। রাজ্যলাভের পর সিন্ধুবালার পক্ষে স্বামীর আহারের সময় উপস্থিত থাকা সম্ভব হত না। এখন থাকে। কষ্ট হলেও কাছে গিয়ে বসে।

নিজের কক্ষে বসেছিল সিন্ধুবালা। তার আহার হয়ে গেছে। বৈদ্যের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হচ্ছে তাকে। দাসী এসে জানাল, 'মহারাজ আহারে বসেছেন। তুমি যাবে কি?'

উঠল সিন্ধুবালা। আহার গৃহে প্রবেশের আগে দাঁড়াল। দেবর রুদোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'দাদা রাজবাটির কে সেই শয়তানটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে আগে সেটা জানতে হবে।'

দিব্য বলল, 'আমিও তাই চাই।'

—'তোমার কি মনে হয়?' রুদোকের কণ্ঠস্বর রুক্ষ-কর্কশ।

—'কি মনে হবে?' বিব্রত হল দিব্য। বলল, 'মনে তো অনেক কিছুই হয়।'

—'এ সম্পর্কে তুমি কি কিছুই চিন্তা করনি?' অগ্রজের মুখের দিকে চেয়ে রইল রুদোক।

উত্তর দিতে একটু সময় নিল দিব্য। ভাইকে দেখল। বলল, 'চিন্তা যে করিনি তা নয়, তবে....'

—'ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরনা। এবার যদি সে আসে, আর যাতে ফিরে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

সিন্ধুবালা ধীর পদক্ষেপে আহার গৃহে প্রবেশ করল। স্বামী আহারে মনোনিবেশ করল। রুদোক মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'মনে হচ্ছে তোমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম আমি?'

দিব্য নীরব। রুদোক বলল, 'কেমন আছো বৌঠান?'

হাসল সিন্ধুবালা। বলল, 'এখন ভাল আছি। হ্যাঁ, ভালই আছি এখন।'

একটু সময় নিল রুদোক। সিন্ধুবালাকে দেখল। বলল, আচ্ছা বৌঠান.....'

সিন্ধুবালা রুদোকের দিকে চাইল।

—'গত রাত্রে কেউ কি অন্তঃপুরে এসেছিল?' প্রশ্নটা করে সিন্ধুবালার মুখের দিকে চেয়ে রইল রুদোক।

—'অন্তঃপুরে? রাত্রে? কে আসবে? তুমি কি বল?'

একটু গুম হয়ে চিন্তা করল রুদোক। বলল, 'আমি মাধবের কথা বলছি। সেতো তোমায় মাসী বলে ডাকতো?'

—'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়ল সিন্ধুবালা। 'কোথায় চলে যাবার আগে পর্যন্ত সে আমাকে মাসী বলেই সম্বোধন করত।'

—'সে আবার ফিরে এসেছে।' রুদোক বলল, 'রাজধানীতে আত্মগোপন করে আছে।'

—'তাই নাকি!' আশ্চর্য হল সিন্ধুবালা। 'কোথায় গিয়েছিল সে? ফিরেই বা এল কেন?

—'বন্দীশালায় বন্দীজীবন যাপন করছিল সে। দুই কুমারের সঙ্গে সেও বন্দীশালা থেকে পালিয়ে যায়। এখন রাজধানীতে এসেছে।' রুদোক বলল, জানা গেছে মাধব প্রাসাদেও এসেছে।'

—'আর কুমার দুজন?' জানতে চাইল সিন্ধুবালা।

—'কুমার শূরপাল ধরা পড়েছে। কুমার রামপালের সন্ধান চলছে। সেও ধরা পড়বে।'

—'কুমার শূরপালকে নিশ্চয়ই রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে?'

—'হ্যাঁ। কয়েক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।'

—'আবার কি কুমারকে বন্দী করে রাখা হবে?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল সিন্ধুবালা।

রুদোক তার সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। দিব্য গম্ভীর।

সিন্ধুবালা বলল, 'আর মাধব কি করেছে?'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জ্বলে উঠল রুদোকের। বলল, 'শয়তানটা অনেক অনিষ্ট করেছে আমাদের। আত্মরক্ষা করতে বন্দীশালায় আশ্রয় নিয়েছিল। এখন মহারাজের নামে মিথ্যা রটনা করছে।'

—'মাধব একজন সামান্য মানুষ।' রাজশক্তির বিরুদ্ধে একজন মানুষ.....' সিন্ধুবালা রুদোকের কথা বিশ্বাস করতে পারল না।

বাধা দিল রুদোক। বলল, 'মাধব একা নয়। তার সমর্থক আছে। সে রাজবাটিতেও আসছে। গতরাত্রে সে এসেছিল। হ্যাঁ, জানা গেছে সে এসেছিল।'

—'কেন এসেছিল সে?' জানতে চাইল সিন্ধুবালা।

—'সেটাই জানা যাচ্ছে না। সে যখন রাজবাটি থেকে চলে যাচ্ছে একজন প্রহরী তাকে চিনতে পারে।'

—'সেই প্রহরী ইচ্ছা করলেই তো তাকে ধরতে পারতো?'

—'সেটাই তার উচিৎ ছিল। কিন্তু মাধবকে দেখে সে.....'

—'বুঝেছি।' বলল সিন্ধুবালা। 'চিন্তা কোর না। এমন দুঃসাহসের পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই সে ধরা পড়বে। তাকে যাতে ধরা যায় সেই ব্যবস্থা করো।'

রুদোক কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করল দিব্য। পত্নীর দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন সিন্ধু, বসো।'

সিন্ধুবালা বলল, 'আমি এসে তোমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম।'

হাসল দিব্য। বলল, 'তা অবশ্যই করেছো। ভাই, আমি এ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করবো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে। তুমি পরিশ্রান্ত। এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

—'শয়তানটাকে শেষ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রামের প্রশ্নই ওঠে না দাদা।'

—'ঠিক আছে, এখন শান্ত হও। এ সম্পর্কে সন্ধ্যায় আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো।'

আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিল রুদোক। ভাইয়ের গমন পথের দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে পত্নীর দিকে চাইল সে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বল।'

—'তুমিই বল।' সহজ কণ্ঠস্বর সিন্ধুবালার।

—'আমি?' বিব্রত বোধ করল দিব্য। 'আমি .....আমি.....'

—'হ্যাঁ। আপনিই তো বলবেন মহারাজ।' সিন্ধুবালার কণ্ঠে কৌতুক। বলল, 'বলুন, মহারাজ।'

—'বলবো?' পত্নীকে একটু দেখল দিব্য। মুখমণ্ডল ঈষৎ গম্ভীর আকার ধারণ করল। পরক্ষণে সুক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল ওষ্ঠে। বলল, 'আমি জানি.....'

—'হয়তো জান, কিন্তু তোমার জানাটাই তো সব নয়। কি, অস্বীকার করতে পার?'

বিস্মিত হল দিব্য। কি বলবে ভেবে পেল না।

মৃদু কণ্ঠে সিন্ধুবালা বলল, —'অসুস্থ আমাকে দেখতে আসার জন্য কোন বাধাই বাধা নয় তার কাছে।'

—'কিন্তু সে আমার..........

—'জানি, শত্রু। কিন্তু আমার সন্তানের মত।' একটু অন্যমনস্ক হল সিন্ধুবালা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তোমার শত্রু বলতে মহারাজ দিব্যর শত্রু।'

—'যদি কোন দিন.......'

স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সিন্ধুবালা। দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'যদি তেমন অঘটন ঘটে, সে আঘাত সহ্য করার শক্তি ঈশ্বর নিশ্চয়ই দেবেন আমাকে। বিশ্বাস করো, আমি তাকে নিজের সন্তান বলে মনে করি।'

স্তব্ধ হয়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইল দিব্য। মৃত্যু পথ যাত্রীনির চোখ মুখ এক আশ্চর্য আলোকে উদ্ভাসিত। আপনি মাথা নত হয়ে এল তার।

তেইশ

কুমার রামপালের সন্ধান পাওয়া গেল না। বরেন্দ্ররাজ দিব্যর পাঠান অনুসন্ধানকারী দলটি একদিন পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে মত্ত হল। দলপতির কথা অগ্রাহ্য করতে শুরু করল তারা। দাবি জানাল দেশে ফেরার।

দলপতি বলল, 'না, দেশে ফেরা সম্ভব নয়। মহারাজ আমাদের কাজ সমাধা করার জন্য পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন হল, 'আমরা তাহলে কি করবো?'

—'কুমারের সন্ধান করবো। যেমন করেই হোক কুমারকে ধরতে হবে।'

—'কোথায় সন্ধান করবো? সন্ধান পেলে তবেই না ধরা। যার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে ধরবো কেমন করে?'

দলপতি সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না। মনে মনে সেও স্বীকার করে। তবে.....

—'কোথায় কুমারের সন্ধান করবে না জানা পর্যন্ত আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।' বলল সে।

—'বেশ তোমাকে যেতে হবে না, তুমি থাক এখানে।' রুষ্ট দলপতি বলল, 'ইচ্ছে করলে দেশে ফিরে যেতেও পার।'

—'আমার পক্ষেও আর যাওয়া সম্ভব হবে না বলেই মনে হচ্ছে।' বলল অন্যজন।

—'কেন, তোমার আবার কি হল?' তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল দলপতি।

—'এভাবে অর্দ্ধাহারে দিনের পর দিন কাটান সম্ভব হচ্ছে না। আমি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি।'

—'আমাদেরও ওই এক কথা।' বলল কয়েকজন।

দলপতি বলল, 'অর্দ্ধাহারে তোমরাই শুধু দিন কাটাচ্ছ না। আমিও কাটাচ্ছি। যাদের

অর্থ আনার জন্য পাঠান হয়েছে তারা অর্থ নিয়ে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তখন আহারের এই কষ্ট আর থাকবে না আমাদের।'

—'ঠিক কথা। কিন্তু একথা তো তুমি পক্ষকাল আগে থেকে শুনিয়ে আসছো।'

—'শোনাচ্ছি। অর্থ না এলে আমি কি করবো বল।'

—'তুমি না বললে, কে বলবে শুনি? তুমি দলপতি।'

—'দলপতি হয়েছি বলে তোমাদের আহার যোগানোর দায়িত্ব আমার নাকি?'

—'তুমি তাহলে দায়িত্ব অস্বীকার করছো? তোমার আদেশ মত চলবো, অথচ ক্ষুধার খাদ্য দেবে না তুমি?'

—'দিচ্ছি না যে তা নয়। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল?'

—'কিছু করতে যদি না পার আমরা আমাদের ইচ্ছা মত চলব।'

—'ইচ্ছা মত চলবে!' স্তব্ধ হয়ে গেল দলপতি। এখন সকলে একত্র হয়েছে তারা। পীঠীর দূরত্ব আর বেশি নয়। গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়েছিল একজন বণিকের সঙ্গে কুমার মগধ যাত্রা করেছে। পথে বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বণিক দলনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দলপতি কুমারের কথা তাঁকে বলেছিল। উত্তরে বৃদ্ধ বণিক বলেছিলেন, —'আমরা অষ্টাদশ বণিক বাণিজ্যে চলেছি। সঙ্গে চলেছে ভৃত্য ও রক্ষকের দল। যদি আপনার সন্দেহ হয় কুমার রামপাল আমাদের মধ্যে লুকিয়ে চলেছেন, আপনি খুঁজে নিন কুমারকে।'

দলপতি বলেছিল, 'আমি জানতে চাইছি আপনার কাছে।'

—'কি জানতে চাইছেন, কুমার আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে কি না? আমার উত্তর, নেই। তবু আপনার সন্দেহ দূর করার ব্যবস্থা আমি করছি।'

তখন প্রভাতকাল। বণিকরা যাত্রার আয়োজন করছিলেন। দলনেতার আহ্বানে বণিকরা, ভৃত্য এবং রক্ষীরা আলাদাভাবে উপস্থিত হয়েছিল।

দলনেতা বলেছিলেন, 'এবার আপনি খুঁজে নিন এদের মধ্যে কুমার আছেন কি না?'

দেখেছিল দলপতি। কুমার বলে কাউকেই সন্দেহ হয়নি।

দলনেতা তাকে বলেছিলেন, 'এবার আপনি আমাদের সকটের চালকদের দেখে নিন।

মিথ্যা সন্দেহ। বণিকরা যাত্রা করেছিলেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন পলাতক কুমারের সন্ধানে ফিরছে। কিন্তু কোথায় কুমার? কুমারের সঙ্গীকে বন্দী করে নিজেদের সঙ্গে রেখেছে। যদিও সে ধরা পড়ার পর থেকে একটি কথাই বলে আসছে, 'কে কুমার, কোন রাজ্যের কুমার? আমি কোন কুমারকে চিনি না।'

দলপতি জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোর সঙ্গী তাহলে কে?'

—'সঙ্গী?' অবাক হয়েছে বন্দী। 'আপনি আবার সঙ্গী পেলেন কোথায়? স্বপ্ন দেখছেন নিশ্চয়ই।'

—'আমি বলছি তোর সঙ্গী ছিল।' ধমক দিয়েছে দলপতি।

—'বলছেন?' দলপতির দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে সে।

—'হ্যাঁ বলছি। বল সে কে? কোথায় গেল?'

—'কি করে জানবো বলুনতো কোথায় গেল? আর থাকলে তো যাবে।'

—'ছিল তো, ছিল না?'

—'আপনি যখন বলছেন তখন না বলি কেমন করে। সত্যি কথা বললে তো বিশ্বাস করবেন না।'

দলপতি দৈহিক অত্যাচারের পক্ষপাতি নয়, সঙ্গীদের পরামর্শে দৈহিক নির্যাতন করেছে, কিন্তু কোন কথাই প্রকাশ হয়নি। মুখে সেই এক কথা, 'আমার কোন সঙ্গী ছিল না।'

পীঠী থেকে রাজগৃহের দিকে একদল, ভিন্ন পথে আর একদল কুমারের অনুসন্ধানে যাবে। প্রস্তাব অস্বীকার করল সঙ্গীরা। দলপতির সমর্থকের সংখ্যা খুবই কম। প্রশ্ন উঠল বন্দীকে নিয়ে।

মধ্যাহ্নে একটা বৃক্ষতলে বসেছিল ত্রৈলোক্য। আজ আহার জোটেনি তার। সকালে নামমাত্র শুকনো চিড়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। শিশুর আহার। তাই সে খুবই যত্নে একটি একটি দানা মুখে দিয়েছে। পক্ষকালের বেশি এইভাবে চলছে। ধরা পড়ার পর খুবই দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কয়েকদিন অনাহারেও রেখেছিল। একবিন্দু জল পর্যন্ত দেয়নি। কষ্ট, বড় কষ্ট, যন্ত্রণায় বুকের মধ্যেটা ছিঁড়ে গেছে, তবু কিছু বলতে পারেনি সে। মনে পড়েছে তার পূর্বপুরুষের কথা। কবি গঙ্গাধর। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই সে শুনেছিল। সৎ-নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তিনি। বাল্যকাল থেকে লাঞ্ছনা, অনাহার ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু কখনো মাথা নত করেননি। সেই বংশের সন্তান হয়ে কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে। একদিন পথভ্রষ্ট হয়েছিল। অনেক অন্যায় করেছে। আর নয়।

বৃক্ষতলে বসে নানান কথা চিন্তা করছিল ত্রৈলোক্য। দিব্যর ঘাতকরা তাকে সুন্দর নামে জানে। নিজের নাম বলেছিল, সুন্দর।

দলপতির এক সঙ্গী বলেছিল, 'যথার্থই তুমি সুন্দর।'

গম্ভীরভাবে দলপতির সঙ্গীর দিকে চেয়ে থেকে সে বলেছিল,—'কেন, আমার মধ্যে অসুন্দরের কি দেখলে তুমি?'

সঙ্গী কিছু বলতে যাচ্ছিল। দলপতি থামিয়েছিল তাকে। একের পর এক প্রশ্ন করেছিল। উত্তর দিয়েছিল সে। কিন্তু দলপতিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বারবার সন্দহের দৃষ্টিতে তাকে দেখেছে। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে ছাড়া হবে না—সঙ্গে যাবে। শৃঙ্খলিত করেনি, সতর্কতার সঙ্গে রেখেছে।

কুমারের সন্ধান বেশ কয়েকদিন পাওয়া যায়নি। দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্ করেছে। এরা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কুমারকে খুঁজে ফিরছে। কখনো কখনো একসঙ্গে মিলিত হয়।

কুমার শূরপালের কথাও মনে হয়। মগধের পথে যাত্রা করেছেন। তিনি কি পৌঁছাতে পেরেছেন মগধে? এদের আলোচনা থেকেই জানা গেছে কুমার শূরপালকে ধরার জন্যও দিব্য তার অনুচরদের পাঠিয়েছে।

কুমার রামপালের কি হল? ত্রৈলোক্য বুঝতে পারে না। কুমারের সঙ্গে থাকতে থাকতে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ। ধীর-শান্ত—নম্র, কিন্তু বড় তেজস্বী। বন্দী জীবনের প্রথম দিকে কম অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেননি। এতটুকু কাতরোক্তি ছিল না। সে কতবার....

নিজের জীবনটার কথা মনে পড়ল তার। অমানুষিক নির্যাতন। এক বন্দী তাকে নির্যাতন মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। সুফল লাভ করেছিল সে। কুমার শোনামাত্র অগ্নি দৃষ্টি হেনেছিলেন। সেই দৃষ্টিতে তার বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠেছিল।

বসে আছে ত্রৈলোক্য। তার কাছ থেকে কিছুটা দূরত্বে রান্না হচ্ছে। গতকাল মধ্যাহ্নে তার আহার জোটেনি। খাদ্য বস্তুর সঙ্কুলান হয়নি। সামান্য চিড়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। আজ আহার জুটবে কি-না জানে না।

সকলের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব তার। ইচ্ছা করলে.....না, পারে না। থাক দূরত্ব। তার প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।.

আর পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও তার নেই। কি হবে! অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে।

—'এই এখানে বসে কি করছো?'

প্রশ্নকারীর দিকে তাকাল ত্রৈলোক্য। দলপতির প্রধান পরামর্শদাতা। একজন মধ্য বয়সী কুৎসিৎ মানুষ। নামটাও জানে সে, কপিল। কথা বলল না।

—'এই, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

—'আজ্ঞে পাচ্ছি।' হাসল ত্রৈলোক্য।

—'কি করছো?'

—'বসে আছি। বসে বসে প্রকৃতিকে দেখছি।'

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি বসে আছো। জানতে চাইছি বসে কি মতলব ভাঁজছো।'

—'আজ্ঞে না, বিশ্বাস করুন। তবে একটা জিনিস দেখছিলাম। স্বপ্ন! আহারের স্বপ্ন। দীর্ঘদিন আগে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছিলাম।'

—'সে তো তোমার নিজের দোষেই।' গম্ভীরভাবে পরামর্শদাতা বলল, 'নিজের কপাল নিজেই পুড়িয়েছো তুমি।'

—'তা যা বলেছেন। কুমারের সংবাদটা বলে দিলেই পারতাম।'

কপিল গম্ভীর হল। ভ্রুকুটি করল।

—'আচ্ছা, কুমার কোথায় গেলেন বলুনতো? তাঁর ধরাপড়া উচিৎ ছিল। কি, ছিল না?'

কপিল বলল, 'উচিৎ অনুচিতের প্রশ্ন এখন থাক। শোন, যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি। জানতে চাইছি, তুমি কি করবে?'

—'আমি?' অবাক চোখে লোকটার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল ত্রৈলোক্য। যেন বুঝতে চাইল কপিল কি বলতে চায়। বলল, 'কি আর করবো বলুন। আমার করার কি আছে?'

—'আমরা ফিরে যাব মনস্থ করেছি।'

—'ফিরে যাবেন? কোথায়?'

কপিল কথা বলল না।

কতকটা ভয়ে ভয়েই ত্রৈলোক্য জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কুমারকে ধরার কি হবে?'

—'কুমারের কথা থাক।' কপিলের কণ্ঠস্বর রীতিমত গম্ভীর। 'তোমার কি হবে?'

—'আমার?' ত্রৈলোক্য গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, 'আমার আর কি হবে, আমার তো জীবনে কিছুই হল না। ভেবেছিলাম চম্পায় গিয়ে একটা কিছু করার চেষ্টা করবো। তাওতো হল না।'

কপিল ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ত্রৈলোক্য বলল, বিশ্বাস করুন।'

হীম শীতল কণ্ঠে কপিল বলল, 'তোমার কথার একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না।'

—'বিশ্বাস করেন না?' অসহায়ভাবে তার দিকে তাকাল ত্রৈলোক্য।

—'না, করি না।' কঠিন কণ্ঠে কপিল বলল, 'শোন, আজ এই মূহুর্তে তোমার সামনে শেষ সুযোগ উপস্থিত। এখনও তুমি সত্য স্বীকার কর। বল, তুমি কুমার রামপালের সঙ্গে ছিলে কি না?'

—'আজ্ঞে না-তো। বিশ্বাস করুন।'

—'না, বিশ্বাস করি না।' গম্ভীরভাবে কপিল বলল, 'তোমার কথার একটি বর্ণও।'

—'বিশ্বাস করুন, আমি ঠাকুরের নামে দিব্যি কেটে বলছি।'

—'কোন্ ঠাকুর?'

—'আজ্ঞে দেবতার নামে। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। গলায় যজ্ঞো পবীত আছে। ব্রাহ্মণের মিথ্যাচার মহাপাপ, নরকে যেতে হয়। কেউ কি সাধ করে নরকে যেতে চায়! আপনিই বলুন? আর কুমার রামপালের সঙ্গে সত্যি সত্যিই আমি যদি থাকতাম, সব কথা গোপন করে আমার লাভ কি! কুমার রামপাল আমার কে?'

—'ঠিক কথা।'

—'তাহলেই চিন্তা করে দেখুন।'

— 'তোমাকে নিয়ে অনেক চিন্তা করা হয়েছে। নিজের নাম বলেছ সুন্দর। প্রকৃত নাম হয়তো ভিন্ন। যাক, নামে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তুমি যে পলাতক কুমারের সঙ্গী ছিলে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। কারণ দু'জনের চেহারার বর্ণনা বহুজনের কাছে আমরা পেয়েছি। তাদের একজন তুমি। দ্বিতীয়জন পলাতক। এখন বল, তুমি কি করবে?'

—'কি করবো?' অসহায় দেখায় তাকে।

—সে কথাই তোমার কাছে জানতে চাইছি।'

ত্রৈলোক্য বলল, —'যদি আমাকে মুক্তি দেন চম্পার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো।'

—'কিন্তু তাতো সম্ভব নয়।'

—'সম্ভব নয়?'

—'না। শোন, শেষ সুযোগ তোমার সামনে উপস্থিত। সত্য স্বীকার কর। তোমাকে নিয়ে আমরা পলাতক কুমারের সন্ধানে যাব। না হলে.....

ত্রৈলোক্য কপিলের দিকে চেয়ে রইল।

দাঁতে দাঁত চেপে কপিল বলল, 'আর না হলে ভার লাঘব করতে বাধ্য হবো আমরা।'

চমকে উঠল ত্রৈলোক্য। কপিল চলে গেল।

ত্রৈলোক্য নিথর হয়ে বসে রইল। দেখল রন্ধন শেষ হল। গতকাল মধ্যাহ্নে তার আহার জোটেনি। আজ তাকে খাবার দেওয়া হল। পেটে অসহ্য ক্ষুধা কিন্তু খাবার স্পৃহা তার চলে গেছে। খাদ্য বস্তুর দিকে চেয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। খেতে পারল না। মনের মধ্যে এক চিন্তা, কি করবে সে। যদি সত্য স্বীকার করে, তাকে নিয়ে দস্যুর দল কুমারের অনুসন্ধানে এগিয়ে যাবে। সে দেখেছে কুমারকে। গো-সকটে কুমার চলেছেন। দেখেছে.....কি করবে? কি করবে সে?

অন্তরটা ককিয়ে উঠল তার। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে প্রাণটা। স্তব্ধ পাষাণের মত বসে রইল।

সময় অতিবাহিত হচ্ছে। মধ্যাহ্নের সূর্য বাঁক নিল পশ্চিমে। কারা যেন তার কাছে এসে দাঁড়াল। বুঝতে পারল ত্রৈলোক্য। মুখ তুলে দেখল না।

—'কি হল খাওনি কেন?'

সে উত্তর দিল না।

—'বল, কি স্থির করলে?'

সে নীরব।

—'শোন, তোমার ভার বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় আর। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।'

কপিলের কণ্ঠস্বর। তবু সে মাথা নত করে বসে রইল।

—'এখনও বল তুমি কি আমাদের কথা শুনবে?'

ত্রৈলোক্য অনড়। পাষাণবৎ।

—'শোন্, তোকে মুক্তি দেব। তুই যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবি। শুধু তোর জিভটা কেটে নেওয়া হবে। যদি নিজের মঙ্গল চাস এখনও আমাদের কথা শোন।'

ত্রৈলোক্য শুনল কিন্তু নির্বিকার ভাবে বসে রইল।

দলপতি বলল, —'কপিল, আমি যাচ্ছি।'

কপিল হিংস্র আক্রোশে ত্রৈলোক্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিৎকার করে উঠল, 'কথা শুনবি?'

শান্ত কণ্ঠে ত্রৈলোক্য বলল, 'না।'

আর কিছু মনে নেই তার। চেতনা লাভ করল যখন, দিনের সূর্য অস্তাচলের পথে, রক্তরাগে রাঙ্গা আকাশ। রক্ত আর যন্ত্রণা। কাঁদতে গিয়ে দেখল বাক্‌স্তব্ধ। চোখের জলে সিক্ত হল বুক। কষ্টে দু'হাত তুলে ধরল চোখের সামনে।

চব্বিশ

পরনে ছিন্নবাস, ধূলি ধূসর রুক্ষ শরীর। ক্লান্ত পদক্ষেপে রাজগৃহের পথে এগিয়ে চলেছে এক কিশোর আর তরুন। পথচারীরা ফিরে চায়, দেখে, মনে মায়া জাগে। এমন দারিদ্রের প্রতিমূর্তি দীর্ঘদিন তারা দেখেনি। কেউবা কৌতূহলি প্রশ্ন করে, কেউ একরাশ বিরক্তি নিয়ে নিজের কাজে চলে যায়।

দিনে পথ চলে দুজনে। মধ্যাহ্নে আহার সংগ্রহের জন্য কোন খাদ্যা বস্তুর বিপণীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বিরক্ত প্রশ্ন শুনতে হয়, কি চাই?'

তরুন প্রয়োজনের কথা জানায়।

—'হবে না। আগে দেখ।'

—'আমি ক্রেতা।' বিনীত কণ্ঠে বলে তরুণ।

বিক্রেতা উত্তর দেয়, 'তোমার মত ক্রেতার আমার প্রয়োজন নেই। যাও।'

—'আমরা ক্ষুধার্ত।' অর্থ দিয়ে খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করবো।'

—'তোমার ভিক্ষালব্ধ অর্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার পোষাকের দুর্গন্ধে আমার বিপণীর খাদ্যবস্তু কলুষিত হচ্ছে। যাও, চলে যাও।'

আবার কোন বিক্রেতা তাদের আহ্বান জানিয়ে বসায়। আহার করায়। আহার করতে করতে তরুণ জানতে চায় অর্থের পরিমাণ। বিক্রেতা বলে, 'আহার কর। হিসাব পরে হবে।'

—'না-না।' তরুন বলে, 'বেশি অর্থ আমার কাছে নেই।'

—'যা আছে তাই দিও।' হাসে বিক্রেতা।

—'সব দিলে তো চলবে না। আগামীকাল তাহলে অনাহারে কাটবে যে।'

—'যাবে কোথায়?' জানতে চায় বিক্রেতা।

—'উদন্তপুর।'

—'সেখানে.....'

—'আমাদের মাতুলালয়।'

আহার শেষে বিক্রেতা অর্থ নেয়, নেয় কম-ই।

দিনে খুব একটা সমস্যা হয় না। সতর্কভাবে পথ চলে। সমস্যা দেখা দেয় রাত্রের আশ্রয় নিয়ে। যথা সম্ভব পান্থনিবাস পরিহার করে। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্তকাল শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকেই শিশির পড়ে। কিশোরের শরীর ভাল নয়, ঠাণ্ডা লেগেছে। চোখ মুখ ম্লান হয়ে গেছে।

সেদিন মধ্যাহ্নের অনেক পরে একটা বিপণিতে খাদ্য সংগ্রহ করছিল তরুন। বিক্রেতা বেশ সজ্জন ব্যক্তি। কোন ক্রেতা ছিল না। এক বৃদ্ধ শুধু বিপণির মধ্যে বসেছিল। বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলছিল। তাদের দেখে বিক্রেতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। তরুন তার প্রয়োজনের কথা জানাল। বিক্রেতা খাদ্যবস্তু দিলে তরুন বলল, 'একটা সংবাদ দিতে পারেন?'

—'কি সংবাদ চাও তুমি?' জানতে চায় বিক্রেতা।

—'এ গ্রামে কোন বৈদ্য আছেন?'

—'বৈদ্য? কেন, কি প্রয়োজন বৈদ্যের?'

—'আমার সঙ্গী খুবই অসুস্থ।'

—'না, এ গ্রামে কোন বৈদ্য নেই।' বলে বিক্রেতা। 'একজন আছেন, তিনি কিছু জানেন। তবে জটিল বা কঠিন কোন ব্যধী নিরাময় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

—'আমার সঙ্গীর জটিল বা কঠিন ব্যধী হয়নি বলেই অনুমান আমার।' বলল তরুন।

—'কি করে বুঝলে তুমি?'

—'ঋতু পরিবর্তনের ঠাণ্ডায় সে আক্রান্ত হয়েছে।'

চিন্তা করল বিক্রেতা। বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে বলল, —'খুড়ো মশাই, রাম বৈদ্যের গৃহটা এদের একটু দেখিয়ে দাও গিয়ে। আর শোন ভাই, তোমাকে পাঠাচ্ছি বটে, দায়দায়িত্ব তোমার। খুবই উগ্র প্রকৃতির বৈদ্য। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলে ধৈর্যের পরীক্ষা দিও। কেমন।'

বৃদ্ধ দূর থেকে বৈদ্যের গৃহটি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। জীর্ণ গৃহটি। তরুন গৃহদ্বারে করাঘাত করল। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। কিছুক্ষণ পরে দ্বার মুক্ত হল। সামনে দাঁড়িয়ে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ। কোটরাগত চক্ষুদ্বয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তরুনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি চাই?'

—'আজ্ঞে খুবই বিপদগ্রস্ত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।' কাতর কণ্ঠে জানাল তরুন।

—'কি বিপদ?' ভ্রূকুটি করলেন বৃদ্ধ। বিরক্তভাবে বললেন, 'না বাপু, বিপদে আপদে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি অন্যত্র যাও।'

—'আমার সঙ্গী খুবই অসুস্থ।' বলল তরুণ।

—'সঙ্গী অসুস্থতো আমি কি করতে পারি?' ধমক দিলেন বৃদ্ধ। 'কোন ভাল বৈদ্যের কাছে যাও।'

—'যদি দয়া করে.....'

বাধা দিলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'দয়া আমি করি না। আমার মধ্যে দয়া মায়া খুবই কম। বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে...... না, না-যাও তুমি।'

—আজ্ঞে খুবই দীন অবস্থা আমার।'

—'তাহলে অন্যত্র যাও। দুটি গ্রাম পার হলেই বৈদ্য রামনিধিকে পাবে। সে খুবই দয়ালু। যে তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে তার রামনিধির কাছে পাঠান উচিৎ ছিল।

—আজ্ঞে আমার সঙ্গী খুবই কাতর। দয়া করে যদি তার চিকিৎসা করেন।'

—'সঙ্গে অর্থ আছে? শোন, আমি বামনিধির মত দয়ালু নই। আমি আমার প্রাপ্য অর্থ আগে বুঝে নিই।'

—'আজ্ঞে যৎসামান্য অর্থ আমার কাছে আছে। বলুন, আপনার দক্ষিণা কত?'

—'আমার দক্ষিণা..... না, সে দিতে তুমি পারবে না। তুমি এখন......'

বাধা দিয়ে তরুন বলল, 'আশা করি দিতে পারবো। বলুন কত দক্ষিণা আপনার?'

এবার একটু অবাক হলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'দক্ষিণার অঙ্ক না শুনেই কি করে অঙ্গীকার করছো?

—'আজ্ঞে করছি।'

—'করছো। আমি রাম বৈদ্য। আগে অর্থ সামর্থের কথা বলে নিই আমি। বৈদ্য রামনিধি আগে চিকিৎসা করে পরে অর্থের দাবি জানায়। মানুষ সর্বশ্রান্ত হয়। তবু মানুষ তার কাছে যায় তার মধুর ব্যবহারের জন্য। আমার দুর্ব্যবহারের জন্য ব্যধীগ্রস্ত মানুষ আমার কাছে কমই আসে। আমিও তাই চাই। অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করবো রোগীর। আত্মীয়দের তোষামোদের পক্ষপাতি নই। তোমার সঙ্গীকে নিয়ে এসো।'

তরুন কিশোরকে নিয়ে এল। বাইরে রাস্তার ধারে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছিল।

বৈদ্য কিশোরকে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করলেন, 'এ কে?'

—'আজ্ঞে.....'

—'জানতে চাইছি এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?'

—'আজ্ঞে সহোদর।'

—'আপন সহোদর?'

—'আজ্ঞে....'

বৃদ্ধ কিশোরকে পরীক্ষা করলেন। প্রশ্ন করলেন দু একটি। তরুনকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, —'চিন্তা কোর না। তোমার সহোদরের বিশেষ কিছুই হয়নি। ঠাণ্ডা লেগেছে। এছাড়া খুবই ক্লান্ত। প্রয়োজন বিশ্রামের।'

—'ঔষধ?'

—'খুবই সামান্য মাত্রায় প্রয়োগ করলেই ব্যধী উপশম হয়ে যাবে। অন্ততঃ দু-দিন বিশ্রাম নিতে হবে তোমার সহোদরকে।'

—'আজ্ঞে তাতো সম্ভব নয়।'

—'কেন সম্ভব নয়?'

—'আমরা মাসাধিককাল পূর্বে যাত্রা করেছি। উদন্তপুর না পৌঁছান পর্যন্ত বিশ্রামের অবকাশ নেই।'

—'তোমরা কি পলাতক?' স্থির দৃষ্টিতে তরুণের মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

—'একথা বলছেন কেন?' বিব্রতবোধ করল তরুন।

—'কেন?' গম্ভীর হলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'তোমার পরিচয় কি? সত্য কথা বলবে।'

তরুন বাধ্য হয়ে নিজের পরিচয় দিল। ভাগ্য বিপর্যয়ে সহোদরকে নিয়ে উদন্তপুর চলেছে। মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

—'সহোদর!' হাসলেন বৃদ্ধ। 'রাম বৈদ্য কি এতই নির্বোধ। ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের নাড়ির গতি এক নয়। সত্য বল ও-কে?'

তরুন মাথা নত করল।

বৃদ্ধ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তরুনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হল, চুপ করে রইলে কেন? যদি সত্য কথা না বল, আমি গ্রামপতিকে জানাতে বাধ্য হবো। তোমার সঙ্গিনী কি সহোদরা?'

—'আজ্ঞে না।' মৃদু কণ্ঠে তরুন বলল, 'আমার সহোদরা নয়।'

—'তাহলে কে?' তুমি কি মেয়েটিকে নিয়ে পালাচ্ছ?'

—'আজ্ঞে না, ও আমার পত্নী।'

—'পত্নী!' বিস্ময়ে হতবাক হলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'তুমি কে? কি উদ্দেশ্যে পত্নীকে পুরুষের ছদ্মবেশে নিয়ে চলেছো? সত্য বল। আর যতই ধূলি ধূসরিত হয়ে থাকনা কেন, তোমাকে দেখে আমার সাধারণ ঘরের সন্তান বলে মনে হচ্ছে না। তোমার সত্য পরিচয় কি?'

মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল তরুন। বৃদ্ধ বৈদ্য নীরব হবার পর তাঁকে দেখল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'সত্যই আমি সাধারণ গৃহের সন্তান।'

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে রইলেন। চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

তরুনের মুখে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য আমাদের এই অবস্থা। ছদ্মবেশ ধারণ না করলে শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পেতাম না আমরা।'

—'শত্রু কারা?'

—'জ্ঞাতি শত্রু। প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল।'

—'সত্য বলছো?'

—'বিশ্বাস করুন। এতটুকু মিথ্যা বলছি না। একরাত্রে জ্ঞাতিরা আমাদের সবকিছু

ছারখার করে দিয়েছে। আমার মাতা পিতা, দুই সহোদর তাদের হাতে নিহত হয়েছে। আমি আর আমার পত্নী কোনক্রমে রক্ষা পাই। সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করি আমরা। ছদ্মবেশ ধারণ করি।'

—'যাবে উদন্তপুর।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখানে আমার মাতুলালয়। সম্পন্ন গৃহস্থ। সেখানে পৌঁছাতে পারলে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাব।'

—'তোমার গ্রামে গ্রামপতি নেই?'

—'আছেন। বিষয় নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ। আমার পিতা বিরোধ মীমাংসার জন্য বহুবার গ্রামপতির কাছে গেছেন, তিনি আশ্বাসও দিয়েছেন, কিন্তু কিছুই করেন নি।'

—'বুঝেছি।' বৃদ্ধ বলেছেন, 'শোন, তোমার পত্নীর চিকিৎসা আমি করব। প্রথম হচ্ছে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। থাকবে কোথায়?'

তরুন বলল, 'এখন পথ আমাদের আশ্রয়স্থল। আপনি যদি......'

—'আমি!' বৃদ্ধ বললেন, 'এ গ্রামে আমার কথায় কেউ-ই তোমাদের আশ্রয় দেবে না।'

—'কেন?'

—'কেন?' একটু নীরব রইলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'মতান্তর বলতে পার। আমি বৈদ্য। মানুষের চিকিৎসা আমার পেশা। ধনী দরিদ্র আমার কাছে সমান। অর্থবানের আজ্ঞাবাহী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

—'আপনি কি......'

—'চিকিৎসা করি, যারা আমার কাছে আসতে বাধ্য হয় তাদের। শোন, সংসারে আমি একা। অর্থের প্রয়োজন বা লালসা আমার কম। বিনা অর্থে আমি গরীবের চিকিৎসা করি।'

—'কিন্তু আমার কাছে........'

—'অর্থের দাবি করেছিলাম। করেছিলাম এই কারণে, আমি জানতাম না কারা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। কারণ এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। শোন, আমার গৃহে তুমি তোমার পত্নীকে নিয়ে কদিন থাকতে পার, তবে আহারের কোনরকম ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না। এখন বল, কি করবে?'

কৃতজ্ঞতায় তরুনের চোখ দুটো অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বৈদ্যকে আর কঠোর বলে মনে হচ্ছে না তার। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, —'আপনি দয়া করে আমার পত্নীকে সুস্থ করে দিন।'

গভীর রাত্রি। অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে কান্তা। করাত্রি তার চোখে নিদ্রা ছিল না। শ্বাস কষ্টে ছটফট করেছে। কাশির দমকে বার বার কেঁপে উঠেছে শরীর। বৃদ্ধের ঔষধে মন্ত্রের মত কাজ হয়েছে।

সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমটা ভেঙে গেল তার। প্রদীপের মৃদু আলোয় নিদ্রিতা কান্তার দিকে চাইল। তার পত্নী। হঠাৎ হাসি পেল তার। ছদ্মবেশে কান্তাকে নারী বলে চেনার উপায় নেই। মাথার চুল খুবই ছোট করে কাটা। নারীর সৌন্দর্য্য তার কেশ। সেই কেশ নিজেই ছেদন করেছিল সে। নিরাভরণ দেহ। পরণে পুরুষের পোষাক। তার ঈষৎ ভাঙ্গাচোরা মুখ। শুধু বৈশিষ্ট তার দুই চোখ। কিছুটা ক্ষিনাঙ্গী। শীর্ণাও নয়। যেন বাল্যের প্রান্তে।

বণিক দিবাকর বলেছিলেন, 'কুমার, আমাদের গ্রামের বণিকরা বাণিজ্য যাত্রা করবেন। শুধু আমাদের গ্রাম নয়, তিনটি গ্রামের অষ্টাদশ বণিক এবার বাণিজ্যে যাবেন। পিতার অসুস্থতার জন্য আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আপনার যাত্রার আয়োজন করেছি। আপনি চিন্তা করবেন না। ওঁরা আপনাকে মগধে পৌঁছে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আপনার সঙ্গেও আলোচনা করবেন। শুধু......'

কুমার দিবাকরের মুখের দিকে চেয়েছেন।

তিনি বলেছেন, আপনার পত্নীকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

—'সমস্যা?'

দিবাকর সামান্য নীরব ছিলেন। এক সময় বলেছিলেন, 'ঠিক সমস্যা নয়, বণিকদের দলনেতা ধনঞ্জয় অবশ্য বলেছেন, আপনার পত্নীকেও উনি সঙ্গে নিতে চান। কিন্তু আমি চাইছি না। কারণ আপনার শত্রুরা আমার গৃহের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছে। গতকাল আমি ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। আমি আপনার পত্নী এবং শ্যালককে পরে মগধে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনি চিন্তা করে দেখুন।'

কুমার বলেছে, 'এতে চিন্তা করার কিছু নেই। আপনি যা স্থির করবেন তাই হবে।'

শুনেছে কান্তা, মৃদু কণ্ঠে বলেছে, 'আপনি যা বলবেন তাতেই আমি সম্মত। আমার জন্য আপনি বিপদগ্রস্ত হোন, নিশ্চয়ই চাইব না।'

—'দিবাকর বলছেন তুমি সঙ্গে থাকলে......'

বাধা দিয়ে কান্তা বলেছে, 'উনি সঠিক কথাই বলেছেন। তোমার শত্রুরা ওৎ পেতে আছে। বণিকদের মধ্যে আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই তারা.......'

—'কান্তা আমি......'

—'কুমার, আপনার নিরাপত্তা আগে।'

যাত্রার পূর্বদিন কান্তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে কুমার। কান্তা, না, কান্তা নয়। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গে দেখেছে এক সদ্য কিশোর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে থেকেছে।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে কিশোরের ওষ্ঠে। মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, 'চিনতে পারলে না?'

—'কান্তা!'

—'বণিক দলে আশ্রয় পেতে আর নিশ্চয়ই বাধা নেই?'

—'এ তুমি কি করেছো কান্তা?'

—'কি করলাম?' অবাক হয়েছে কান্তা। 'শুধু কেশ ছেদন করেছি মাত্র।'

—'তোমার.....'

—'সৌন্দর্য? কি হবে সৌন্দর্যে? তুমিই বল না?'

কিছু বলেনি, ওকে কাছে টেনে নিয়েছে।

দিবাকর সম্মত হয়েছেন। রাত্রির অন্ধকারে তাঁরা গৃহত্যাগ করে বণিক দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দলপতি ধনঞ্জয় দুজনকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। তাঁর নিজস্ব পরিচারক দুজন। রাত্রে তাঁর শিবিরেই থাকতো তারা।

পাচক অনঙ্গ পৌঢ়। যাত্রাকালের কয়েকদিনের মধ্যেই কান্তার ওপর দৃষ্টি পড়েছিল তার। নানা অছিলায় তাকে কাছে ডাকতো। সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করছিল কান্তা। কুমার কিছুই জানতে পারেনি। শেষে নিরুপায় কান্তা সব কথাই জানিয়েছিল তাকে।

চিন্তা করেছিল কুমার। শেষে সব কথাই জানিয়েছিল ধনঞ্জয়কে। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকেও অসহায় দেখিয়েছিল। মানুষের জৈবিক তাড়না কিভাবে প্রতিহত করবেন? অনঙ্গ সম্পর্কে অভিযোগ কিভাবে অন্যান্য বণিকদের জানাবেন তিনি। পাচক ব্রাহ্মণ পৌঢ় এক কিশোরের প্রতি আকৃষ্ট.....ছিঃ।

কুমার বলেছিল, 'আমি একটা উপায় স্থির করেছি।'

ধনঞ্জয় তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

—'আমি পত্নীকে নিয়ে চলে যাব।' বলেছিল কুমার।

—'চলে যাবেন?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিন্তু দিবাকর যে.....সে আমার সন্তান তুল্য। বিশ্বাস করে যে দায়িত্বভার আমার ওপর ন্যস্ত করেছে, তা আমাকে পালন করতেই হবে।'

—'কিন্তু এইভাবে.....'

বাধা দিয়ে ধনঞ্জয় বলেছিলেন, 'দেখি কি করা যায়।'

চেষ্টা করেছিলেন ধনঞ্জয়, কিন্তু তাঁর কোন চেষ্টাই কার্যকর হয়নি। প্রৌঢ় অনঙ্গ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিশোররূপী কান্তাকে একরকম প্রকাশ্যেই উত্যক্ত করা শুরু করেছিল। দেখেছিলেন ধনঞ্জয়। কয়েকবার অনঙ্গকে মৃদু তিরস্কার করেছেন। অনঙ্গ তাঁর তিরস্কারে কর্ণপাত করেনি, নির্লজ্জের মত হেসেছে। বলেছে, 'ওকে আমি আপনজন মনে করি।'

—'নিজের সন্তানের মত?'

—'তার চেয়েও বেশি।

নির্লজ্জ উক্তি। স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। গোপনে বণিক দলের সঙ্গ ত্যাগ করেছে তারা।

কান্তা বলেছে, 'এবার?'

—'সামনে পথ, এগিয়ে চল।' মৃদু কণ্ঠে বলেছে রামপাল।

—'পথের সন্ধানতো জানা নেই।'

—'পথ চলতে চলতেই জেনে নেব। ধনঞ্জয়ও বলে দিয়েছেন। তারপর ভাগ্য।'

শুধু পথের সন্ধান নয়, জোর করে কিছু অর্থও তিনি দিয়েছেন। দিয়েছেন দিবাকর। ত্রৈলোক্য দিয়েছিল। সাবধানে পথ চলেছে। অসুস্থ হয়েছে কান্তা।

করস্পর্শে চমকে উঠল রামপাল। কান্তার দিকে ফিরল।

—'তুমি ঘুমাও নি?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছে কান্তা।

—'কেমন বোধ করছো?'

—'মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে গেছি।' হাসল কান্তা। বলল, 'চল কাল প্রভাতে বেরিয়ে পড়ি।'

—'তারপর?'

—'তারপর কি?'

—'কিছু না।' ওর গায়ে হাত রাখল। 'আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর চিন্তা করে যাত্রার দিন ঠিক করা যাবে।'

শুনে কান্তা একটু চুপ করে রইল। তার ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একসময়।

—'কি হল?'

—'একটা কথা চিন্তা করছি, কিন্তু উত্তর পাচ্ছি না।'

ওর মুখের দিকে তাকাল রামপাল।

—'বণিক দিবাকর দাদুর পরিচিত। তিনি তাঁকে বলে তোমার মগধ যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারতেন। তাহলে.....' নীরব হল সে।

—'তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ কেন দিলেন?'

কান্তা কথা বলল না।

পত্নীকে একটু দেখল কুমার। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, —'সত্যই কিছু বুঝতে পারনি তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল কান্তা। 'না, বিশ্বাস করো। আমি বুঝতে পারছি না। কেন যে দাদু.....'

—'কেন আমার সঙ্গে তিনি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমি জানি।' গম্ভীর হল রামপালা। 'উপায় ছিল না।'

—'কি! কি উপায় ছিল না? কি হল, চুপ করে রইলে কেন? বল।'

—'তুমি নাকি......' গম্ভীর হল সে। 'তাই বলেছিলেন তিনি। তুমি যে.....কি জানি, শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল।'

—'কি আমি?' অধৈর্য্য হল কান্তা। 'স্পষ্ট করে বল, আমি কি?'

—'আমাকে দেখার মূহুর্তেই আমার প্রতি তোমার মন.....' গম্ভীর হল। 'শোনার পর, কি করি বল।'

—'দাদু বলেছে একথা! কক্ষনো নয়।' মাথা ঝাঁকাল কান্তা। উঠে বসল। বলল, 'আমাকে স্পর্শ করে বল, দাদু একথা বলেছেন।'

—'না, ঠিক ওই ভাবে তিনি কথাটা বলেননি। তিনি বলেছিলেন......'

—'কি বলেছিলেন দাদু?'

—'ওই যে। আমারও মনে হয়েছিল। সেই যে, যেদিন তুমি আমাকে আশ্রয় দিলে, মন্দিরে লুকিয়ে রাখলে। আমার মনে হয়েছে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই না? তুমিই বল। যদিও, হ্যাঁ, বিপদে পড়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলাম। করতেই পারি। তাই বলে, অবশ্য তুমি যদি আমাকে আশ্রয় না দিতে......'

বাধা দিল কান্তা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার উচিৎ হয়নি।'

—'আমারও তাই মনে হয়।' হাসল সে। বলল, 'বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যর সৈন্যরা আমাকে ধরতে পারলে কি সুন্দর নির্যাতন করতে পরতো। অবশ্য সে সম্ভাবনা যে এখন নেই, তা নয়। তুমি কি বল?'

স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল কান্তা। মুখ মণ্ডল পাংশু। বলল, 'তোমার শত্রুরা কি এখনো তোমার সন্ধানে ফিরছে?'

—'ফিরছে বৈকি। ফেরাইতো উচিৎ। তুমি কি বল? গোপালের বংশধর জীবিত থাকুক, আমি হলেও চাইতাম না। আর.....'

—'কি?' স্বামীর মুখের দিকে চাইল কান্তা।

—'রাজধানীতে গোপালের বংশধর কিছু আছে। আমার মনে হয়......'

—'কি মনে হয় তোমার?'

—'রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর দিব্য কিছুদিন তাঁদের কোন অনিষ্ট করবে না। তাতে তার ক্ষতি হবে। তারপর নিশ্চয়ই সে তাঁদের একে একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কন্টক হবার চেষ্টা করবে।' নীরব হল তার কণ্ঠস্বর। সামান্যক্ষণ নীরব থাকার পর ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। কান্তাকে দেখল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'থাক্ ওসব কথা। অহেতুক চিন্তা করে কোন লাভ নেই। হিসাব মেলেনা, মিলবে না। মিলছে না।'

—'কি!' মৃদু কণ্ঠস্বর কান্তার।

—'তোমার আমার এই যে মিলন। শৈব তুমি, আমি বৌদ্ধ। হাসল রামপাল। 'মহারাজ শশাঙ্কের রক্তধারার সঙ্গে গোপালের.....চিন্তা করলে শরীরের মধ্যে শিহরণ অনুভব করি। তুমি কর না?

—'না তো।' মাথা নাড়ল কান্তা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ধর্ম নিয়ে কোনদিনই বিশেষ চিন্তা ভাবনা স্থান পায়নি মনে। দাদুই শিখিয়েছেন, মানুষ তাঁর কাছে বড়।'

—'ঠিক। উচিৎ শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন। তবে.....'

—'কি তবে?'

—'আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে কেন যে জড়ালে সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না আমি।'

—'পারবে না।' কান্তা বলল, 'যদি বল, কেন জড়িয়েছি? আমার উত্তর, বেশ করেছি।'

অবাক হল রামপাল। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে কক্ষের মৃদু আলোয় পত্নীর আবছা মুখখানার দিকে চেয়ে রইল।

একসময় কান্তার মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, —'আর কিছু বলবে?

চুপ করে রইল রামপাল।

স্বামীর বুকে আলতো করে মাথা রাখল কান্তা। আস্তে বলল, 'এবার আমাদের যেতে হবে। বুঝলে। কটা দিন অযথা নষ্ট হল।'

কথা বলল না সে। বাইরে নিস্তব্ধ রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ল কান্তা।

পঞ্চম দিবস সূর্যোদয়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করল ওরা। বৃদ্ধ বৈদ্য চিকিৎসার জন্য অর্থ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। শুধু আশ্রয় নয়, আহার পর্যন্ত দিয়েছেন তিনি। শুনেছিলেন তাঁর কথা। পত্নী বিয়োগের পর সংসারে তিনি সম্পূর্ণ একা। বলেছিলেন, 'অজ্ঞাত পরিচয় তোমরা। তবু তোমাদের আমার ভালই লেগেছে। যদি মনে কর কয়েকটি দিন নিঃসঙ্কোচে আমার গৃহে থেকে যেতে পার।'

রামপাল নীরব থেকেছে।

তিনি কান্তার দিকে চেয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি কি বল?'

কান্তা কিছুই বলতে পারেনি। এখন পথ চলতে চলতে দাঁড়াল সে। তার দিকে চাইল রামপাল।

মৃদু কণ্ঠে সে বলল, 'কেমন যেন.....'

—'কষ্ট হচ্ছে? অনাত্মীয়ের স্নেহ বড় কষ্ট দেয়। আমারও মনে হয়েছিল তোমার শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থেকে যাই। কিন্তু সাহস হয়নি। বিপদ কখন কোনদিক থেকে আসবে বলা যায় না। আমার মিত্ররা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান থেকে বিরত হয়নি। চলো কান্তা।'

স্বামীকে অনুসরণ করল সে।

গভীর রাত্রে দ্বারে করাঘাত শুনে নিদ্রা ভঙ্গ হল মানীবালার। টুক্ টুক্ করে কে যেন আওয়াজ করছে। শুয়ে শুয়ে শুনল একটু। ধীরে ধীরে শয্যায় উঠে বসল। বয়সের ভারে শরীর অসক্ত। নিজের কাজটুকু নিজেই করে নিতে পারে এখনও। পঞ্চমী যখন ছিল, তখন কিছুই করতে দিত না। প্রথম প্রথম খুবই ঘেন্না করত। হিজড়ে। মুখ দেখলে পাপ হয়। গেনি কিন্তু.....সেই যত নষ্টের গোড়া। একটা রাত থাকতে দিয়েছিল। থেকে গেল। তাও গেনির জন্যেই। আর ছিল বলেই বেঁচেছে মানী। কবছর আগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। তখন কি করেনি। যা করেছে পেটের ছেলে মেয়েও করে না। তিনটে ঋতু পার হয়ে গেল পঞ্চমী গেছে। বলে গিয়েছিল একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছে। অবশ্য কেউ জানতে চাইলে বলে যেন বাড়ি গেছে। নিজের জন্ম ভিটে দেখতে গেছে একবার। তাই বলেছে। পরাণ সম্পর্কে জ্ঞাতি হয়। সেই এখন দেখাশোনা করছে। ওর বউ -মেয়ে দেখাশোনা করে তাকে।

টুক্-টুক্-টুক্।

আবার শব্দ। মানীবালা সাড়া দিল, 'কে?'

কোন উত্তর নেই। বোধহয় কেউ নয়, হাওয়ার শব্দ।

শুয়ে পড়ছিল মানী। কাঁথাটা কোমর পর্যন্ত টেনে নিয়েছিল। আবার শব্দ শোনা গেল।

—'কে?' গলা চড়াল মানী।

উত্তরে টুক্ টুক্ শব্দ হল ক'বার।

শয্যা থেকে নেমে প্রদীপের সলতে উস্কে দিল। একটু ভয় ভয় যে করছেনা তা নয়। দিন কাল ভাল নয়। চোরের বাড় বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে। ঘটিটা-বাটিটা যা পাচ্ছে নিয়ে পালাচ্ছে। আগে এমন ছিল না। সারা রাত ঘরের দরজা খুলে রাখলেও কিছু হত না। তাদের মত গরীবের ঘরের দিকে ফিরেও চাইতো না চোরের দল।

টুক্-টুক্-টুক্।

মানী বলল, 'দাঁড়াও, যাচ্ছি।'

প্রদীপ হাতে দরজা খুলল মানী। সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চমী।

ভাল করে দেখে বলল, 'তুই! তা ডাকবি তো। আয়, ভেতরে আয়।'

ভেতরে এল পঞ্চমী। বলল, 'একটু জল নেব পিসি। বড় পিপাসা পেয়েছে।'

অবাক হল মানী। বলল, 'জল খাবিতো আমাকে জিজ্ঞেস করে খেতে হবে? এতদিন খাসনি?

উত্তর দিল না পঞ্চমী। কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেল।

মানী জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু খাবি?'

—'না পিসি, একটু আগেই পরাণ দাদার ওখানে খেয়েছি।'

—'তুই কি পরাণের ঘর হয়ে আসছিস?'

—'হ্যাঁ।' একটু চুপ করে থেকে পঞ্চমী বলল, 'খনিক পরে আমাকে নিতে আসবে পরাণ দাদা।'

—'নিতে আসবে!' অবাক হল মানী। বলল, যাবি কোথায়? আমার কাছে থাকবি না?'

—'না পিসি। আমার আর তোমার কাছে থাকা হল না।'

বুঝতে পারল মানী। পঞ্চমী একদিন চলে গিয়েছিল। অনেক দিন আগে। বেশ কটা ঋতু পার হয়ে গেছে তারপর। যাবার আগের দিন রাত্রে বলেছিল, 'পিসি আমি কদিন থাকব না।'

—'থাকবি না? যাবি কোথায়?' অবাক হয়েছিল মানী।

—'কদিন একটু যাব।' পঞ্চমী বলেছিল, 'একটু কাজ আছে।'

—'কদিন?' ঘোলাটে চোখে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল। সুবিধের ঠেকেনি। মনের মধ্যে সন্দেহ জেগেছিল।

—'ধর দু'চার দিন, বেশিও হতে পারে।' হেসেছিল। বলেছিল, 'চিন্তা তোমার জন্যে। তবে পরাণদাদা সব সামলে নেবে বলেছে। আমি না থাকলেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

—'সামলে নেবে? কি সামলাবে শুনি? একবেলা দুটি খাই। আর কি।' আসলে বুকের মধ্যেটা হু-হু করে উঠেছিল।

—'জানি কষ্ট হবে তোমার। যেতে মনটা চাইছে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। কি যাব? তুমিই বল।'

—'যাবি কোথা?' আস্তে জানতে চেয়েছিল। কিছু না বললেও বুঝতে পারে। কেমন সন্দেহ হয়।

—'একটা কাজে যেতে হবে। এই টুকুই শুধু জানি। কি কাজ তার কিছুই জানি না।'

শুনে গম্ভীর হয়েছে মানী। এর আগেও কিছু ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চমী ঘরে না থাকলে উটকো লোক এসেছে হঠাৎ। পঞ্চমীর খোঁজ খবর করেছে। মানী কখনো তাদের কথার জবাব দিয়েছে, কখনো কোন কথাই বলেনি।

পঞ্চমী একসময় ডাকল, 'পিসি।'

মানী বলল, 'যাবি যা। তোকে আটকাব না। তবে কোথায় যাবি জানলে মনে স্বস্তি পেতাম।'

পঞ্চমী চুপ করে রইল।

—'কিরে?' মানী ওর মুখের দিকে চাইল। ভাবছিস বলে ফেলব। নারে। মুখে রা কাড়বো না।'

পঞ্চমীর ঠোঁট দুটো নড়ল। বলল, 'কোথায় যাব আমি জানি না পিসি। বিশ্বাস কর।'

—'কেন, জানিস না কেন?' মানী বলল, 'তোর কি যাবার জায়গা নেই?'

—'জায়গা আছে! কোথায়?' অবাক হল পঞ্চমী। মানীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—'কেন, একদিন যে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিলি, সেখানেই ফিরে যা-না।' একটু থামল মানী। বলল, 'নিজের ঘরে যাবি।'

—'সেখানে ফিরে যাব? একি বলছো তুমি! হয় না-কি? না-না।'

একটু চুপ করে রইল মানী। চুপি চুপি বলল, 'হয়তো তোর মা এখনও তোর জন্য.....'

—'আমার মা।' পঞ্চমীর সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। কতদিন—কতদিন সে ঘর ছাড়া।

—'হ্যাঁ-তোর মা। দুঃখে যন্ত্রণায় একদিন কুকথা বলেছিল, তুই বলেছিলি প্রতিদিন তোর মৃত্যু কামনা করতো। তবে.....নারে, মা কখনো তার সন্তানের মৃত্যু কামনা করতে পারে না।' আবার একটু চুপ করে রইল বৃদ্ধা। বলল, 'এই যে আমরা, আমার কথা ছেড়ে দে, আমি গেনির কথা বলছি, ও বলতো, দিদি, তোর আমার যদি একটা সন্তান থাকত, পঞ্চমীর মতই-তাহলেও কি আমাদের.....' কথাটা শেষ করতে পারল না।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পঞ্চমী। মানী ওকে ধরল। বলল, 'কাঁদিস নি। আমি বলছি, তুই ঘরে ফিরে যা।'

পঞ্চমী নিথর, পাষাণ।

ঘরে ফিরছে পঞ্চমী। শেষ রাত্রির নির্জনতাকে ছিন্ন করে এগিয়ে চলেছে পরাণের গো-সকট। যদিও সকট টেনে নিয়ে চলেছে সুখ।

এক সময় পরাণ বলল, 'করতোয়ার ধার পর্যন্ত তোমাকে আমি পৌঁছে দোব। নদী পার হয়ে চলে যেও। তবে এসে তুমি ঠিক কাজ করনি ভাই।'

সকটের মধ্যে মুড়ি দিয়ে বসেছিল পঞ্চমী। পরণে তার পুরুষের বেশ। প্রশ্ন করল, 'এখনও কি আমার খোঁজ হয়?'

—'এক সময় খুবই হয়েছিল। এখন ততোটা নয়। তবে কিছুতো বলা যায় না।'

চুপ করে রইল পঞ্চমী। পোড়া তলার রাধা তাকে তাদের সঙ্গে থাকতে বলেছিল। ওরা দণ্ডভুক্তির পথে যাত্রা করেছে। বরেন্দ্রে আর ফিরবে না। আবার রাধাই পরে বলেছে, 'না, আমাদের সঙ্গে তোমার যাওয়া চলবে না।'

পঞ্চমী চুপ করে থেকেছে।

রাধা বলেছে, 'কিছু মন কোর না। তোমার কথাতো জানি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। কষ্ট হবে তোমার।'

পঞ্চমী বলেছে, 'জীবনেতো কম কষ্ট পাইনি।'

রাধা বলেছে, 'আমি সে কষ্টের কথা বলছি না পঞ্চমী। হিজড়ে হয়ে জন্মানোর যে

কি কষ্ট তা তো জানি। কার বাড়িতে ছেলেপুলে হল বা সখ করে হিজড়ে নাচালে, যা পাওয়া যায় তাতে পেট চলে না। জঠর জ্বালা বড় জ্বালা। শরীরের জ্বালাটাও কম নয়। তুচ্ছ কারণে যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, দেখে আমরই ভয়ে বুক কাঁপে। নোংরা জীবনটাও বেছে নিতে হয়েছে পেটের জন্যই।'

সব জানে পঞ্চমী। পোড়াতলার বাসিন্দাদের জীবনের কথা তার অজানা নয়। গা ঘিন ঘিন করে। আবার সেই তারাই কুমার রামপালকে সীমান্ত পার করে দিয়েছিল। শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে একাজ করেছে বিশ্বাস করতে পারে না। রাধাও সে কথা বলেছিল তাকে। 'পঞ্চমী, কুমারকে নিরাপদে সীমান্ত পার করে দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু অর্থও দেওয়া হয়েছে। তবে শুধু অর্থের জন্যে একাজ করিনি। যখন বললে, এই কাজ করতে হবে। কেউ-ই অর্থ নিতে রাজি হয়নি।'

—'করলে কেন?' আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল সে।

রাধা তার কথা ঠিক বুঝতে পারেনি। মুখের দিকে চেয়েছিল।

পঞ্চমী বলেছিল, 'এখনতো দেশে নতুন রাজা।'

—'এই নতুন রাজাকে মানতে পারিনি আমরা। নতুন রাজা। সিংহাসনে বসে রাজা হল। রাজা হল কে, না একটা দস্যু। মেনে নেওয়া যায়? কেউ পারবে?'

—'যিনি রাজা ছিলেন তিনি তো.......'

—'মানুষ ভাল ছিলেন না। মানুষ অনেক কষ্টে ছিল। নতুন রাজা হয়তো মানুষের কষ্ট দূর করবে। তবু....'

বুঝতে পেরেছে পঞ্চমী। চুপ করে থেকেছে। মেনে নিতে কষ্ট হয়। মহারাজ মহীপালের শাসন অবসানের জন্য যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, তাদের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করেছে সে। কিন্তু মহারাজের মৃত্যু সংবাদে কষ্ট পেয়েছে। দিব্যর সিংহাসন দখল সে নিজেও মেনে নিতে পারেনি।

রাধাদের দলের কাছে বিদায় নিয়ে দুটো দিন অনেক চিন্তা করেছিল। ভেবেছিল যেদিকে পারে চলে যাবে। পারে নি।

এখন চলে যাচ্ছে। আপন ঘরের সন্ধানে। যে ঘর একদিন অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা, অপমানে ছেড়ে এসেছিল।

মায়ের কথা মনে পড়ল তার। কত বছর হল। এতদিনে মা নিশ্চয়ই বৃদ্ধা হয়ে গেছে। বেঁচে যদি না থাকে?

বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠল। মা যদি....

—'দিদি।' পরাণের কণ্ঠস্বর।

সাড়া দিল পঞ্চমী।

—'আমি ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।' পরাণ বলল, 'ভেবেছিলাম তোমায় থাকতে বলব। সাহস হল না। দিন কাল বড় সুবিধের নয় দিদি। এ বরং ভালই করবে। সংসারে আপনজন মা তো আছে।'

আপনজন উঃ। মা। নিজের মনেই কথাটা বারবার উচ্চারণ করল পঞ্চমী। তার মা। অনেক কষ্ট দিয়েছে মাকে..... আছে কি? যদি না থাকে.......

অন্ধকার রাত্রি। সন্তর্পণে পথ চলছিল সে। রাজধানীতে এখন দিন রাত্রি সতর্ক প্রহরা। মহারাজ মহীপালের রাজত্বে রাজপথ নিষ্প্রদীপ থাকত,এখন মশালের আলোয় আলোকিত। দাণ্ডিকের দল সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। ঘোরে গুপ্তচরের দল। মহারাজ দিব্যর রাজধানী সুরক্ষিত এখন। সুশৃঙ্খল।

যে সমস্ত মন্ত্রী অর রাজকর্মচারীরা মহারাজ মহীপালের রাজধানীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলেন, মহারাজ দিব্য কৌশলে একে-একে তাঁদের অপসারিত করেছেন। মহারাজ মহীপালের বিরাগভাজন মন্ত্রী-অমাত্যদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন শাসনকার্যে। রাজ্যে অরাজকতা দূর করতে প্রয়াসী হয়েছে মহারাজ দিব্য।

ভাল কাজ। প্রশংসনীয়। কিন্তু....... না, দিব্যর রাজ্যশাসন সম্পর্কে তার কোন অভিযোগ নেই। দিব্য বরেন্দ্রর রাজা হয়েছে বলে সে এতটুকু.....না, এখন আর সে। দিব্যর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। সিন্ধুবালাকে কথা দিয়েছে। বরং তাকে ধরার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। কতদিন নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

মহারাজ মহীপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল আজ তাদের অনেকেই প্রয়োজনীয়তা নেই দেখে নিজ নিজ কর্মে মনোনিবেশ করেছে। গোপনে যে সব মন্ত্রী-অমাত্য আন্দোলনকারীদের সাহায্য করতেন দিব্য তাঁদের সাহায্য প্রার্থী হতে তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। রাজাকে সাহায্য করছেন। তাহলে সে কি করবে?

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। প্রজাদেরও দায়িত্ব থাকে। রাজার অন্যায় অত্যাচার নির্বিচারে মুখ বুজে সহ্য করলে রাজা তাঁর পীড়নের মাত্রা বাড়াবেন। প্রয়োজন প্রতিবাদ। সেই পথই মহারাজ মহীপালের রাজত্বকালে গ্রহণ করা হয়েছিল। দস্যু দিব্যর সহকারী সে প্রভুর নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণ করে আন্দোলনকারীদের দলে যোগ দিয়েছিল। অর্থ সাহায্য করেছে। আবার দিব্য যখন তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে বন্দীশালায় আশ্রয় নিয়েছে।

দিব্য তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। এখনও করছে। অথচ দিব্য তাকে সন্তানবৎ....স্নেহ-দিব্যর স্নেহ। স্বার্থের জন্য দিব্য তাকে স্নেহ করেছে। তার চোখের সামনে নিজের হাতে পিতা মাতাকে হত্যা করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। প্রতিশোধ.....কিন্তু কি করে তা সম্ভব? রাজশক্তির বিরুদ্ধে একা কি করবে সে?

—'বন্ধু।' আহ্বান জানাল কেউ।

দাঁড়াল সে।

—'কি করবে কিছু স্থির করলে?

—'কি করবো?' অসহায় শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

—'তুমি চল। তোমাকে আমি নিতে এসেছি। তোমার চারিদিকে ঘোর বিপদ। রাজ অন্তঃপুরও আর তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

—'আমি বলছিলাম, আর ক'টা দিন.................

—'না মনস্থির করার সময় আর নেই। তোমার অনেক সংবাদ-ই অবগত হয়েছে দিব্য। দিব্যকে দস্যু জেনেও বরেন্দ্রর প্রজাদের হিতের জন্য সৎ মন্ত্রী অমাত্যরা সহযোগিতা করছেন। এখন তুমি কি করবে?'

—'আমি!' একটু নীরব রইল সে। এক সময় তার ম্লান কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল, 'আরতো কিছুই করার নেই আমার। না?'

—'এজন্য তুমি কি খুব কষ্ট পাচ্ছ?'

—'কষ্ট।' আবার সে একটু চুপ করে রইল। বলল, 'নিজের জন্য কষ্ট পাচ্ছি, সকলের জন্য নয়।'

—'বুঝলাম না।'

—'সত্যই কি বুঝতে পারলে না?'

—'একবারেই যে বুঝতে পারনি তা নয়। জানি, অতীতকে ভোলা সম্ভব নয়। কেউ পারে না। তুমিও পারবে না। কিন্তু বরেন্দ্রর প্রজাদের স্বার্থে এটুকু তো তোমাকে করতেই হবে।'

—'আমি তা স্থির-ও করেছি। কুমার জননীকে জনিয়েছিল সে কথা। কুমারের সন্ধান কিছু পাওয়া গেছে?'

—'কুমার শূরপাল মগধে পৌঁছেছেন এ সংবাদ তো জান। কুমার রামপাল বণিকদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গ তিনি ত্যাগ করেছেন। দিব্যর ছদ্মবেশী সৈনিকরা স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।'

—'সুসংবাদ।'

—'কিন্তু কুমার রামপাল কোথায় গেলেন? কেনইবা তিনি বণিকদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন?'

—'নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ ঘটেছিল যার জন্য তিনি বণিকদের সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। শোন বন্ধু, কথা দিচ্ছি। আজ রাত্রেই আমি রাজধানী ত্যাগ করবো। চিন্তা কোর না। আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাঘব।'

—'যাবে কোথায়?'

—'তা এখনো স্থির করিনি। তবে যেতে হবে।'

—'আমি একটা কথা বলব?'

—'বল।'

—'তুমি আমাদের কাছে গিয়ে থাকবে চল।'

—'তোমাদের কাছে?' চিন্তিত হল সে। বলল, 'তোমাদের কাছে গিয়ে থাকতে পারলে আমার সুবিধাই হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

—'সম্ভব নয় বলছো কেন?'

—'দেখ, এর আগে আমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তোমরা বিপদে পড়েছিলে। দিব্য আমাকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে কথা তোমাদের মত আমারও অজানা নয়। আমি নতুন করে আর বিপদে ফেলতে চাই না তোমাদের।'

—'দেখ, দিব্য আমাদের স্বজাতি। একদিন সে কি করেছিল সে কথা ভুলে আজ দেশের রাজা হওয়ার জন্য আমাদের গর্ব হওয়া উচিৎ, কিন্তু তার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি না, কারণ তার অতীত ভোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর বিপদের কথা বলছো, বিপদতো আমাদের পায়ে পায়ে, প্রতি নিয়ত আমরা বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা কষছি। আজ যে শিশু ভুমিষ্ট হল, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করতোয়ার বুকে নৌকা ভাসাবে পেটের অন্ন সংস্থানের জন্য। তাই বিপদকে আমরা মূল্য দিই না, তুচ্ছ জ্ঞান করি। যে দিব্য একদিন আমাদের ঘরের ছেলেদের জোর করে তুলে নিয়ে যেত তার দস্যু বৃত্তির জন্য, তাতো তুমিই বন্ধ করেছিলে। সে কথা আমরা ভুলিনি।'

সে নীরব রইল।

—'বন্ধু।' আবার আহ্বান।

—'বেশ।' কথা বলল সে, 'তুমি নৌকায় গিয়ে বসো। একটা সংবাদ জানিয়ে আসি একজনকে।' হয়তো আমার দেরী হবে।'

অন্ধকার পথে এগিয়ে চলল সে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটি গৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তরঙ্গময়ীর আশ্রয়স্থল। সতর্কভাবে দ্বারে মৃদু করাঘাত করল। সামান্য পরেই মুক্ত হল দ্বার, সামনে দাঁড়িয়ে তরঙ্গময়ী। তরঙ্গময়ী আহ্বান জানাল, 'আসুন।'

সে বলল, 'একটা সংবাদ জানাবার জন্য এসেছি।'

—'জানি, বিনা প্রয়োজনে আপনি আসেননি। কিন্তু বাইরে দাঁড়ান নিরাপদ নয়।'

কক্ষে প্রবেশ করল সে। বলল, 'বল।'

একটু ইতস্তত করে তরঙ্গময়ী বলল, 'সেনাপতি রুদোক আমাকে তিন দিন সময় দিয়েছে চিন্তা করার।'

—'রক্ষিতা করতে চায়!' গম্ভীর হল সে। বলল, 'অথচ মহারাজ দিব্য তোমাকে আর একজনের হাতে তুলে দিচ্ছিল।'

তরঙ্গময়ী মাথা নত করল।

—'তোমার দাসী কোথায়?' জানতে চাইল সে।

—'সে চলে গেছে।' মৃদু কণ্ঠে তরঙ্গময়ী বলল, 'ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে সে।'

—'তুমি কি চাও?' তার মুখের দিকে চাইল সে। 'মহারাজ মহীপালের রক্ষিতা?'

তারদিকে দৃষ্টিপাত করেই মাথা নত করল তরঙ্গময়ী। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার চাওয়াতো আজ আর আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। কি বলব আমি।'

—'তাই। তুমি আজ রাজবংশের আশ্রিতা। তুমি কি রোহিণীকে জানিয়েছো?'

—'না। আপনার কথা আমার প্রথম মনে হয়েছে। সেই জন্যই আমি কিছু জানাইনি। তাছাড়া আমাকে সতর্কও করা হয়েছে।'

—'আমার কথা! বেশ, তোমার এই বিপদের কথা তাঁকে জানাবার দায়িত্ব আমি নিলাম।'

—'বিপদ? কিসের বিপদ? সেনাপতি রুদোকের প্রস্তাবকে আমি বিপদ মনে করবো কেন? আমার যা পরিচয়, বর্তমান, এ প্রস্তাব আসাটাই তো স্বাভাবিক। যদিও.....' থেমে গেল তরঙ্গময়ী। ম্লান কণ্ঠে বলল, 'জানিনা শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে কি আছে। যাই থাক, ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে।'

মহারাজ মহীপালের রক্ষিতার দিকে তাকাল সে। বলল, 'তুমি কি চাও?'

—'এ প্রশ্ন তো সামান্যক্ষণ আগেই করলেন আপনি।'

মনে পড়ল তার। তরঙ্গময়ীকে আবার দেখল। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

—'চলে যাচ্ছেন?' অবাক হল তরঙ্গময়ী। তাকে দেখল। বলল, 'চলে যাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ। সে কথা জানাবার জন্যই আমার আসা। আজ রাত্রে, এখনই চলে যাচ্ছি আমি।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল তরঙ্গময়ী। মাথা নত করে স্থির পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মুহূর্তকাল ওকে দেখল সে। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'তরঙ্গ।'

মুখ তুলল তরঙ্গময়ী। তার দুচোখ ভরা অশ্রু।

হাসল সে। বলল, 'বন্ধুর পথে একজন বন্ধুর প্রয়োজন। যদি যেতে চাও, আমার সঙ্গে আসতে পার। কথা দিচ্ছি, তোমার অসম্মান করবো না। যাবে আমার সঙ্গে?'

—'যাব, চলুন।' মৃদু কণ্ঠে বলল তরঙ্গ।

—'তোমার প্রয়োজনীয় .....বসন, অলঙ্কার.....

হাসল তরঙ্গ। একবার দেখল তাকে। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আজ আমার কিছুর প্রয়োজন নেই।'

—'সত্য বলছো নেই?'

দৃঢ় কণ্ঠে তরঙ্গময়ী বলল, 'না, নেই।'

ছাব্বিশ

দু'ভাইয়ের আবার মিলন হল। পরস্পর পরস্পরের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, শূরপাল কনিষ্ঠকে বুকে টেনে নিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ওঃ, তোমার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। দিনগুলোকে বড় দীর্ঘ মনে হয়েছে, রাত্রি দীর্ঘতর। মনে মনে বড়ই অস্থির হয়েছি।'

কুমার রামপাল অগ্রজকে সব কথাই জানাল। কিভাবে সে বরেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত মগধে এসে পৌঁছাতে পেরেছে। তাও সম্ভব হত না, যদি না একদল তীর্থযাত্রী তাদের রক্ষা করত।

শূরপাল কনিষ্ঠের দিকে চাইলেন।

বলল কুমার। বৈদ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে সঙ্গীসহ সে যখন উদন্তপুরের পথে, তখন একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তারা উপযাচক হয়ে তাদের সঙ্গী হবার আহ্বান জানায়। মনে সন্দেহ জেগেছিল। ইতস্তত করেছিল তীর্থযাত্রীদের সঙ্গী হবে কি -না। তীর্থযাত্রীদের একজন, জয়নাথ, তাকে আশ্বস্ত করে। জানায়, 'নির্দ্বিধায় আপনি আমাদের সঙ্গে পথ চলতে পারেন। কোন রকম অনিষ্টের আশঙ্কা করবেন না। কারণ আশ্রিতের ক্ষতি প্রাণ থাকতে হতে দেব না আমরা।'

সে জয়নাথের দিকে চেয়েছিল। বলিষ্ঠ তরুন। অবিশ্বাস করতে পারেনি তার কথা।

জয়নাথ বলেছিল, 'আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আমি মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছি না।'

—'বিশ্বাস করতে পারি?' চিন্তা করেছিল রামপাল। কান্তার দিকে চেয়েছিল।

—'পারেন কুমার।' গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল জয়নাথ।

রামপাল জয়নাথের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়েছিল। বুঝতে পারেনি জয়নাথ তাকে কেমন করে চিনল।

—'আপনি আমার পরিচিত কুমার।' মৃদু কণ্ঠে জয়নাথ বলেছিল, 'আপনার সব কথাই জানি। আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন। মগধে পৌঁছে দেব।'

তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গী হয়েছে কুমার। পথ চলেছে। কিন্তু তৃতীয় দিবসের রাত্রি প্রভাতে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে তীর্থযাত্রী দলের রূপান্তর ঘটেছে। শতাধিক তীর্থযাত্রী অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েকজন পথ অবরোধকারীর ওপর। অস্ত্রের আঘাতে মুহূর্তে ধরাশায়ি করেছে। চিনতে পেরেছে তাদের। তার অনুসরণকারীদের কয়েকজন। অস্ত্র লুকিয়ে রেখে আবার সাধারণ রূপধারণ করেছে তীর্থযাত্রীরা। কুণ্ঠিত জয়নাথ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিস্মিত রামপাল জয়নাথের মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে।

—'কুমার।' মৃদু কণ্ঠে ডেকেছে জয়নাথ।

—'এ কেমনভাবে সম্ভব। দেখে মনে হল তোমরা সকলেই অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী।'

—'না কুমার। আমরা অস্ত্র বিদ্যায় কেউ-ই সুশিক্ষিত নই।' জয়নাথ বলেছে, 'তীর্থ ভ্রমণে বেরুবার আগে আত্মরক্ষার জন্যই কিছুদিন অস্ত্র শিক্ষা করেছি মাত্র।'

জয়নাথের কথা শুনেছে রামপাল। বিশ্বাস করতে পারেনি। অবশেষে তীর্থযাত্রীরা তাদের মগধে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

শূরপাল জানতে চাইলেন, 'তীর্থযাত্রীরা যাবে কোথায়?'

—'বারাণসী যাবে বলে শুনেছি তাদের কাছে।'

—'শোন, পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত।' শূরপাল বললেন, 'কয়েক দিন বিশ্রাম নাও। তোমার সঙ্গীরও বিশ্রামের প্রয়োজন। তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে না বলে সঙ্গে আনতে পারতে।'

—'সঙ্গেই আনছিলাম। দ্বারি বাধা দিল।'

—'বাধা দিল!' পরিচারককে ডাকলেন শূরপাল। কুমারের সঙ্গীকে নিয়ে আসার আদেশ জানালেন। একজন কক্ষে প্রবেশ করল।

বিস্মিত কুমার বলল, 'একি জয়নাথ, তুমি?'

হাসল জয়নাথ। প্রণাম জানাল।

হাসলেন শূরপাল। বললেন, 'খুব বিস্মিত হয়েছো বলে মনে হচ্ছে?

গম্ভীরভাবে কুমার বলল, 'এখন বুঝতে পেরেছি।'

মৃদু কণ্ঠে শূরপাল বললেন, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে খুবই বিলম্ব ঘটে গিয়েছিল। শেষে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে মগধের সৈন্যদের কয়েক দলে বিভক্ত করে পাঠিয়েছিলাম। সব দলেই তোমাকে চেনে এমন একাধিক ব্যক্তি ছিল। সংবাদ পেয়েছি তোমার অনুসরণকারীরা বরেন্দ্র ফিরে যাচ্ছে। একদল সংবাদ দিয়েছিল তোমার অনুসরণকারীদের মধ্যে কয়েকজন তোমার সন্ধানে আসছে আবার।

পরিচারক কান্তাকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

শূরপাল তাকে দেখলেন। কিশোর। পরণে মলীন বসন। ধূলি ধূসরিত শরীর। মাথার চুল খুবই ছোট করে কাটা। বললেন, 'তোমার নাম কি?'

রামপাল বলল, 'ও কান্ত।'

—'কান্ত—কি কান্ত?'

—'ও শুধুই কান্ত। আমার পথসঙ্গী।'

মৃদুকণ্ঠে কান্তা বলল, 'কুব্জবাটি থেকে আমি কুমারের সঙ্গে আছি।'

—কুব্জবাটির (সাঁওতাল পরগণা) রাজা শূরপাল। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে.....'

—'আশ্রয় প্রার্থনার কথা চিন্তা করেছিলাম। রামপাল বলল, কিন্তু সাহস হয়নি। যদি.....'

—'উচিৎ কাজই করেছ তুমি।' বল্‌লেন শূরপাল, 'শোন কান্ত, শুনলাম কুমারকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ তুমি। তুমি আজ থেকে মগধের রাজঅতিথি রূপে থাকবে।'

রামপ্‌াল বলল, 'না মহারাজ, তা বোধহয় উচিৎ হবে না।'

শূরপাল ভাইয়ের দিকে চাইলেন।

রামপাল বলল, 'আমি কান্তদের গৃহে কয়েকদিন আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন ওকে উদয়অস্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। কি কান্ত, তুমি কর্মহীন অবস্থায় আহার নিদ্রায় মগ্ন থাকতে পারবে?'

না, বলে ঘাড় নাড়ল কান্তা।

—'তাহলে?' দ্বিধায় পড়লেন শূরপাল।

—'আপনি এক কাজ করুন মহারাজ।' রামপাল বলল, 'কান্ত খুবই কর্মঠ। আপনি ওকে পরিচারকের কাজে নিযুক্ত করুন।'

—'পরিচারক!' চিন্তা করলেন শূরপাল। বললেন, 'কান্ত তাহলে আজ থেকে তোমার পরিচারক নিযুক্ত হল। কি কান্ত তোমার আপত্তি আছে?'

না বলতে গিয়ে হেসে ফেলল কান্তা। বিস্মিত হলেন শূরপাল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল কান্তা।

ভাইয়ের মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন শূরপাল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ-কে?'

—'ও কান্ত।' বলল রামপাল।

—'কিন্তু.......' কান্তাকে দেখলেন তিনি। সন্দেহ ঘনাচ্ছে তাঁব দৃষ্টিতে।

রামপাল বলল, 'আপনি ওকে অন্যত্র কর্মে নিযোগ করতে পারেন। কি কান্ত, তোমার আপত্তি নেই তো?'

কান্তা মৃদু হাসি মুখে মাথা ঝাঁকাল।

আবার পরিচারককে আহ্বান জানালেন শূরপাল। বললেন, 'শোন, তুমি কুমারের সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ভাল করে স্নান করিয়ে উত্তম বেশ পরিধান করাবে। সব কিছুই নিজের হাতে করবে। যাও কান্ত, তোমার উপকারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কোনরকম সঙ্কোচ কোর না।'

কান্তার মধ্যে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

শূরপাল পরিচারককে ইঙ্গিতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কুমার, তোমার সঙ্গীকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভয় পেয়েছে।'

রামপাল অগ্রজের দিকে তাকাল। বলল, 'না-না, ঠিক তা নয়। তবে....'

—'এই মিথ্যাচারের কি কোন প্রয়োজন ছিল কুমার?

—'আজ্ঞে আমি ঠিক.....'

—বুঝতে পারছো না?' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।'

—'আপনি.....'

—'হ্যাঁ, বধূর একি অবস্থা করেছো? কেশ কর্তন করেছো কেন?

—'আজ্ঞে বিশ্বাস করুন আমি ওর কেশ কর্তন করিনি। ও নিজেই.....কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝলেন.....'

—'কেমন করে বুঝলাম?' বাধা দিলেন শূরপাল। বললেন, 'সংসারে নর নারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সত্যই আমার কম। তবু.....থাক এসব কথা। আর তুমি কান্ত নও - কান্তা। শোন কান্তা, বল, তুমি নিজের কেশ কর্তন করলে কেন?'

রামপাল বলল, 'সে সময়.....'

—'তুমি নও।' বাধা দিলেন শূরপাল। 'কান্তা তুমি সঙ্কোচ কোর না। আমাকে সঙ্কোচ করার কোন কারণ নেই তোমার। আমি তোমার মুখেই শুনতে চাইছি।'

লজ্জিত কণ্ঠে কান্তা বলল। শুনে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন শূরপাল। বললেন, 'কান্তা, ভাতৃবধূ হলেও আমি তোমার নাম ধরে ডাকছি। কুমার সাহসী, বীর, বুদ্ধিমান। তুমিও বুদ্ধিমতীর পরিচয় দিয়েছো। যদিও তোমাকে কিছুটা শ্রীহীন লাগছে। তা লাগুক। তুমি যদি কুমারের সঙ্গিনী না হতে, কুমার পৌছাত মগধে, তবে কত দিন তার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হত আমি জানি না।'

রাত্রে কান্তা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

তারদিকে চাইল সে, 'কোন প্রশ্ন?'

—'মহারাজ বললেন তুমি সাহসী, বীর, বুদ্ধিমান। কিন্তু......'

—'কিন্তু কি?'

—'ওই যে তিনি বললেন শীঘ্র মগধে আসতে না। কেন বললেন?'

—'কেন?'

—'আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি।'

—'আমি -আমি......'

—'বাল্যকাল থেকেই তুমি কিছুমাত্রায় খেয়ালী প্রকৃতির। রাজধানী ত্যাগ করে বরেন্দ্রর পথে প্রান্তরে....আমি শুনলাম। তোমার অনেক কথাই আমার জানা হয়ে গেছে।'

—'মাত্র কয়েক দণ্ডের মধ্যেই......'

—'কয়েক দণ্ডই আমার কাছে যথেষ্ট। তোমার কথা এখানকার অনেকেই জানেন। তুমি তোমার স্বর্গত পিতার মতই.......তিনি তোমার মতই দেখতে ছিলেন। সাহসী, বীর, যোদ্ধা, আবার......সকলের মধ্যে থেকেও একা। নিজের মধ্যেই এক অচেনা মানুষ। বিশ্বাস কর।'

কান্তার মুখের দিকে তাকাল সে।

—'আমার বড় ভয় করে।' ফিস্ ফিস্ করে কান্তা বলল।

—'কেন?'

—'এতদিন তোমায় দেখছি। এক ভিন্ন মানুষ তুমি। লোভহীন, সংযত, মনে হয়......

—'কি মনে হয়?'

হেসে ফেলল কান্তা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'যেন দেবতা!'

হাসল সে। ওকে দেখল। হাত ধরে কাছে টেনে নিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ভিন্ন জীবনের ভিন্যরূপ দেখেছো কান্তা। পতি পত্নীর সম্পর্ক হলেও লক্ষ্য ছিল পথ পরিক্রমা। জানি না লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো কতদিন লাগবে। মগধ নয়, বরেন্দ্র। যে বরেন্দ্র থেকে পালিয়ে এসেছি মগধে, কিন্তু বরেন্দ্র আমাকে প্রতি নিয়ত হাতছানি দিচ্ছে। তার আকাশ, মাটি, অরণ্য, প্রান্তর—কেমন করে ভুলে থাকব বল?'

—'ভুলবে কেন? আবার তুমি বরেন্দ্রে ফিরে যাবে।'

—'কেমন করে?' যেন আর্তনাদ করে উঠল তার কণ্ঠ।

স্বামীর হাত ধরল কান্তা। বলল, 'যাবে তুমি। আমি বিশ্বাস করি, তুমি পারবে।'

পক্ষকাল পরের ঘটনা। চলে যাচ্ছেন শূরপাল। তিনি কোথায় যাবেন বলেননি। একদিন রামপালকে মন্ত্রণা গৃহে মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে বললেন, শোন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী আলোচনা আছে।'

কুমার শূরপালের দিকে চাইলেন।

তিনি বললেন, 'সিংহাসনের দায়িত্বভার তুমি গ্রহণ করো।'

—'আমি?' শুনে চমকে উঠল রামপাল।

—'হ্যাঁ তুমি। উপস্থিত মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। সকলেই সম্মত হয়েছেন। তুমি মগধের সিংহাসনে বসবে।'

—'কেন? আপনি থাকতে আমি কেন রাজা হবো?'

—'রাজা হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করার মত যোগ্যতা আমার নেই।'

—'কে বলল আপনি রাজকার্য পরিচালনার যোগ্য নন?'

—'আমার মনে হয়েছে। বিশ্বাস করো।'

—'কেন মনে হল আপনার?'

ভাইয়ের দিকে চাইলেন শূরপাল। কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না।

রামপাল ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন, 'মগধের সিংহাসনে আমাকে বসাতে চাইছেন। রাজা হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত কি আমি?'

মন্ত্রীদের দেখিয়ে শূরপাল বললেন, 'এঁরা তোমায় সাহায্য করবেন।'

—'আপনাকেও করছেন। তাহলে?' মৃদু কণ্ঠে রামপাল বলল, 'না-না, আপনি থাকুন। আমি জানি আপনি কেন দায়িত্ব মুক্ত হতে চাইছেন।'

শূরপাল কথা বলতে পারলেন না। একবার কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাইলেন শুধু।

রামপাল বলল, 'আমি চিন্তা করে দেখি।'

হাসলেন শূরপাল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের চিন্তা? না-না, এর মধ্যে আমি তো চিন্তার কিছু দেখছি না। তুমি যদি মগধের সিংহাসনে না বসো তাহলে সিংহাসন শূন্য থাকবে।'

জ্যেষ্ঠের কথায় বিস্মিত হল রামপাল। বলল, 'এ আপনি কি বলছেন?'

—'খুবই সত্য কথা বলছি। আমি রাজা হতে চাইনি বলেই বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসিনি। কারণ.........' একটু নীরব রইলেন তিনি। বললেন, 'রাম, রাজছত্র সকলের মস্তকে শোভা পেতে পারে না। পাল বংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে, দস্যু কবল থেকে মুক্ত করতে হবে বরেন্দ্রকে। আমি জানি আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে।'

—আপনি....'

হাসলেন শূরপাল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি ভাই।'

—'নতুন পথের সন্ধান।' বিস্ময় ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'একি বলছেন আপনি?'

—'হ্যাঁ তাই, চিরনতুন এক পথের সন্ধান। যে পথের সন্ধানে একদিন.....শোন রাম, আমার অনুরোধ, তুমি মগধের সিংহাসনে বসো। গোপালের বংশধারা অম্লান রাখ।'

কথা বলতে পারলনা রামপাল। জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। দেখল অপূর্ব দীপ্তি। শূরপাল বললেন,'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি পারবে।'

মগধের সিংহাসনে বসল রামপাল (১০৭৭ অব্দে)।

কয়েকদিন পরে একদল বৌদ্ধ শ্রমণকে পথ চলতে দেখা গেল। বিক্রমশীল বিহারের পথে চলেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে শূরপাল। পরণে কষায় বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক। এক বৌদ্ধ শ্রমণ এসেছিলেন মগধে, রাজ বেশ পরেছিলেন, আপন বেশ ধারণ করে আবার মিশে গেলেন জনারণ্যে।

বিষন্ন রামপাল।

মৃদু কণ্ঠে কান্তা বলল, 'চিন্তা করছো কেন?'

হাসল সে। বলল, 'না কান্তা, শুধু চিন্তা নয়। অনেক কাজ। অনেক....অনেক....।

সাতাশ

আকাশে অপরাহ্নের ছায়া ঘনাচ্ছে। ম্লান হচ্ছে দিনের আলো। আপন কক্ষে বসেছিলেন রামপাল জননী যৌবনশ্রী। এইমাত্র তিনি রোহিণীকে দেখে ফিরে এসেছেন। পক্ষকাল যাবৎ রোহিণীর শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। বৈদ্যের অনুপান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। যৌবনশ্রী অনেক বুঝিয়েছেন তাঁকে। বৃদ্ধা নীরব থেকেছেন।

কিছুক্ষণ পূর্বে পূর্ণ এসেছিল। যৌবনশ্রী গিয়েছিলেন।

পালঙ্কে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন রোহিণী। বলেছিলেন, 'বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। অন্তঃপুরের সকলের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। পূর্ণ সব জানে। ও তোমাকে সাহায্য করবে।' একটু চুপ করে ছিলেন তিনি। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। বলেছিলেন, 'রাজার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

যৌবনশ্রী তাঁর দিকে চেয়েছিলেন।

—'এখানে থাকা উচিৎ হবে না।' তিনি বলেছিলেন, 'রাজাকে বলেছি। রাজাই বলছি। দস্যু হলেও এখন নতুন পরিচয়। প্রজারা মেনে নিয়েছে। জানাবে বলেছে।'

—'যাবেন কোথায়?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল যৌবনশ্রী।

—'পালবংশের শাসন এখনও যেখানে আছে।' রোহিণী বলেছিলেন, 'সেখানে ছাড়া আরতো কোথাও যাওয়া যাবে না।'

—'মগধে?' যৌবনশ্রীর সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। 'মগধ যাত্রা করবেন! এই শরীরে?'

—'আর কোথা? শরীরের কথা চিন্তা করে লাভ কি বল। শরীরের ক্ষয় তো রোধ করা যায় না। বেলা শেষ হয়ে এল।'

—'সকলেই যাবে?' যৌবনশ্রী বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

—'সকলেই যাবে। এখানে কে দেখবে। রাজাও তাই চাইবে। তাকে জানিয়েছি।'

—'আমি কি করবো?'

—'দায়িত্ব তোমার। আমার দিন শেষ হয়ে এল। যদি থাকি, এখানেই। পূর্ণ থাকবে।'

—'এই পথযাত্রা? না, আপনি যাবেন না। হয় না। আগে সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর।'

—'চিন্তা কোর না। ব্যবস্থা একটা হবে। রাজার বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস হবে না। পালবংশের নারীদের সম্ভ্রমহানির সম্ভাবনা খুব একটা না থাকলেও পথে রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার একটু নীরব ছিলেন বৃদ্ধা। বলেছিলেন, 'দায়িত্বভার তোমার।'

—'আমি অন্য কথা চিন্তা করছি।' মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন।

—'বল।'

—'আপনি কি যেতে পারেন না?'

—'আমি!' উদাস হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আর কেন?' -

চিন্তা করছেন যৌবনশ্রী। মগধ যাত্রা.....মগধের সিংহাসনে এখন শূরপাল। যদিও কিছুদিন পূর্বে রটনা হয়েছিল শূরপাল দিব্যর সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছেন। তারপর আর কিছু জানা যায়নি। পরে জানা গেছে শূরপাল. মগধের সিংহাসনে বসেছেন। নিশ্চয়ই.....

দাসী এসে দাঁড়াল। তিনি তার দিকে চাইলেন।

—'একজন দেখা করতে চায়।'

—'কে?'

—'এক অপরিচিতা নারী।'

—'নারী!' চিন্তা করলেন। দাসীকে ইঙ্গিতে জানালেন তিনি যাচ্ছেন।

খুবই নিম্নশ্রেণীর নারী। দরিদ্র। দীন হীনের মত বেশভূষা। কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন তাকে। বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছো?'

মাথা নাড়ল নারী।

—'কেন?'

—'কটা কথা বলার জন্য এসেছি।'

—'বল।'

—আপনার দাসী বোধহয় শুনছে।' ফিস্ ফিস্ করে বলল নারী।

দ্বারের কাছে এগিয়ে এলেন যৌবনশ্রী। দাসীকে বললেন, 'শোন, তুমি এখন যাও।' বললেন, 'এবার বল।'

—'রাজা যদি অনুমতি দেয় আপনারা নিশ্চিন্তে মগধ যাত্রা করতে পারেন।'

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নারীকে নিরীক্ষণ করলেন যৌবনশ্রী। গম্ভীর হলেন। বললেন, 'তুমি কে?

—'আজ্ঞে আমাকে আপনি চিনবেন না।'

—'কোন পরিচয় নেই তোমার?'

এ প্রশ্নে একটু বিচলিত হল নারী। নীরব রইল।

যৌবনশ্রী বললেন, 'একজনের সঙ্গে তোমার চেহারার খুবই সাদৃশ্য আমার মনে হচ্ছে। যদিও সে আমায় কখনো দেখেনি, কিন্তু আমি তাকে দেখেছিলাম।' একটু থামলেন তিনি। দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ম করলেন। বললেন, 'তোমার নাম কি?'

—'আমার নাম কস্তুরী।'

—'কোথায় থাক?'

—'আজ্ঞে থাকি। খুবই কাছে থাকি।'

—'বুঝেছি বলবে না। বলার জন্য জোর করাও আমার উচিৎ নয়। শোন, রাজা অনুমতি দিলে নিশ্চয়ই সাহায্য নেব। যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে জানিও। আর.....হ্যাঁ, তার নাম ছিল.....হ্যাঁ, তরঙ্গ-তরঙ্গময়ী।

হেসে ফেলল কস্তুরী। বলল, 'আশ্চর্য তো। তরঙ্গ কে?'

—'তরঙ্গ। সে...... না, থাক, তার পরিচয় শুনে তোমার কাজ নেই।'

—'সে কোথায়?'

—'নেই।'

—'মরে গেছে?

—'জানি না।' গম্ভীর হলেন যৌবনশ্রী। সে রাত্রির কথা এখনও তাঁর মনে আছে। বদনকে আগেও কবার তরঙ্গের আশ্রয়ের দিকে যেতে দেখেছে। লোকটা ছিল কেমন ধরণের। শুনেছে খুবই কর্মঠ ছিল। তাঁর কখনই ভাল লাগেনি। যে রাত্রে তাকে দেখেছিল তার পরদিন জানা গিয়েছিল তরঙ্গময়ী নেই। বদনকেও পাওয়া যায়নি।

—'তাহলে তার কি হল?' আস্তে জিজ্ঞাসা করল কস্তুরী।

উত্তর দিলেন না যৌবনশ্রী। কস্তুরীকে দেখলেন। বললেন, 'আর কিছু বলবে।'

হেসে ফেলল কস্তুরী। দ্বারের দিকে যেতে যেতে দাঁড়াল। বলল, 'কুমারের কোন সংবাদ পেলেন?'

মনে মনে চমকালেন তিনি। কিছু বলতে গেলেন।

কস্তুরী বলল, 'চিন্তা করছেন কেন। কুমার নিশ্চয়ই ভাল আছেন। তিনি নিশ্চয়ই মগধে পৌঁছে গেছেন।'

কুমার ভাল আছে। মগধে পৌঁছে গেছে। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমক অনুভব করলেন যেন। কিছু বলতে গেলেন। দেখলেন কস্তুরী নেই—চলে গেছে। তাঁর মনে হল, এ সেই। কিন্তু......কি করবেন চিন্তা করতে পারলেন না।

কয়েক দিন পর রাজা দিব্যের অনুমতি এসে পৌঁছাল অন্তঃপুরে। অন্তঃপুরবাসিনীরা মগধ যাত্রা করতে পারেন।

রোহিণী যৌবনশ্রীকে বললেন, 'সব দায়িত্ব তোমার। সন্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী মগধের সীমান্ত পর্যন্ত তোমাদের পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ভার পেয়েছেন।'

রাত্রি প্রভাতে তিনি চির নিদ্রায় নিদ্রিতা হলেন।

মহারাজ দিব্য তার মন্ত্রণা গৃহের অদূরে একটি অতিথি নিবাস নির্মাণ করিয়েছেন। অতিথি নিবাসটি অদ্ভুত আকারের। গোলাকৃতি এবং খুবই ছোট। সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা। সেখানে তার এক বিশেষ অতিথি থাকে। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকজন মুক বধির ভৃত্য নিযুক্ত করেছে সে। তার যখন মন ভাল থাকে না বা বিষণ্ণ বোধ করে, অতিথির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসে।

সেদিন দুপুরে সভা শেষে মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার। তার ইচ্ছা ছিল প্রতিদিন রাজসভা বসবে। রাজবেশে সিংহাসনে বসে প্রজাদের দর্শন দেবে। অভাব অভিযোগ শুনবে। প্রতিকার করবে। তার সে আশা খুব একটা পূর্ণ হয়নি। রাজ্য পরিচালনা করেন সুদক্ষ রাজ কর্মচারী এবং অভিজ্ঞ মন্ত্রীরা। তাঁদের কাজে খুব একটা হস্তক্ষেপ করেনি সে। তবে রাজ্যে অরাজকতা খুব একটা দূর হয়নি। রাজ্য পরিচালনার ব্যয়ভার মেটাতে ধীরে ধীরে কর বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দাণ্ডিক, গুপ্তচর বহুগুণ বৃদ্ধি

করেছে। সেই সঙ্গে সৈন্য। যদিও মন্ত্রীরা তার সঙ্গে একমত হননি। যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের সব যুক্তিই সে খণ্ডন করেছে। বলেছে, 'দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে দাণ্ডিকের (পুলিশ) বিশেষ প্রয়োজন।'

রাজসভায় তাকে দেখার জন্য প্রজারা যে আসে না তা নয়। তবে বহু পরিচিত মুখ সব। সেইজন্য প্রতিদিন রাজসভা বসে না আর। মন্ত্রণা কক্ষেই মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে।

আজ সভা ছিল। উপস্থিত প্রজাদের মুখ পরিচিত। তাদের সঙ্গে ভিড় বাড়াতে গুপ্তচরের দল। অসহ্য বোধ হয়েছিল। প্রজাদের জয়ধ্বনি ব্যঙ্গ বলে মনে হয় এখন।

তা ভিন্ন মনও বিষণ্ণ। সিন্ধুবালা ইহলোক ত্যাগ করেছে। অবশ্য সে গিয়ে ভালই হয়েছে। তার আত্মার শান্তি কামনাও করেছে। দোষেগুণে ছিল নারী। খুবই শান্ত প্রকৃতির ছিল। তবে অপ্রিয় সত্য কথা সময়ে বলে দিত। সহ্য করতে হত। কারণ.....স্বপ্ন সফলের জন্য পত্নীর প্রতি পতির কর্তব্য পালন সম্ভব হয়নি। অবশ্য সে শয্যাশায়ী হবার পর দ্বিতীয় নারীতেও আসক্ত হয়নি সে। ইচ্ছা করলে....

অতিথি নিবাসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দ্বাররক্ষীও মূক-বধির। দ্বার মুক্ত করে দিল। একজন আসন দিল কক্ষদ্বারের সামনে।

—'কেমন আছো হে?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল দিব্য।

—'আরে মহারাজ যে, কি সৌভাগ্য আমার। প্রতঃপ্রণাম।'

—'এখন প্রভাত নয়, দ্বিপ্রহর।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল দিব্য।

—'দিবসে এই প্রথম সাক্ষাৎ।' গম্ভীরভাবে বলল অতিথি। 'জন্মসূত্রে রাজ কুমার হলে জানতে।'

—'এই.....।' ধমক দিল দিব্য।

—'এই আবার কি! চোখ গরম কোর না আমায়।' হাসল অতিথি। শ্মশ্রু আচ্ছন্ন মুখ মণ্ডল।

—'আছো কেমন?'

—'রাজ অতিথির যেমন থাকা উচিৎ তেমনি।'

—'আহারাদি?'

—'তোমার নির্দেশ মত মধ্যে মধ্যে আহারের কথা ভুলে যায় তোমার ভৃত্যরা। তা সত্ত্বেও বেশ আছি। তোফা। রাজভোগে আছি।'

এই প্রথম হাসি ফুটে উঠল দিব্যর ওষ্ঠে। বলল, 'আহারে। কি কষ্ট।'

—'না-না, ও জন্য দুঃখ কোর না। কষ্ট কিসের? তোমার কষ্টের কথা চিন্তা করে আমি নিজের কষ্ট ভুলে যাই।'

—'আমার কষ্ট?' অবাক হল দিব্য। 'কষ্ট আবার কি?'

—'কষ্ট নয়? কি আছে তোমার? পত্নী ছিল, চলে গেল। সন্তান নেই। আছে শুধু

সিংহাসন। রাজা সেজে বসেছো। এক দল চাটুকার তোমার নামে জয়ধ্বনি তুলে আকাশ কাঁপাচ্ছে। নিজের জয় ঢাক নিজে বাজাচ্ছ। তুমি.....'

—'থাম। এসব মিথ্যা প্রলাপ বকছো কি করে?'

—কি করে? আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখি যে।'

—'তোমার পরিণতির চিত্রটাও.....'

হেসে উঠল অতিথি। বলল, 'সকল জীবের পরিণতি একই। তবে মৃত্যুর কিছু তারতম্য আছে। সকলেই তো সৌভাগ্যবান নয় যে মৃত্যু চুপি চুপি এসে আদর করে নিয়ে যাবে। তবে মৃত্যু মৃত্যুই। অবশ্য তোমার পত্নী সৌভাগ্যবতী। তিনি চলে গিয়ে মুক্তি পেয়েছেন।

কথা না বলে গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল দিব্য।

অতিথি আন্তরিক কণ্ঠে বলল, 'পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিও না। তোমার শোভা পায় না। তুমি শুধু শঠ প্রবঞ্চক নও, হৃদয়হীনও। এবং অকৃতজ্ঞ।'

—'থাম।' চিৎকার করে উঠল সে। বলল, 'কৃতজ্ঞতাবোধের কথা আমাকে শোনাতে এসো না। যদি.....'

—'নির্যাতন করবে?' হাসল। বলল, 'ও টুকু শুধু বাকি আছে।'

কিছুক্ষণ নীরব রইল দিব্য। বলল, 'তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছো।'

—'অস্বীকার করছি না।'

—'কুমার শূরপালকে.....'

—'সেটা তোমার দুর্ভাগ্য বলতে পার। জীবনভোর অনেক ভুল করেছি, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।'

—'ভুল করেছিলে কেন?'

—'মানুষ মাত্রই ভুল করে।'

—'তুমি কি মানুষ?'

—'বলতে পার। আমি চিন্তা করি আমি কি মানুষ? কেন যে একের পর এক অন্যায় করে গেছি বুঝি না। কিসের প্রত্যাশায়। কোন রকম স্বার্থসিদ্ধি বা উচ্চাশা তো আমার মধ্যে ছিল না। তবু কেন যে.....তবে শেষ মুহূর্তে মনে হল, তোমার মত মানুষের হাতে কুমার শূরপালকে তুলে দেওয়া উচিৎ হবে না। বরেন্দ্রর রাজা হয়েছো ঠিক কথা, কিন্তু কুমার শূরপালের মত মানুষের বিচার করার অধিকার তোমার নেই। সেই জন্যই......'

কুমার শূরপাল বন্দী হয়েছেন। বন্দীকে নিয়ে সৈন্য আর গুপ্তচরের দল গোপনে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিল। সংবাদ গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বন্দী নিজেই তার মুখের আচ্ছাদন সরিয়ে ছিল। মুণ্ডিত মস্তক। পরণে কষায় বস্ত্র। হাসিমুখে লোহিত বলেছিল, 'কি মহারাজ চিনতে পারছো?'

অস্থিরভাবে আসন ত্যাগ করে, উঠে দাঁড়িয়েছিল দিব্য।

—'কি মহারাজ চলে যাচ্ছ?'

রক্তনেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল দিব্য।

শান্ত কণ্ঠ লোহিতের, 'আমার জন্য অযথা চিন্তা কোর না। আমি আজ সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

দিব্য কথা বলতে পারেনি। এখন বলল, 'লোহিত, তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে।'

লোহিত একবার শুধু চাইল দিব্যর দিকে।

নদীর ধারে অপেক্ষা করছিল একজন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি নেমেছে। ধীরে ধীরে কস্তুরী গিয়ে উপস্থিত হল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কার্য সফল।'

পুরুষ তার হাতটা চেপে ধরল।

—'আঃ, লাগছে।' মৃদু আর্তনাদ করে উঠল কস্তুরী। 'তোমার গায়ে বড় ক্ষমতা।'

অনুচ্চ কণ্ঠে হাসল পুরুষ। বলল, 'খুব ক্ষমতা?'

কস্তুরী চুপ করে রইল।

—'তরঙ্গ।' গাঢ় কণ্ঠে ডাকল পুরুষ।

—না, আমি তরঙ্গ নই, কস্তুরী।'

—'কস্তুরী! কেন?'

বলল সে। রানীমার দৃষ্টি সে ফাঁকি দিতে পারেনি। সে কস্তুরী হওয়া সত্ত্বেও নয়। তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন।

হাসল পুরুষ। বলল,'তাই, ভালই।'

—'কি ভাল?'

—'কস্তুরীই ভাল। চল। সে হাত ধরল তার। নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

আটাশ

ভানুপ্রিয়ার চিতার আগুন নিভেছিল ধীরে ধীরে। তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। আকাশ রক্তবর্ণ। মায়ের নিভন্ত চিতার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে। কাঞ্চন। একটু দূরে মাথা নীচু করে বসেছিল ভৃগু। শীর্ণ কঙ্কালসার শরীর। একমাথা শ্বেত শুভ্র কেশ। দেখলে মনে হয় অতি বৃদ্ধ। অথচ মানুষটা, হ্যাঁ মানুষটার জন্য বড় কষ্ট হয় তার। বুকের মধ্যে টনটন করে। মায়ের মৃত্যুতে কষ্ট হচ্ছে তার, আনন্দও হচ্ছে, মুক্তি পেয়েছে মা, যন্ত্রণার হাত থেকে। অসহ্য যন্ত্রণায় মা যখন ছটফট করতো চোখ ফেটে জল আসতো। ভৃগু সাধ্যমত চিকিৎসার ত্রুটি করেনি। কিছুই হয় নি। মায়ের যন্ত্রণা কাতর মুখটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠেছে।

কটা বছর এইভাবে চলেছে। মুদগগিরিতে আসার পর অনেকগুলো দিন তাদের ভাল কাটেনি। আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু অন্ন সংস্থানের কোন উপায় হয়নি। ভৃগু চেষ্টা করেছে। শ্রেষ্ঠীরাও তাকে কিছু কিছু সাহায্য যে করেননি তা নয়, কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। যা-ই করতে গেছে, তাতেই ব্যর্থ হয়েছে মানুষটা। মায়ের কিছু অর্থ আর অলঙ্কার ছিল—গেছে। মায়ের ব্যধী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জন্মের পরেই এ ব্যধীর সূচনা। স্ত্রী-ব্যধী। আগে কখনো কখনো যন্ত্রণা হত। শেষ দিনগুলিতে সব সময়। চিকিৎসায় ব্যধী নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়েছে বৈদ্যরা।

মায়ের নিভন্ত চিতার দিকে তাকাল কাঞ্চন। তার মা। জন্মদাত্রী। তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিল। কিন্তু নিজের জন্ম পরিচয় সে জানতো না। জানতে চেয়েছে মায়ের কাছে। বলেনি মা। বলল। বলল মাত্র কয়েকদিন আগে। যদি আগে বলতো। যদি.... বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল তার। একি হল? সে চিত্র তার বুকের মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। রাজার কুমার স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল। ভৃগু তাকে বলে ফেলেছিল এক অসতর্ক মুহুর্তে। তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, সে যেন তার মাযেব কাছে কথাটা প্রকাশ না কবে।

মুদগগিরির পথে চলেছে ভৃগুর সঙ্গে। মা গো-সকটে। পথ চলতে চলতে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল। একদিন কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা ভৃগু, এই যে বরেন্দ্রর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে আমরা চলেছি, কেন?'

ভৃগু বলেছে, 'মুদগগিরি খুবই সুন্দর জায়গা। আমি কয়েকবার সেখানে গেছি।'

—'আমরা কেন যাচ্ছি?'

ভৃগু চুপ করে থেকেছে।

—'কি হল, চুপ করে রইলে কেন?' তাড়া দিয়েছে কাঞ্চন।

—না-না, চুপ করে থাকবো কেন। বলনা কি জানতে চাও?'

—'আমরা বরেন্দ্র ত্যাগ করলাম কেন? কি কারণে?'

—'কারণ? কারণ আবার কি। কোন কারণই নেই।'

—'বিনা কারণে আমরা তাহলে বরেন্দ্র ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে চলেছি বল?'

—'অনিশ্চিত কেন বলছো? সেখানে কয়েকজন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। বলা যায় না আমিই শেষ পর্যন্ত একজন শ্রেষ্ঠী হয়ে যেতে পারি।' কথা শেষ করে হেসেছে সে।

সে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—'কি হল, দাঁড়ালে কেন? চল-চল।

—'তুমি যাও।' গম্ভীর হয়েছে কাঞ্চন। 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।'

—'তুমি যাবে না?'

—'যাব, তবে তোমার সঙ্গে নয়। আমি এবার থেকে মায়ের সঙ্গে সকটে যাব।'

—'মায়ের'সঙ্গে! কেন, আমি কি করলাম?'

—'তুমি কিছু করনি। তুমি শুধু মিথ্যা কথা বলেছো। সত্যকে গোপন করতে চাও। মিথ্যাচার আমি সহ্য করতে পারি না। মিথ্যাচারীকেও।' ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছে কাঞ্চন। 'তুমি খুবই মিথ্যাবাদী।'

ভৃগুর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। ধীরে ধীরে সত্য প্রকাশ করেছে সে। তার জন্যই বরেন্দ্র ত্যাগ। অজ্ঞাত নামা তরুণের পরিচয় কুমার রামপাল।

রামপাল, রামপাল, রামপাল! হৃদয় তন্ত্রীতে বীণার ঝঙ্কার তুলেছে। ভারী হয়েছে চোখের পাতা।

কদিন থাকবে না। আসবার দিন বলে গিয়েছিল। কাঞ্চন কথা দিয়েছিল, সে অপেক্ষা করবে। ছিল না। হয়তো এসে ফিরে গিয়েছিল।

হাসি মুখে সে জানতে চেয়েছিল, 'কাঞ্চন, সত্যই তুমি থাকবে তো?'

কাঞ্চন বলেছিল, 'থাকব না কেন? নিশ্চয়ই থাকবো। আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্য।'

—'যদি না থাক?' মৃদু কণ্ঠে বলেছে, 'যদি না তোমার মনে থাকে।'

—'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। ভুলবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

—'ভাল। আর যদি.....'

কাঞ্চন মুখ তুলে চেয়েছিল।

—'মনে কর, যদি আমি না আসতে পারি? হারিয়ে যাই? যেতেও তো পারি। পারি না?'

—'হারিয়ে যাবে! কেন? তুমি হারিয়ে যাবে কেন?

—'যেতেও পারি, কি পারি না? কত মানুষ তো হারিয়ে যায়। যায় না? তখন কি করবে তুমি?'

—'হারিয়ে গেলেও আমি ঠিক খুঁজে বার করবো। হারিয়ে যেতে দেব না তোমায়। দেখো।'

—'সত্যি!' হেসেছে সে।

—'আমি মিথ্যে বলছি না।' দৃঢ় কণ্ঠে কাঞ্চন বলেছে, 'তোমাকে ঠিক খুঁজে নেব।'

কতদিন আগের কথা। কৌতুকলে বলা। সত্য হল জীবনে।

মুদগগিরিতে আসার পর বরেন্দ্রর সংবাদ শুনেছে। কুমার রামপাল কারারুদ্ধ। মহারাজ মহীপাল তাঁর দুইভাইকে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। তারপর সংবাদ এসেছে যুদ্ধের। মহীপাল নিহত। বরেন্দ্রর সিংহাসন অধিকার করেছে দিব্য নামের এক দস্যু। রামপালের কোন সংবাদ জানা যায়নি আর।

দিন কেটেছে। দারিদ্র নয়, অসচ্ছলতা। কায়িক শ্রম ভৃগুর পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যবসা করেছে সে। ব্যর্থতা এসেছে। ভৃগু বলেছে, 'আমি একটা অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

মা আগে সর্বক্ষণ কটু কথা বলতো মানুষটাকে। সেই মা শান্ত কণ্ঠে বলেছে, 'হবে না কেন? চেষ্টা করো।'

হেসেছে ভৃগু। বলেছে, 'চেষ্টা তো করলাম ভানু।'

—'আবার করো'

—'করবো! আমার চেষ্টায় তোমার সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে যে?'

মা চুপ করে থেকেছে। ভৃগু আবার ব্যবসা শুরু করেছে। একটু একটু করে সফলতা এসেছে।

ভৃগু বলেছে, 'ভানু, কাঞ্চনের জন্য এবার একটি পাত্রেরও সন্ধান করা যাক।'

মা উদাসভাবে বলেছে, 'দেখ।'

কাঞ্চন বলেছে, 'না। যেদিন আমার জন্য.....পাত্র ঠিক করবে, সেইদিনই আমি যেদিকে দুচোখ যাবে চলে যায়।'

মা শুধু তার মুখের দিকে একবার দেখেছে। কথা বলেনি।

হঠাৎ খুবই অসুস্থা হয়ে পড়ল মা। যন্ত্রণা-যন্ত্রণা-সেই সঙ্গে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। এত রক্ত। শিউরে উঠেছিল সে।

কদিন আগে তাকে ডাকল। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। বলল, 'কাঞ্চন, একটা কথা তোকে বলার ছিল।'

মায়ের মুখের দিকে চেয়েছিল সে।

—'ভেবেছিলাম তোকে জানাব না। সত্য গোপন থাক। আজ মনে হচ্ছে না জানিয়ে গেলে অন্যায় করবো।'

—'মা।'

—'হ্যাঁরে।' মায়ের ক্লিষ্ট মুখে একটুকরো হাসি ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। কষ্টে বলেছিল, 'আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। তোর জন্য চিন্তা যে হয় না তা নয়। ভৃগু আছে। বহুবার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছিস আমার কাছে। বলতে পারিনি। আজ বলবো।'

—'জানতে চাই না মা।'

—'জেনে রাখ। বুঝতে পারবি কেন বরেন্দ্র ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম।'

—'কি হবে?'

—'মাকে ভুল বুঝবি না। মৃদু কণ্ঠে মা বলেছে, তোর জন্মদাতা মহারাজ বিগ্রহপাল।'

—'মা।' আর্তস্বর ধ্বনিত হয়েছিল কণ্ঠে।

মা দুহাতে মুখ ঢেকেছিল। তারপর......

ভৃগু এসে সামনে দাঁড়াল। তারদিকে চাইল সে।

ভৃগু বলল, 'এবার ওঠো। সব শেষ হয়ে গেল।'

ভৃগুর কণ্ঠে যেন আর্ত হাহাকার। একজন সর্বহারা মানুষের মূর্তি।

উনত্রিশ

মহারাজ রামপাল প্রতিষ্ঠিত নতুন নগরী রামাবতী। বরেন্দ্রর সিংহাসনে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সুযোগ্য বংশধর রামপাল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষের অরাজকতা বাংলাদেশ থেকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন গোপাল। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল যখন বরেন্দ্রর সিংহাসনে বসেন তখনও অত্যাচার-অরাজকতা দেশ থেকে দূর হয়নি। দেশের অনেক অংশ তখনও পরপদানত। ধর্মপাল বাহুবলে মুক্ত করেছিলেন দেশকে। শুধু তাই নয়, আর্যাবর্তে করেছিলেন প্রভুত্ব বিস্তার।

ধর্মপাল পুত্র দেব পালও ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। পিতৃ সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই পালবংশের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের সূচনা দেখা যায়। পাল রাজবংশ একদিন দুর্দশা ও অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে ছিল (দশম শতাব্দীর শেষভাগে)। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল ধ্বংসপ্রায় পাল বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন। তিনি বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। পাল সাম্রাজ্যের অস্তমিত রবি আবার উদিত হয়।

পাল সাম্রাজ্যের রবি অস্ত গিয়েছিল। আবার উদিত হয়েছে। দিব্য অধিকার করেছিল বরেন্দ্র। দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের কাছ থেকে সে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন রামপাল।

জীবনে মূল্যও অনেক দিতে হয়েছে তাঁকে। বার বার বঞ্চনা করেছে ভাগ্য।

চিন্তা করেন তিনি। মূর্ত হয়ে ওঠে অতীত।

কান্তাকে নিয়ে পৌঁছেছিলেন মগধে। চলে গেলেন শূরপাল। কোথায় গেলেন জানেন না। পরে অনেক সন্ধান করেছেন। কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি তাঁর।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার পালের জন্ম হয়েছে তখন। কান্তাকে বলেছিলেন, 'কান্তা, আমি বরেন্দ্র যাব।'

কান্তা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই যাবে।'

—'কেন যাব বলতো?' জানতে চেয়েছিলেন।

—'পুত্রের কর্তব্য পালনে।' শান্ত কণ্ঠে বলেছিল কান্তা।

যুদ্ধযাত্রা......না, যুদ্ধযাত্রা নয় প্রহসন। সাধ্য কোথায়! সামান্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। দিব্য তখন শক্তিশালী। বরেন্দ্রর সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কিছু সৈন্য ক্ষয় করে ফিরেছিলেন মগধের পথে। পেয়েছিলেন একজনকে। ত্রৈলোক্য।

সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিনরাত্রি পথ চলছেন তখন। বিশ্রামের অবকাশ নেই। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, এই বুঝি দিব্যর বাহিনী তাঁর পাশ্চাৎধাবন করছে।

রাত্রে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেন। বিশ্রাম নেয় পথশ্রমে ক্লান্ত সৈন্যরা। শিবির স্থাপনের কোন ব্যবস্থা হয় না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে সৈন্যদের মধ্যেই তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়।

সেদিনও বিশ্রাম করছিলেন তিনি। গভীর রাত্রি তখন। নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল সেনাপতির আহ্বানে। উঠে বসেছিলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেনাপতির দিকে।

—'মহারাজ, একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।' জানিয়েছিলেন সেনাপতি।

—'গুপ্তচর!'

—'তাই মনে হচ্ছে। যদিও.....'

—'কি?'

—'সে বলছে, গুপ্তচর নয়। আপনার পূর্ব পরিচিত সে।'

—'আমার পূর্ব পরিচিত? আর কি বলছে সে?'

—'আপনার সঙ্গে একবার শুধু সাক্ষাৎ করতে চায়।

—'সাক্ষাৎ করতে চায়, কেন?'

—'কেন, বলেনি। শুধু একার সাক্ষাৎ করতে চায়।'

—'সেনাপতি, আপনার কি মনে হয়?' জানতে চেয়েছিলেন তিনি', ধরা পড়েছে। আমার পূর্ব পরিচিত বলছে। বলছে ধরা পড়ার পর। সে কি আগে সাক্ষাৎ প্রার্থনাা করেছিল?

—'আজ্ঞে না।'

—'আমার পূর্ব পরিচিত কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করবে না এওতো হতে পারে না।' মনটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'আপনাদের যা করণীয় করুন।'

—'আজ্ঞে।'

—'ইচ্ছা করলে বন্দী অবস্থায় সঙ্গে নিতে পারেন। আর যদি মনে করেন, হত্যা করতে পারেন।'

আদেশ পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন সেনাপতি। তাঁকে থামিয়ে বন্দী গুপ্তচরকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সেনাপতি যাকে নিয়ে এসেছিলেন আকাশের তারাদের আবছা আলোয় তাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। রাত্রে কয়েক দণ্ডের বিশ্রামের সময় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মশাল জ্বালান হয় না। মশাল জ্বালান হয়েছিল। বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ত্রৈলোক্য, তুমি! তোমার এ অবস্থা কে করল?'

খণ্ডিত হাত দুটি তুলে হাসি মুখে ত্রৈলোক্য উত্তর দিয়েছিল, 'ভাগ্য।'

শুনেছিলেন সব কথা। এক সময় ম্লান কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমিও তোমাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলাম ত্রৈলোক্য।'

—'ভাগ্য আমাকে রক্ষা করল।' হাসি মুখেই বলেছিল সে।

ত্রৈলোক্য আছে। আছে নিজের মতই। ইচ্ছামত সে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। কখনো সৈন্য নিবাসে, অশ্ব-হস্তিশালায়, পথে-প্রান্তরে। এভাবেই বছরের পর বছর পার করল। কখনো কখনো তাঁর কাছে আসে। বৃদ্ধ হয়েছে। তবে অথর্ব হয়নি। তাই বেশীক্ষণ কোথাও স্থির থাকতে পারে না। কান্তা খুবই শ্রদ্ধা করত ত্রৈলোক্যকে। ত্রৈলোক্যর কাছে কোন সঙ্কোচ ছিল না তার। অবশ্য ত্রৈলোক্যের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তিনি সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রায়ই ত্রৈলোক্যর সঙ্গে কথা বলত। জেনেছে সে সব কথা। তাঁর কারাজীবনের কথা, কারাগার থেকে পলায়নের বৃত্তান্ত বার বার শুনতে চাইত। বিশেষ করে নপুংসকের ছদ্মবেশে সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা।

সেই সব দিনগুলির কথা তাঁরও মনে পড়ে। কত স্মৃতি। মনে পড়ে জননীর কথা। বরেন্দ্র উদ্ধার তিনি দেখে যেতে পারেননি। মহারাজ মহীপালের কন্যাদের তিনি উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করেছেন। তাঁর বিধবা পত্নীদের যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। দুজন পরলোক গমন করেছেন। একজন পিত্রালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রাজকার্য থেকে একরকম অবসর গ্রহণ করেছেন তিনি। যুবরাজ কুমার পালই এখন রাজ্য পরিচালনা করছে। অবশ্য তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। অন্য তিন পুত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপাল ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। কনিষ্ঠ মদন পালও সাহসী, বীর।

মনে পড়ে চন্দ্রমাধবের কথা। চন্দ্রমাধবের পুত্র হরি তাঁর সেনাপতি। কুমার পালের সুহৃদ।

বাল্য উত্তীর্ণ এক সদ্য কিশোর একদিন তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়েছিল। বলেছিল, 'মহারাজ আমি হরি। আমার মগধে আগমনের হেতু অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ।'

—'সৈনিক হতে চাও?'

—'আজ্ঞে না মহারাজ, মগধরাজের সৈনিক বৃত্তি গ্রহণের এতটুকু ইচ্ছা আমার নেই।

—'তাহলে অস্ত্র শিক্ষা করতে চাও কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন।

—'বিশেষ প্রয়োজনে মহারাজ।'

—'কি সে প্রয়োজন বলতে আপত্তি আছে তোমার?'

—'আজ্ঞে না। আমি অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করে বরেন্দ্র যেতে চাই।'

—'তুমি মগধে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করে বরেন্দ্র যাবে?' বিস্মিত হয়েছিলেন। 'মগধের সঙ্গে বরেন্দ্রর সম্পর্কের কথা জান?'

—'জানি মহারাজ। আমি আপনার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করে আপনার শত্রুপক্ষে যোগ দিতে চাই।'

কিশোর কি বাতুল। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

হরি বলেছিল, 'মহারাজ, এ আমার পিতার শেষ ইচ্ছা। তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার জন্মের মাসাধিককাল পূর্বে গুপ্তশত্রু দ্বারা তিনি নিহত হয়েছিলেন। মাতার কাছে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, তাঁর যদি পুত্র সন্তান জন্মায় সেও মহারাজ রামপালের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমার আপনার কাছে আগমন।'

—'কে তোমার পিতা?'

—'আমার পিতার নাম চন্দ্রমাধব। মা তরঙ্গময়ী। তিনি পূর্ব জীবনে মহারাজ মহীপালের রক্ষিতা ছিলেন।

স্পষ্ট স্বীকারক্তি। এতটুকু দ্বিধা করেনি মাতৃ পরিচয় দিতে। সব কথাই তাঁকে বলেছিল। তার উদ্দেশ্যের কথা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও স্বীকার করেছিলেন। জেষ্ঠ্য পুত্র কুমার পালের তত্ত্বাবধানে হরি অস্ত্রশিক্ষা লাভ করে বরেন্দ্র যাত্রা করেছিল।

লোহিতের কথা বলে গিয়েছিলেন শূরপাল। কিন্তু তাঁর কোন সন্ধান তিনি পাননি। পুরাতন রাজকর্মচারীদের কাছে লোহিতের কথা শুনেছিলেন মাত্র।

সন্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী একদিন বরেন্দ্র থেকে মগধে এসেছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ তখন। রাজকার্যে যোগ দিয়েছিলেন। পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দীও কর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাছে।

বারবার রাষ্ট্রকূট থেকে মগধে ছুটে এসেছেন মাতুল মহণ। শুধু মাতুল নন বন্ধুও তাঁর। নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে......

একদিন সংবাদ পেলেন দিব্য মগধ আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। বরেন্দ্র উদ্ধারের প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর দীর্ঘদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন তিনি। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কি করতে পারেন? মাথা কুটেছেন শুধু। কিন্তু আরতো বসে থাকা যায় না। পুত্র, অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অমাত্যরা পরামর্শ দিলেন সামন্তরাজাদের সাহায্য প্রার্থনা। সেইমত সামন্ত রাজাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন কিন্তু উত্তর এল নেতিবাচক।

একরকম দিশাহারা তখন তিনি। নিত্য নতুন সংবাদ আসছে বরেন্দ্র থেকে। রণ সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে দিব্য। যে কোনদিন সসৈন্যে মগধ যাত্রা করবে।

শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল কান্তা, 'কি করবেন মহারাজ?'

উত্তর দেননি।

—'সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে দূতেরা বিমুখ হয়ে ফিরে এসেছে। কান্তা জানতে চেয়েছিল,' এখন?'

নীরব ছিলেন তিনি।

—'আপনার দূতেদের বিমুখ করেছেন রাজারা, আমার মনে হয়, আপনি নিজে গেলে আপনাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য তাঁদের হত না।'

চমকে উঠেছিলেন। স্পষ্ট ইঙ্গিত। চিন্তা করেছেন। মন স্থির করে সামন্ত রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। কেউই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। কিন্তু তিনি যখন মগধে ফিরে এলেন কান্তা তখন নেই। আর্ত হাহাকারে বুকের মধ্যেটা গুমরে উঠেছিল। নেই-নেই-নেই। কান্তা নেই।

শোকের সময় ছিল না। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বরেন্দ্রর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তিনি। মাতুল মহণ তাঁর দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নরদেব ও সুবর্ণদেব এবং

ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ সহ রাষ্ট্রকূট সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সসৈন্য মগদ ও পীঠীর অধিপতি ভীমযশ এসেছিলেন। কোটাটবীর রাজা বীরগুণ। দণ্ডভুক্তির রাজা জয় সিংহ। দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ। অপর মন্দারের (হুগলী জিলান্তর্গত) অধিপতি লক্ষ্মীশূর। কুজবাটির (সাঁওতাল পরগণা) রাজা শূরপাল। তৈলকম্পের (মানভূম) রাজা রুদ্রশিখর। উচ্ছালের রাজা মদকল সিংহ। ঢেক্করী রাজ প্রতাপ সিংহ। কয়ঙ্গ মণ্ডলের (রাজ মহলের নিকটবর্তী) অধিপতি নরসিংহার্জ্জুন। লঙ্কট গ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন। নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ। কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপ বর্ধন। পদুবন্বার রাজা সোম। আরো অনেক সামন্তরাজা তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

সসৈন্যে বরেন্দ্রর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যাত্রা পথেই দিব্যর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছেছিল। রুদোকপুত্র ভীম বসেছিল বরেন্দ্রর সিংহাসনে।

দক্ষিণবঙ্গ থেকে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন তিনি। প্রথমে শিবরাজকে একদল সৈন্যসহ তিনি রাজধানীর উদ্দেশ্যে পাঠান। শিবরাজ সসৈন্যে গঙ্গা নদী অতিক্রম করে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন ও বিধ্বস্ত করেন রাজধানী। গঙ্গার অপর তীর সুরক্ষিত করে বিপুল সৈন্যসহ নদী পার হয়ে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন তিনি।

ভীম সসৈন্য গতিরোধ করেন তাঁর। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। বন্দী হয় ভীম।

ভীমের শাস্তি বিধান তিনি করেছেন। পরিবার পরিজনকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন পৃথিবী থেকে। হরি? হরি আজ তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি। উড়িষ্যা যুদ্ধের সফল নায়ক। বরেন্দ্র আবার তাঁর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে।

বরেন্দ্র অধিকার করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। লাঘব করেছিলেন প্রজাদের করভার। করেছেন কৃষির উন্নতি।

প্রতিষ্ঠা করেছেন রামাবতী নগরী (মালদহের কাছে)। কার্য শেষ। এবার বিশ্রাম। না, বিশ্রামের অবকাশ তাঁর ভাগ্যে নেই। যুবরাজ কুমার পালকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি অবসর জীবন যাপন করবেন স্থির করেছিলেন। অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। কুমার পাল বাদে অপর তিন পুত্রের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। সকলেই সম্মত। অর্দ্ধ শতকের ওপর রাজত্ব করছেন। আজ তিনি সত্যিই ক্লান্ত। শরীর যদিও এখনও যথেষ্টই সুস্থ-সবল তাঁর। এই দীর্ঘ জীবনে যুদ্ধক্ষেত্রের আঘাতজনিত অসুস্থতা ভিন্ন কখনো অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করেননি। রাত্রির কয়েক দণ্ড নিদ্রার সময় ভিন্ন কখনো বিশ্রাম নেননি। বিস্মিতা কান্তা বলতো, 'একটু বিশ্রাম নেবার কথা কি তোমার মনে হয় না। শুধু কাজ, কাজ আর কাজ।'

হাসতেন পত্নীর কথায়। জানতেন বিশ্রামের অবকাশ তাঁর জীবনে নেই। বলতেন, 'বিশ্রাম নেবার কথাও মনে হয় কান্তা, কিন্তু ভাগ্যে নেই। বিশ্রাম নেব সেদিন, যেদিন......'

কান্তা ম্লান কণ্ঠে বলতো, 'আমার অপরাধ হয়ে গেছে।'

তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলতেন, 'সেদিন শুধু তুমি আর আমি গল্প করবো কান্তা।'

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। কান্তা বহু দূরে চলে গেছে। দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গিনী, প্রেরণাদাত্রী। আজ মনে হয়.....কিন্তু, না, কুমার পাল সিংহাসনে বসতে চায় না। স্পষ্ট বলেছে, 'আপনার সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা আমার নেই।'

—'আমি তো.......' বলতে গেছেন তিনি।

বাধা দিয়েছে কুমার, 'আপনি আছেন। থাকুন।'

—'আমি বৃদ্ধ হয়েছি।'

—'হয়েছেন। বয়স তার ধর্মপালন করছে। আপনি অথর্ব হননি। অনেক বেশি কর্মক্ষমতা আপনার।'

চেয়েছিলেন। হল না। অমাত্যরাও চান না তিনি অবসর নিন।

ত্রৈলোক্যও তাই বলে। বলে, 'মহারাজ আশ্চর্য আপনার প্রাণ শক্তি।'

ত্রৈলোক্য অনেক কথাই বলে। কবি গঙ্গাধরের বংশধর। তাঁর পুণ্যের ফলেই রাজানুগ্রহ লাভ করেছে। হস্তচ্ছেদন তার কৃতকার্যের ফল। জীবনে কম অন্যায়, অসৎ কাজতো করেনি।

ভাল লাগে ত্রৈলোক্যর সঙ্গে কথা বলতে। বয়সের সঙ্গে তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু। ত্রৈলোক্যের পরিবর্তন হয়নি। বন্দী জীবনের ত্রৈলোক্যকে এখনও পাওয়া যায়।

কদিন আগের কথা। শরতের নীল আকাশ। অপরাহ্নে এখন উদ্যানে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেন। রাজধানীতে থাকলে ত্রৈলোক্য আসে। সঙ্গে যুবক সন্ধ্যাকর। সন্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র।

কোনরকম ভূমিকা না করেই ত্রৈলোক্য বলেছিল,'মহারাজ, এই যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই আমি একে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

—'যুবক আমার পরিচিত ত্রৈলোক্য।' মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

—'আপনার রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারী।' তার চিরাচরিত মুচকি হাসি হেসেছিল সে। 'আর?'

তিনি ত্রৈলোক্যের দিকে চেয়েছিলেন। বিব্রতবোধ করেছিল যুবক সন্ধ্যাকর।

—'যুবক স্বর্ণখনি। আবিষ্কার করেছে কবি গঙ্গাধরের বংশধর ত্রৈলোক্য নারায়ণ। সন্ধ্যাকর কবি। আপনার জীবনী রচনা করেছেন। কাব্যের নাম দিয়েছে "রামচরিত মানস"। অবশ্য গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অমি পাঠ করছি। অভূতপূর্ব (সান্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত মানস'-ই মহারাজ রামপালের একমাত্র ইতিহাস। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণ তাঁর গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন)।

তিনি যুবক সন্ধ্যাকরকে দেখেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, 'যুবক, আমার জীবনের কথা তুমি কিভাবে জানলে, না, শুধুই কল্পনা তোমার।'

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যাকর উত্তর দিয়েছে, 'পিতার কাছে আপনার কথা শুনেছি মহারাজ। আপনার অনেক কথাই তিনি আমাকে বলে গেছেন।'

প্রজাপতি নন্দী জানতেন। জানে ত্রৈলোক্য।

কদিন নেই ত্রৈলোক্য। বলে গিয়েছিল আসবে। আসছে না কেন? অধৈর্য্য হলেন। এমনতো হয় না। সেকি আসবে না আজ?

ত্রৈলোক্য এল। গোধূলীর রক্তরাগ আকাশে। আজ সকাল থেকেই বড় বিষন্ন তাঁর মন। ত্রৈলোক্যর কথা বার বার মনে হয়েছে।

—'ত্রৈলোক্য, এত বিলম্ব কেন তোমার?' তাকে দেখে যেন বিরক্ত হয়েছেন তিনি।

ত্রৈলোক্য নীরব।

—'কি হল তোমার, কথা বলছো না কেন ত্রৈলোক্য?'

—'মহারাজ।' মৃদু কণ্ঠে ডেকেছে সে।

—'বল ত্রৈলোক্য।'

—'আচ্ছা পৃথিবী বাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আমাদের সকলকেই তো ধরাধাম তাগ করতে হবে, তাই না মহারাজ?

—'এই তো নিয়ম ত্রৈলোক্য। চিরাচরিত সত্য, কিন্তু একথা কেন?'

—'এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কোন উপায় নেই, না?'

তিনি কথা বললেন না। তাকে দেখলেন। এমন কথা কখনো কখনো বলে সে।

সামান্য পরে ত্রৈলোক্যর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মহারাজ।'

তিনি তারদিকে চাইলেন।

—'তিনি নেই মহারাজ।' একটু যেন গম্ভীর সে। বলল, 'আঘাত পাবেন জেনে সংবাদটা আপনাকে জানাতে কেউ সাহস করেনি।'

—'ত্রৈলোক্য! তুমি কার কথা বলছো? কে চলে গেছেন?'

—'হ্যাঁ মহারাজ, মাতুল.....সংবাদ এসেছে ধরাধাম ত্যাগ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন তিনি। মহন'

—'কবে?'

—'পক্ষকাল পূর্বে। রাষ্ট্রকূট থেকে আজই.....'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

তিরিশ

রামাবতী থেকে মগধে চলেছেন মহারাজ রামপাল। মাতুল মহণের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকে তিনি প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে গেছেন। সব সময় চিন্তাচ্ছন্ন। অমাত্যদের

সঙ্গে রাজকার্য বিষয়ে আলোচনায় নীরব থাকেন। তাঁর মতামত জানতে চাইলে যুবরাজ কুমার পালের দিকে তাকান।

মাতুল মহণের মৃত্যু দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে তাঁর কাছে। মহণ শুধু তাঁর মাতুল ও বন্ধু ছিলেন তাই নয়, বরেন্দ্র উদ্ধারে পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র সহ তাঁর সহায় হওয়া ছাড়াও গহড়বালরাজের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের বিরোধ মিটিয়েছিলেন তিনি। গহড়বালরাজ গোবিন্দ চন্দ্রের রানি ছিলেন মহণের দৌহিত্রী কুমার দেবী। দুই রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

মাতুল-বন্ধু মহণ তাঁর দুর্দিনের বন্ধু। মহণের ঋণ জীবনে পরিশোধ হবে না।

শীতের দিন শেষ হয়ে আসছে। বসন্ত দ্বারে। বেশ কিছুদিন পরে ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিলেন।

ত্রৈলোক্য নীরব।

—'তুমি কি রাজধানীতে ছিলে না?' প্রশ্ন করেছিলেন।

কথা বলেনি ত্রৈলোক্য।

—কয়েকদিন তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। এক সময় বলেছিলেন, 'কোথায় যাও? কেন যাও?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়েছিল সে।

—'চিন্তা করছি মগধ যাত্রার কথা। যাবে সঙ্গে?'

—শীত শেষ। ক্ষণস্থায়ী বসন্তের পর গ্রীষ্মের দিন। কষ্ট হবে আপনার।'

—'তবুও।' বলেছিলেন। মগধ যাত্রার আয়োজন হয়েছিল। সঙ্গী ত্রৈলোক্য। এবার দাসদাসীর বাহুল্য নেই। মগধ যাত্রায় সৈনিক সংখ্যা স্বল্প। মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) নগরীর অদূরে গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন হয়েছে। কয়েকটি দিন অতিবাহিত হল। এখন মন যেন অনেকটা শান্ত। বন্ধু বিয়োগের কাতরতা অন্তরে অনুভব করছেন, কিন্তু সেই অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে।

কয়েকদিন প্রভাতে-অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে এসে বসছেন। সঙ্গী একমাত্র ত্রৈলোক্য। ভাল লাগছে। নদীর স্রোতের দিকে চেয়ে থাকেন। জীবনের মতই। শুধু বয়ে যায়। তাঁর জীবন নদীও বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে বহেছে। আজ.....আজ বড় ক্লান্ত তিনি। একটু....

অপরাহ্নের আলো ম্লান হচ্ছে। সূর্যাস্তের বিলম্ব আছে এখনও। সন্ধ্যা আসবে সন্তর্পণে। দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনা বুকে নিয়ে ঘনাবে রাত্রি। সূর্যোদয়ের পথে তার যাত্রা।

গঙ্গার তীরে তীরে পথ চলে গেছে নগরীর দিকে। ত্রৈলোক্যকে দেখতে পেলেন না। পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন একদল বৌদ্ধ শ্রমণকে। দূর থেকে এগিয়ে আসছেন তাঁরা। পরনে কষায় বস্ত্র। ত্যাগের প্রতীক।

ভ্রম দূর হল। সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসিনীর দল। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখছেন। দেখছেন .....। ইঙ্গিতে তাঁদের থামতে বললেন।

—'আপনাদের যাত্রা পথ?'

—'আমরা বিক্রমশীল বিহারে যাব।' উত্তর দিলেন একজন। সন্ন্যাসিনীরা সকলেই বয়স্কা।

—'সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়।'

—'জেনেছি অদূরে একটি জনপদ আছে। সেখানেই আশ্রয় নেব।'

—'যদি সম্মত হন, আমি আপনাদের রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করতে পারি। আমিও একজন বৌদ্ধ। আপনারা আতিথ্য গ্রহণ করলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হলেন সন্ন্যাসিনীরা। নতুন শিবির স্থাপন হল।

আপন শিবিরে বসে আছেন তিনি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসিনীদের কথাই চিন্তা করছেন। প্রধানার জন্য পৃথক শিবির নির্মাণ হয়েছে।

চিন্তা করছেন। দীর্ঘ দিনের ব্যবধান। অসংখ্য বছর পার হয়ে গেছে। তবু.....না, ভুল তাঁর হয়নি।

শিবির দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। আলোকিত অভ্যন্তর। ধ্যান মগ্না সন্ন্যাসিনী বজ্রপ্রাণা। অন্যের কাছে পরিচয় জেনেছেন।

চোখ মেলে চাইলেন বজ্রপ্রাণা। লোলচর্মা বৃদ্ধা। স্থির নেত্রে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, 'আসুন মহারাজ।'

—'তোমার এই.....'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠে। বললেন, 'প্রভু বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ।'

—'কিন্তু কাঞ্চন.....'

—'অতীতকে ভুলে যান মহারাজ।'

—'ভোলা যায় কি?'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলেন তিনি। মায়ের শোকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল ভৃগু। সঙ্ঘের শরণ নিয়েছিলেন তিনি।

—'কি হল কাঞ্চন? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

নিথর নিস্পন্দ বজ্রপ্রাণা।

—'আমি.....'

বাধা দিলেন তিনি। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, কুমারের কথা পরে জেনেছি। সত্য পরিচয় গোপন করেছিলেন।'

—'সত্য প্রকাশ হতই কাঞ্চন।' তিনি বললেন, 'সত্যের প্রকাশ ঘটে।'

—'তাঁর ইচ্ছা না হলে তো কিছু সম্ভব নয়। মঙ্গলময় রক্ষা করেছেন।'

—'একথা বলছো কেন?' যেন অধৈর্য্য হলেন। 'কি বলতে চাইছো তুমি? বল।'

বজ্রপ্রাণা নীরব রইলেন।

আপন শিবিরে ফিরে এলেন তিনি। অতীত মূর্ত হয়ে উঠল। অতীত....বড় নিষ্ঠুর। আবার..... হারিয়েছেন অনেক। কিছু তো পেয়েছেন। কান্তা তো তাঁর শুধু সহধর্মিনী ছিলনা, প্রেরণাদাত্রীও। শ্যালক হর্ষও তাঁর জন্য অনেক করেছে। স্বেচ্ছায় গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করেছিল সে। প্রথম বরেন্দ্র উদ্ধারে বরেন্দ্র গিয়েছিল। ফিরে আসেনি।

নিদ্রাহীন রাত্রি কাটছে তাঁর। আকাশের তারারা প্রহর গুনছে। কাঞ্চনের কথা কি কোন দিন বিস্মৃত হতে পেরেছেন? পারেননি। সম্ভব হয়নি ভোলা। কান্তাও জেনেছিল। এক অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছিলেন। কান্তা রাগ বা অভিমান করেনি, অনুযোগ জানিয়েছিল। কাঞ্চনের সন্ধান করার অনুরোধ জানিয়েছিল। সম্ভব হয়নি।

আজ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বৃদ্ধা কাঞ্চনমালা। যৌবনের রঙ্গিন স্বপ্নের দিন কতদূরে। তবু.....হৃদয় তন্ত্রীতে স্মৃতির অনুরনন। শরীর বৃদ্ধ-জরাগ্রস্ত হয়। মনের কি....কামনার নিবৃত্তি বোধ হয় ঘটে না।

শেষ প্রহরের রাত্রি।

শিবির দ্বারে কারো ছায়া। প্রশ্ন করলেন, 'কে?'

নিঃশব্দে সামনে দাঁড়াল ত্রৈলোক্য।

—'তুমি!'

—'ভেবেছিলাম আপনি নিদ্রিত।' অপ্রস্তুত হল ত্রৈলোক্য। অপরাধী কণ্ঠে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

—'তোমার চিন্তার কারণ?'

একটু ইতস্তত করল সে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'সন্ন্যাসিনীরা যাত্রা করছেন।'

—'যাত্রা করছেন! এখনও তো রাত্রি প্রভাত হয়নি?'

—'হ্যাঁ মহারাজ। বললেন, জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে নেবেন। আপনাকে জানাতে বললেন।'

—'কে বললেন?'

—'দল নেত্রী। তিনি শিবিরদ্বারে অপেক্ষা করছেন।'

একটু বিস্মিত হলেন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন।

জ্যোৎস্নালোকে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন বজ্রপ্রাণা। তাঁকে দেখে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চলেই যাচ্ছিলাম।'

—'বিবেকে বাধল?'

উত্তর দিলেননা বজ্রপ্রাণা।

—'পালাচ্ছিলে কেন? ভয়ে? ভালবাসা কি পাপ? আমার মনে হয় না। আজও তো আমি তোমাকে ভালবাসি কাঞ্চন। হ্যাঁ, মিথ্যা বলছি না। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ভালবাসা পাপ নয়। তোমাকে ভাল বেসেছিলাম। ভালবাসি।'

—'মহারাজ।' মৃদু আর্ত কণ্ঠস্বর।

—'তুমিওতো আমাকে ভালবেসেছিলে কাঞ্চনমালা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বজ্রপ্রাণার চোখের তারায় আমি কাঁপন দেখেছি। মনের তো মৃত্যু হয় না কাঞ্চন। মৃত্যু হয় না ভালবাসার। এ আমার উপলব্ধি। সেই সব দিনগুলির কথা এখনও আমার মনে পড়ে। তোমার পড়ে না?'

—'মহারাজ।' বজ্রপ্রাণা থরথর করে কাঁপছেন।

—'বুঝেছি।' মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠে।' পূর্ব্বাশ্রমের কথা ভুলতে হয় তোমাদের। ভুলেছো কি? ভোলা যায়? অতীতকে অস্বীকার করা সম্ভব কি?'

বজ্রপ্রাণা নীরব।

চিন্তা করছেন তিনি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীকে দেখছেন। বললেন, 'আচ্ছা কাঞ্চন, তুমি সন্ন্যাসিনী হলে কেন? তোমার জননী তোমায় পাত্রস্থ করেননি কেন? কৌ প মার্জনা কোর—জানতে চাইছি।'

—'কেন? বজ্রপ্রাণা মহারাজের দিকে চাইলেন। মাথা নত করলেন।'

—'জানতে বড় কৌতুহল হচ্ছে।' হাসলেন তিনি। বজ্রপ্রাণাকে দেখলেন। বলিরেখাকীর্ণ মুখমণ্ডল। তার কৈশোরের.....হেসে ফেললেন। বললেন, 'তুমি সুন্দরী ছিলে। তাহলে.....'

—'হয়নি। আমার ভবিতব্য।' ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর। অনেকটা সহজ হয়েছেন সন্ন্যাসিনী।

—'কেন হয়নি? তোমার জননী কি তোমার বিবাহের চেষ্টা করেননি?'

—'না।' মৃদু কণ্ঠস্বর। বললেন, 'আজ কি এসবের কোন প্রয়োজন আছে মহারাজ?'

—'নেই বলছো?' আবার হাসি ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠে। মন কৌতুক প্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁর জন্যই কি.....একি তাঁর ব্যথী? আত্মতৃপ্তি? একজন তাঁকে....সে....

ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর। বললেন সন্ন্যাসিনী, 'মহারাজ, সত্য কখনো কখনো নির্মম হয়ে ওঠে। হয়তো অন্যায় করছি। মা আমাকে পাত্রস্থ করার কোন চেষ্টাই করেননি। বাল্যে পিতৃ পরিচয় জানার অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাঁর কাছে। তিনি গোপন করেছিলেন।'

—'তোমার কি পিতৃ পরিচয় নেই। বলেছিলে.....হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। বলেছিলে

—'সকল সন্তানেরই পিতৃ পরিচয় থাকে মহারাজ। আমারও ছিল। যদিও পি ছিলেন আগন্তুক। মৃত্যুকালে মা আমাকে জানিয়েছিলেন সে পরিচয়। পেয়েছিলাম আমার পথের সন্ধান। এই পথ।'

—'বল কি।' অবাক হলেন।' পিতৃ পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ বুঝলাম না।'

বজ্রপ্রাণা নীরব। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশে উষার আলো। রাত্রি প্রভাত দ্বারে।

বড় কৌতুহলি মনটা। ডাকলেন, কাঞ্চন।'

সে ডাকে একটু যেন কেঁপে উঠলেন সন্ন্যাসিনী। মাথা নত তাঁর।

এতো শিশু মনের কৌতূহল। অসংখ্য স্মৃতি চিহ্ন। বললেন, 'বিশ্বাস কর, কষ্ট হচ্ছে আমার। ভাগ্যই হয়তো জীবনের নিয়ন্তা। তবু যদি সেদিন, হ্যাঁ, যদি তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম ফিরিয়ে দিতে পারতে?'

—'হয়তো পারতাম না। তবে....না, তা সম্ভব হত না মহারাজ। আপনাকে ফিরে আসতে হত।'

—'কাঞ্চন!' যেন আর্তনাদ করে উঠল কণ্ঠ। 'কাঞ্চন একি বলছো তুমি?'

—'অসম্ভব কখনো সম্ভব হয় না মহারাজ।' মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ মহারাজ, মিথ্যা নয়।'

—'একি বলছো তুমি কাঞ্চন? কেন ফিরিয়ে দিতে?'

—'দিতে হত। মা বলেছিল। আপনাকে চিনেছিলেন তিনি। জানিয়ে ছিলেন সত্য।'

—'সত্য? কি সেই সত্য কাঞ্চন? তুমি বল।'

একটু নীরব রইলেন সন্ন্যাসিনী। মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনার শরীরের রক্তধারা আমারও শরীরে যে বইছে মহারাজ। এ নিষ্ঠুর সত্যকে কেমন করে অস্বীকার করতাম?'

—'কাঞ্চন!' আর্ত হাহাকার ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে। 'কাঞ্চন একি বলছো?'

নিথর সন্ন্যাসিনী।

সর্ব শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর। একি শুনলেন! কাঞ্চন.....একই পিতার ঔরসজাত.....না-না। তিনি বসে পড়লেন।

সংবিত ফিরে পেতে চোখ মেলে চাইলেন এক সময়। সন্ন্যাসিনী চলে যাচ্ছেন। কাঞ্চন....তাঁর......

উঠে দাঁড়ালেন। কেউ নেই। রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। সূর্যোদয় হচ্ছে পূর্বাকাশে। উদ্‌ভ্রান্তের মত দ্রুত চলতে শুরু করলেন। সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর দল। তিনিও চলেছেন। মহারাজ রামপাল। সামনে.....স্রোতস্বিনী গঙ্গা। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেদিকে..............

মহারাজ রামপালের জীবন ইতিহাস লিখেছেন কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিত মানসে। বিচিত্র জীবনের অধিকারী একজন মানুষের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন মহারাজ রামপাল (১০৭৭ থেকে ১১৩০ অব্দ পর্যন্ত)। বৃদ্ধ বয়সে মাতুলের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাকুল হন। মুদ্গগিরিতে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ পূর্বক নশ্বর দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে মাতুলের সঙ্গে মিলিত হন।
